হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

চন্দ্রভাগার চাঁদ

সময়কাল অষ্টম শতাব্দী। নির্মিত হতে চলেছে ইলোরার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অমোঘবর্ষর মূর্তি। প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। সম্রাট আসবেন উন্মোচনে। এইসময়ে ঘনিয়ে এল মহাদুর্যোগ।...শঙ্খপাল প্রবল দ্বন্দ্বের মুখোমুখি! যা সুন্দর, তাই কি সত্য?...

সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দী। বন্দি হিন্দু রাজা অন্ধ পৃথ্বীরাজ। তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছেন মহম্মদ ঘোরীর সভাকবি চাঁদবর। কিন্তু জীবনে তিনি তলোয়ার ধরেননি। কী করে মুক্ত করবেন অসহায় বন্ধু পৃথ্বীরাজকে?...কী বলবেন তাঁর রচিত শেষ শ্লোকে?...

ত্রয়োদশ শতাব্দী। কোনারকের সূর্য মন্দির নির্মাণ পর্ব শেষ হতে চলেছে। এই আশ্চর্য মন্দির নির্মাতা বারোশোজন শিল্পী-মজুরকে কি মৃত্যু দেবেন পুরীধামের মহারাজ নরসিংহদেব? তাদের কি এটাই ছিল শেষ প্রাপ্য! নাকি ঘটবে কোনও অলৌকিক ঘটনা?...

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিতে তিনটি রোমাঞ্চকর কাহিনি, যার পরতে-পরতে মিশে আছে মানবতার স্পর্শ।

এলাপুর ভাস্কর

চন্দ্রভাগার চাঁদ

চাঁদবরের শেষ শ্লোক

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিতে
তিনটি রোমাঞ্চকর কাহিনি,
যার পরতে-পরতে মিশে আছে
মানবতার স্পর্শ।

www.BanglaBook.org

জন্ম ১৭ মে ১৯৭৩।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ।
ছোটদের সব প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাতেই লেখালেখি। বড়দের জন্যও লেখেন।
প্রথম প্রকাশিত গল্প 'হারানখুড়োর মাছ ধরা' কিশোর ভারতী পত্রিকায়।
প্রথম উপন্যাস 'কৃষ্ণলামার গুম্ফা' আনন্দমেলাতে প্রকাশিত হয়।
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫টি। জনপ্রিয় এফ.এম. রেডিয়ো চ্যানেলগুলিতে নাট্যরূপ পেয়েছে বহু গল্প।
শখ আড্ডা, সাহিত্যচর্চা ও ভ্রমণ।
পত্রভারতী থেকে এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস **জীবন্ত উপবীত, খাজুরাহ সুন্দরী, রাক্ষুসে নেকড়ে, ফিরিঙ্গি ঠগি, চন্দ্রভাগার চাঁদ, কৃষ্ণলামার গুম্ফা, রুদ্রনাথের চুনির চোখ।**
বহু সম্মাননা ও পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি প্রদত্ত উপেন্দ্রকিশোর স্মৃতি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ **রঞ্জন দত্ত**

চন্দ্রভাগার চাঁদ

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

চন্দ্রভাগার চাঁদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ মৃণাল শীল

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

CHANDRABAGAR CHAND
by Himadrikishore Dasgupta
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 200.00

ISBN 978-81-8374-383-9

অগ্রজ কথাশিল্পী

অনীশ দেব

শ্রদ্ধাভাজনেষু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

যা বলতে চেয়েছি

ইতিহাস মানে শুধু রাজারানির গল্প নয়। নয় শুধু সন তারিখের পরিসংখ্যান। ইতিহাসের গভীরে লুকিয়ে থাকে সময়। যে সময় কথা বলে সাধারণ মানুষের। তাদের সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, যন্ত্রণা-তৃপ্তি। তারা কেউ হয়তো কবি, কেউ নটী, কেউবা ভাস্কর, কেউ হয়তো সাধারণ মানুষ। তারা থেকে গেছেন অন্তরালে।

এই বইয়ের তিন সময়কাল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তিনটি উপন্যাস 'এলাপুর ভাস্কর', 'চাঁদবরের শেষ শ্লোক' আর 'চন্দ্রভাগার চাঁদ'-এ বলতে চেয়েছি এমনই কিছু মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবনের উপাখ্যান। সে উপাখ্যান কখনও অনাবিল ভালোবাসায়, কখনও মর্মস্পর্শী বিষণ্ণতায়, কখনও হয়তো রহস্য-রোমাঞ্চে ছায়ামেদুর।

তিনটি উপন্যাসের স্থান-কাল-চরিত্ররা অধিকাংশই ঐতিহাসিক সত্য। তবে উপন্যাসের প্রয়োজনে এসেছে কিছু নতুন চরিত্রও, যাঁদের পাওয়া যায় না ইতিহাস-বইয়ে। ইতিহাস যেখানে কুয়াশাবৃত, সেখানে পাখা মেলেছে কল্পনা।

উপন্যাসগুলি কিশোর ভারতী পত্রিকায় প্রকাশের পরে সমাদর লাভ করেছিল। কিছু পরিমার্জনা-পরিবর্ধনও করেছি। প্রিয় পাঠকপাঠিকারা তৃপ্তি পেলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১লা ডিসেম্বর ২০১৫
কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

সূচিপত্র

এলাপুর ভাস্কর ১১
চন্দ্রভাগার চাঁদ ৬৯
চাঁদবরের শেষ শ্লোক ১৩৩

এলাপুর ভাস্কর

শঙ্খপাল এসে দাঁড়ালেন কৈলাস মন্দিরের সামনে। মাথা তুলে চাইলেন ওপর দিকে। এলাপুর গ্রামের মাথার ওপর বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। তার আলো এসে পড়েছে চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথার জঙ্গলে, তার নীচে পাহাড়ের ঢালে অর্ধচন্দ্রকারে বিস্তৃত সার সার গুহামুখগুলোর ওপর। প্রাচীন সব গুহা। প্রাকৃতিক গুহা নয়, মানুষের খোদিত গুহা। প্রাচীন শিল্পী-ভাস্করের দল এক সময় পাথর কেটে বানিয়েছিলেন ওই গুহা মন্দিরগুলো। আর তার মধ্যে ছেনি-হাতুড়ির ঘায়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অপূর্ব সব মূর্তি-অলংকরণ।

ওই অন্ধকার গুহাগুলোর মধ্যেই কোথাও রয়েছেন ধ্যানমগ্ন তথাগত, দণ্ডায়মান ঋজু তীর্থঙ্কর অথবা আলিঙ্গনরত হর-পার্বতীর জীবন্ত মূর্তি। ওই গুহাগুলোর বয়স কত তা জানা নেই কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের। কেউ কেউ বলে ওই গুহা মন্দিরগুলোর বয়স এক সহস্র বছরের কম নয়। এক সময় ওই গুহাগুলো নাকি ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিহার আর চৈত্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরই গড়া, পরবর্তীতে কিছু গুহা রূপান্তরিত হয় হিন্দু ও জৈন গুহায়।

এ ব্যাপারে বিশদ না জানলেও একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিত শঙ্খপাল। এই এলাপুর নামের অখ্যাত গ্রামে তিনি যদি না জন্মাতেন, ওই গুহাগুলোকে যদি না দেখতেন, তবে জীবন ব্যর্থ হয়ে যেত তাঁর। হয়তো তিনি মান্যখেতের সৈনিক হতেন, শিল্পী হওয়া হত না তাঁর। মহারাজা অমোঘবর্ষর মূর্তি নির্মাণের দায়িত্বও সমর্পিত হত না তাঁর কাঁধে। যে মূর্তি যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবে তাঁকে। ঠিক যেভাবে চরণন্দ্রী পাহাড়ের ওই গুহাগুলোর ভিতর বেঁচে আছেন প্রাচীন শিল্পীরা।

চন্দ্রালোকে বেশ কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকাবার পর পাশ ফিরে সামনের দিকে তাকালেন শঙ্খপাল। চত্বরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল মন্দিরটা। কৈলাস মন্দির! সেই কবে একশো বছর আগে রাজা প্রথম কৃষ্ণর আমলে শুরু হয়েছিল এই মন্দির নির্মাণের কাজ! তারপর

BanglaBook.org

কত রাজা এল গেল! রাজা দ্বিতীয় গোবিন্দ, রাজা ধ্রুবধারাবর্ষ, রাজা তৃতীয় গোবিন্দ...। অবশেষে রাজা অমোঘবর্ষর সময় এসে শেষ হতে চলেছে এই কাজ।

কৈলাস মন্দিরের দিকে তাকিয়ে এক এক সময় নিজেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান শঙ্খপাল। তার জন্মেরও বহু আগে থেকে কত নামি-অনামি শিল্পীর দল একশো বছর ধরে গড়ে তুলেছেন এই মন্দির। শুধু এ মন্দিরের অলংকরণ বা ভাস্কর্যই নয়, মন্দিরের নির্মাণশৈলীও বড় অদ্ভুত, বিস্ময়কর! একটা পাথরখণ্ডর ওপর আর একটা পাথরখণ্ড বসিয়ে নির্মাণ করা হয়নি এ মন্দির। অদ্ভুতভাবে, বলা যেতে পারে একটা ছোট পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে মজুরের দল পাথর কাটতে কাটতে নীচে নেমে প্রথমে মূল মন্দির ঘিরে একটা খাদ সৃষ্টি করেছিল, শঙ্খপাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানেই তৈরি করেছিল সেই চত্বর। তারপর চারদিক থেকে মাঝখানের পাথর কেটে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয়েছে সুউচ্চ এই মন্দির।

কৈলাস মন্দির! তুষার ধবল কৈলাস। কৈলাসের মতোই তাকে শ্বেতশুভ্র করার জন্য কুমারিকা তট থেকে আনানো হয়েছে শঙ্খচূর্ণ। বীর নারায়ণ কিছুদিন আগেই জয় করেছেন কুমারিকাতট। ওই শঙ্খচূর্ণ তটবাসীদের উপহার। তার প্রলেপ পড়েছে মন্দিরের গায়ে। মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মূর্তির গায়ে। কৃষ্ণবর্ণের পাথর শঙ্খচূর্ণর প্রলেপে যেন রূপান্তরিত হয়েছে শ্বেতশুভ্র মর্মরে।

তবে ওই মূর্তিগুলোর দিকে তাকালে মনটা ভিজে ওঠে শঙ্খপালের। ওই মূর্তি তৈরির গোপন রহস্য কাউকে কোনওদিন ব্যক্ত করতে পারবেন না শঙ্খপাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শঙ্খপাল গিয়ে দাঁড়ালেন এক জায়গাতে। কারুকাজ করা চারটে স্তম্ভর মাথায় ধরা আছে একটা ছাদ। তার চারপাশ পশুচর্মের আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা। ওই আচ্ছাদনগুলো দিয়ে যেন জায়গাটাকে চত্বরের অন্য সব জায়গা থেকে পৃথক করা হয়েছে।

শঙ্খপাল গিয়ে দাঁড়ালেন সে-জায়গাতে। স্তম্ভগাত্রের কুলুঙ্গিতে চকমকি পাথর আর মশাল রাখা ছিল। পাথর ঘষে মশাল জ্বালিয়ে আবরণগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে দিতেই মশালের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঘেরা জায়গার ভিতরে রাখা মূর্তিটা। মহারাজ অমোঘবর্ষর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। বলদর্পী ভঙ্গিতে একটা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মাথায় উষ্ণীষ,

BanglaBook.org

পরনে রাজবেশ। কোমরবন্ধর ডান দিক থেকে ঝুলছে দীর্ঘ কোষ। কারণ তিনি নাকি বাম হস্তে অসি ধারণ করেন।

যে বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন চন্দন পাদুকাশোভিত রাজাধিরাজ, সেই বেদিমূলে খোদিত আছে পাঁচটি বাদ্যযন্ত্রর ছবি। ওদের বলে 'পঞ্চমহাশব্দ'। মহারাজ অমোঘবর্ষর রাজকীয় প্রতীক ওই 'পঞ্চমহাশব্দ'। এক ভৃত্যও দাঁড়িয়ে আছে অমোঘবর্ষর পিছনে সে রাজছত্র ধরে রেখেছে রাট্টারাজের মাথায়। শঙ্খপালের হাতে গড়া মূর্তি একেবারে যেন জীবন্ত।

অমোঘবর্ষর মূর্তির কণ্ঠদেশ থেকে একটা উড়নি নেমে এসে কিছুটা আবৃত করে রেখেছে তাঁর বাম বাহু। ওই উড়নির গায়েই সামান্য কিছু ফুল লতাপাতার সূক্ষ্ম অলঙ্করণ বাকি। বেদিমূলের পাশেই সাজানো আছে মূর্তি তৈরির নানা সামগ্রী। পাথরের টুকরো, শলাকা, ছেনি, হাতুড়ি ইত্যাদি নানাবিধ জিনিস, যন্ত্রপাতি। মশালটা স্তম্ভর গায়ে একটা আংটায় গেঁথে অলংকরণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটা সূচিমুখ লৌহশলাকা তার আর হাতুড়ি তুলে নিলেন শঙ্খপাল। হঠাৎ মূর্তির এক জায়গাতে চোখ পড়তেই থেমে গেলেন তিনি। বিস্ময়ে তার দুটো হাতই ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে গেল। অমোঘবর্ষ বরাভয় মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ডান হাতের সেই বরাভয় মুদ্রায় তর্জনীটা নেই! আঙুলটা যেন কেটে ফেলা হয়েছে হাত থেকে!

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে শঙ্খপাল তাকালেন মূর্তিবেদির নীচে। বেদির একপাশে আঙুলটাকে পড়ে থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিলেন তিনি। আঙুলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে তিনি অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগলেন কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা? পাথরে কি কোনও চিড় ছিল? যে কারণে আপনাথেকেই খসে পড়েছে আঙুলটা। না কি কেউ সত্যিই কেটে নামিয়েছে রাজমূর্তির ডান হস্তের তর্জনী?

স্বয়ং রাট্টাধীপ অমোঘবর্ষ এসে দ্বারোদ্‌ঘাটন করছেন কৈলাস মন্দিরের। তবে?'

বেশ কিছুক্ষণ এই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলো পর্যালোচনা করার পর শঙ্খপাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে নিশ্চয়ই পাথরে কোথাও চিড় বা সূক্ষ্ম ফাটল ছিল। মূর্তির গায়ে ছেনি-হাতুড়ির ঘায়ে যে কম্পন সৃষ্টি হয় তাতে আরও বিস্তৃত হয়েছে ওই ফাটল, তারপর এক সময় দেহ থেকে

BanglaBook.org

খসে পড়েছে আঙুলটা। অবশ্য খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই ব্যাপারটাতে। এক ধরনের বনজ উদ্ভিদের বজ্রপ্রলেপ পাওয়া যায় পাহাড়ের মাথার ওপর ওই জঙ্গলে। সে প্রলেপ মজুত আছে এখানেই। সে প্রলেপ এমন শক্তিশালী যে সবকিছু জোড়া যায় তা দিয়ে।

সেই আঠা দিয়েই ভাস্কর জুড়ে দিতে পারেন সম্রাটের ছিন্ন তর্জনী। পাথরের তৈরি আঙুলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ভাস্কর শঙ্খপাল ভাবতে লাগলেন কী করবেন তিনি। এই আঙুলটাই তিনি জোড়া দেবেন, নাকি নতুন একটা তর্জনী বানিয়ে সেটা জোড়া দেবেন রাজহস্তে প্রলেপ দিয়ে?

অভ্যস্ত হাতে প্রস্তরখণ্ডর ওপর বাটালি ঘসে কাজ করে চললেন তিনি। এক সময় সেই ক্ষুদ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল। সেই তর্জনী ঠিক হুবহু ছিন্ন রাজ তর্জনীর মতো। সে কাজ শেষ করে প্রলেপ ভাণ্ড থেকে অতি সাবধানে বজ্রপ্রলেপ নিয়ে নব নির্মিত তর্জনীটা সম্রাটের হাতে প্রতিস্থাপন করলেন তিনি। তারপর শঙ্খপালের শেষ কাজ শঙ্খচূর্ণ মেশানো পাথরের গুড়োর প্রলেপ দেওয়া ওই আঙুলের ওপর—যাতে ক্ষতচিহ্ন মুছে যায় ওই প্রলেপের আড়ালে।

সে কাজ করার জন্য যখন তিনি ভাণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন, ঠিক তখনই মূর্তির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। মূর্তিটা যেন একটু নড়ে উঠল বলে মনে হল শঙ্খপালের! পাত্র হাতে থমকে গেলেন তিনি।

বিস্মিত শঙ্খপাল অবশ্য মূর্তির দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই ধরে ফেললেন ব্যাপারটা। কোনও মানুষের ছায়া এসে পড়েছে মূর্তির গায়ে। আসলে সেই ছায়াটাই কাঁপছে। ঘটনাটা অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। তিনি দেখলেন, কিছুটা তফাতেই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন!

শঙ্খপাল ভালো করে তাকালেন চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুকের দিকে। একটা শুভ্র বস্ত্রখণ্ড জড়ানো আছে তার জানু থেকে শরীরে। তার শেষপ্রান্ত দিয়ে মাথায় ঘোমটা টানা হয়েছে। বাহু ও পদযুগল উন্মুক্ত। মুখেও একটা ছোট বস্ত্রখণ্ড আছে তার। শুধু তার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

তার এক হাতে ধরা আছে ছোট্ট একটা ঝাঁটা। পোশাক আর ঝাঁটাটাই লোকটাকে চিনিয়ে দিচ্ছে। তিনি কোনও জৈন সন্ন্যাসী।

তাঁর দিকে তাকিয়ে শঙ্খপাল মনে মনে ভাবলেন, 'এ লোকটা কোথা থেকে এল?' তারপর তাঁর মনে হল চরণন্দ্রী পাহাড়ের শেষ প্রান্তে কয়েকটা গুহাতে জৈন সন্ন্যাসীরা থাকেন। হয়তো লোকটা তাদেরই কেউ হবেন।

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি রাজমূর্তির দিকে নিবদ্ধ। এক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন অমোঘবর্ষর মূর্তির দিকে। শঙ্খপাল কিছুক্ষণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?'

সন্ন্যাসী এবার ফিরে তাকালেন শঙ্খপালের দিকে। তারপর শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি জৈন সন্ন্যাসী। পথে পথে ঘুরে বেড়াই, ভিক্ষা অন্নে গ্রাসাচ্ছাদন করি। এ মূর্তি আপনি বানিয়েছেন?'

শঙ্খপাল বললেন, 'আমি কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। এ মূর্তি আমিই বানিয়েছি।'

জৈন সন্ন্যাসী একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'রাট্রাধীপ মহারাজ অমোঘবর্ষকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন আপনি? এ মূর্তি আপনি কীভাবে নির্মাণ করলেন? এখানকার নটী মূর্তিগুলোও তো বানানো হয়েছে তাদের চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করে।'

এই প্রশ্ন শুনে মৃদু অস্বস্তিবোধ করলেন ভাস্কর শঙ্খপাল। তিনি জবাব দিলেন, 'কর্মোপলক্ষে বেশ কয়েকবার রাজধানী মান্যখেতে গেলেও রাজদর্শন হয়নি আমার। তবে শীঘ্রই হবে। সম্রাট অমোঘবর্ষর মহাসন্ধিবিগ্রহী রাজদরবারে ডাক পাঠিয়েছেন আমাকে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের নির্ঘণ্ট জানাবার জন্য। একই সঙ্গে সম্রাট এই মূর্তির আবরণ উন্মোচনও করবেন ওই দিন।'

'সম্রাটকে না দেখেই কীভাবে আপনি নির্মাণ করলেন এই মূর্তি?' আবার প্রশ্ন করলেন জৈন সন্ন্যাসী। তাঁর মুখ ঢাকা থাকলেও প্রশ্নটা করার সময় যেন তাঁর চোখের তারায় কৌতুক ফুটে উঠল।

শিল্পী জবাব দিলেন, 'সম্রাট অমোঘবর্ষর কিছু কাঠ খোদাই ছবি পাঠানো হয়েছিল আমার কাছে। তা দেখেই এই মূর্তি রচনা করেছি আমি। মহাসন্ধিবিগ্রহী নিজে এসে প্রত্যক্ষ করে গেছেন এই মূর্তি। তিনি বলেছেন

BanglaBook.org

যে এই মূর্তিতে জীবন্ত হয়ে আছেন রাজা। কৈলাস মন্দিরের প্রধান শিল্পীমণ্ডলীও এই মূর্তি দেখে একই কথা বলেছেন। আপনার কেমন মনে হচ্ছে মূর্তিটা?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি শিল্পকার্য কার থেকে শিখেছেন।'

শঙ্খপাল জবাব দিলেন, 'আমার শিক্ষক ছিলেন মহাভাস্কর বিষ্ণুপাল।'

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি হিন্দু ছিলেন, নাকি জৈন?'

শিল্পী জবাব দিলেন, 'তিনি শিল্পী ছিলেন। তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন শিল্পীর কাছে শিল্পই ঈশ্বর। শিল্পই হল শিল্পীর মোক্ষ লাভের পথ।'

সন্ন্যাসী আবার তাকালেন মূর্তিটার দিকে। তারপর বললেন, 'আমি জৈন সন্ন্যাসী। তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ থেকে মহাবীর আমাদের "সম্যকদর্শনে"র শিক্ষা দিয়ে গেছেন, "সম্যকদর্শন" শব্দর অর্থ হল "সঠিক অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যের অনুসন্ধান।" সম্যকদর্শনই আমার ব্রত। তাই আমার কাছে "সত্যই হল সুন্দর।" আপনার মূর্তিতে সত্য ধরা দিচ্ছে না। তাই এ মূর্তি আমার চোখে সুন্দর নয়।'

মন্দির চত্বরে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় এতটা চমকে উঠতেন না শঙ্খপাল। যতটা তিনি চমকে উঠলেন জৈন শ্রমনের কথা শুনে। সত্যের কী অপলাপ হয়েছে সম্রাটের মূর্তিতে?

কাঠ খোদাইতে রাজার যে ছবি ছিল তাই তো তিনি হুবহু ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ভাস্কর্যে। তবে সত্যের অপলাপ কোথায় হল। শ্রমনের কথা শুনে অমোঘবর্ষর মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তব্যের মর্মদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু মূর্তির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরও সন্ন্যাসীর বক্তব্য অনুধাবন করতে পারলেন না শঙ্খপাল। তাঁর কাছ থেকেই ব্যাপারটা বোঝার জন্য পিছনে ফিরে তাকালেন তিনি। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। চারপাশে তাকিয়েও সেই সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেন না শঙ্খপাল। যেমন হঠাৎ এসেছিলেন ঠিক তেমনই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন সেই শ্রমন। শঙ্খপাল অবশ্য বেশ অবাক হলেন ব্যাপারটাতে।

আকাশের দিকে একবার তাকালেন শঙ্খপাল। বুড়ি চাঁদ ক্ষীণ হয়ে ধীরে ধীরে মুছে যেতে বসেছে। শুকতারা ফুটে উঠবে এখনই। বেশ অনেকটা

BanglaBook.org

সময় নষ্ট হল ওই সন্ন্যাসীর আগমনে। শঙ্খপাল আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন। শঙ্খচূর্ণর প্রলেপ লাগাতে লাগলেন কর্তিত আঙুলের ওপর। তার কাজ যখন শেষ হল, ঠিক তখনই মোরগের ডাক শোনা গেল চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথায়। আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। শুকতারা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেরি ভেজে উঠবে। মন্দির চত্বরে সমবেত হবে শিল্পী আর মজুরের দল। অশ্বারোহী সৈনিকরাও হাজির হবে। হাজির হবে পাথর টানা হাতির দল। নির্মাণ যারা মন্দির নির্মাণ শেষ হবার পর, পড়ে থাকা পাথরখণ্ডগুলোকে সরিয়ে ফেলবে মন্দির চত্বর থেকে। আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই মজুরদের চিৎকার, হ্রেষারব আর বৃহংতিতে মুখরিত হয়ে উঠবে মন্দির চত্বর। কাজ করে শঙ্খপাল একবার তাকালেন মূর্তিটার দিকে। না, কর্তিত তর্জনীর ব্যাপারটা আর ধরা যাচ্ছে না। একেবারে নিখুঁতভাবে তর্জনীটা জোড়া দিয়েছেন তিনি। নিজের কাজে আশ্বস্ত হলেন শিল্পী। তারপর আগের মতো মূর্তির চারপাশ চর্মআচ্ছাদনে ঢেকে দিয়ে তিনি মন্দির চত্বর থেকে রওনা হলেন গ্রামের দিকে।

২

'তাহলে আমার আর "এলাপুর ভাস্কর" হওয়া হল না?'

একটু হতাশ ভাবেই শঙ্খপালের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলল অশনি।

শঙ্খপাল তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার ছোট্ট কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'হবে হবে। একদিন নিশ্চয়ই এলাপুর ভাস্কর হবে। কাজের কি কোনও শেষ আছে মন্দিরে?'

অশনি বলল, 'কীভাবে হবে? তুমি তো বলেছ সম্রাট অমোঘবর্ষর মূর্তির অলংকরণের কাজও শেষ। কতবার তোমাকে বললাম যে মূর্তির পাদুকা অলংকরণের কাজটা আমাকে করতে দাও, তাও দিলে না। তুমি কি পারতে না ও কাজটা আমাকে দিয়ে করাতে?'

প্রশ্নটা শুনে চুপ করে গেলেন শঙ্খপাল। প্রধান ভাস্কর হিসাবে বর্তমানে শিল্পী নিয়োগের ক্ষমতা তাঁর আছে ঠিকই, এবং এ-কথাও ঠিক যে অশনির

BanglaBook.org

মতো একজন দ্বাদশবর্ষীয় বালককে সহকারী শিল্পী হিসাবে নিয়োগও করেছেন, কিন্তু তাঁকেও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। রাজা প্রথম কৃষ্ণর আমল থেকে যে নিয়ম চলে আসছে। নিয়োগের শর্ত হল বংশানুক্রমে শিল্পী-ভাস্কর হতে হবে। নথিভুক্ত করতে হবে শিল্পীর পিতা-মাতার নাম। অথবা কৈলাস মন্দিরের কোনও ভাস্করের কাছে অন্তত দশ বছর শিক্ষানবিশ থাকতে হবে তাকে।

একাজে নিযুক্ত সেরা শিল্পীদের বৎসরান্তে একদিন রাষ্ট্রকূটধীপ তাঁর মহাসন্ধিবিগ্রহী অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে 'এলাপুর ভাস্কর' উপাধি প্রদান করেন। 'এলাপুর ভাস্কর' অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যতম সেরা ভাস্কর।

কৈলাস মন্দির নির্মাণ কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য যে শর্তর প্রয়োজন তার কোনওটাই যে পূরণ হচ্ছে না অশনির ক্ষেত্রে। না আছে তার তেমন বংশ পরিচয়, না হয়েছে তার কোনও ভাস্করের কাছে দশ বছরের শিল্প শিক্ষা। এলাপুর গ্রামের শিল্পী-মজুরদের দল ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই মন্দির চত্বরে। তবে অশনি মাঝে মাঝে ঢোকে মন্দির চত্বরে কখনও ফল বা জলের পাত্র নিয়ে শঙ্খপালকে দেবার জন্য। প্রহরীরা তাকে বাধা দেয় না সে প্রধান ভাস্করের আশ্রিত বলে।

তা ছাড়া একবার তারা ভুলবশত ছেলেটাকে আর একটু হলেই মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিল। সেজন্য বাচ্চাটাকে দেখলে তাদের মনে একটা মৃদু অপরাধবোধও কাজ করে। তাই তারা তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয়। শঙ্খপাল অবশ্য তার আসার কারণটা বোঝেন।

অশনির প্রশ্ন শুনে এলাপুর ভাস্কর শঙ্খপাল চুপ করে থেকে বললেন, 'শুনেছি সম্রাট অমোঘবর্ষ পশ্চিম সমুদ্রে এক দ্বীপভূমিতে পাহাড় কেটে এমনই এক গুহা মন্দির নির্মাণ করতে চলেছেন। কলচুরি রাজবংশের আমলে কাজ শুরু হয়েছিল সেখানে। সম্রাট অমোঘবর্ষর ইচ্ছা সে কাজ সম্পন্ন করার। মহাসন্ধিবিগ্রহী সে কাজের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে সেখানে পাঠাতে চান। সেখানে শিল্পী নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে আমার। তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব আমি।'

কথাটা শুনে অশনি বলল, 'সে জায়গা কি আর কৈলাস মন্দিরের মতো হবে? তা ছাড়া মাকে যে খুঁজে পেলাম না এখনও। তাকে ছাড়া আমি যাই কীভাবে?'

BanglaBook.org

তার দুঃখটা চাপা দেওয়ার জন্য শঙ্খপাল বললেন, 'পাবে পাবে, তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। আর আমি তোমাকে যেখানে নিয়ে যাব সে জায়গাও খুব সুন্দর। কলচুরিরা নাকি ইতিমধ্যেই গুহাময় সেই দ্বীপে কিছু হস্তিমূর্তি নির্মাণ করে রেখেছেন। ওই হস্তিগুহাকে আমি আর তুমি মিলে কৈলাস মন্দিরের মতো বানিয়ে তুলব।'

শঙ্খপালকে এবার রওনা হতে হবে মহাসন্ধিবিগ্রহীর ডাকে সম্রাটের দরবারে। সম্রাট অমোঘবর্ষকে দর্শন করবেন তিনি। তাই এখনই রওনা হতে হবে তাঁকে। অশ্বপৃষ্ঠে সেখানে পৌঁছোতে হবে, নইলে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাবে। তাই তিনি অশনিকে বললেন, 'আমি এখন রাজধানী মান্যখেতে যাব। তোমার জন্য সেখান থেকে কী আনব বলো?'

তার কথা শুনে অশনি বেশ উৎফুল্লভাবে বলল, 'তুমি মান্যখেতে যাচ্ছ? হয়তো আমার মা সেখানে আছেন। আমাকে তুমি সেখানে নিয়ে যাবে?'

শঙ্খপাল বললেন, 'সেখানে আজ তোমাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। মহাসন্ধিবিগ্রহীর ডাকে আমি যাচ্ছি। তোমাকে তারা দরবারে প্রবেশ করতে দেবেন না। তোমার জন্য সেখান থেকে কী আনব বলো?'

অশনি মৃদু অভিমানের সুরে বলল, 'কিছুই আনতে হবে না। যদি রাজদরবারে আমার মা-কে দেখো তবে তাকে বোলো অশনি তোমার কাছে আছে। কথাটা শুনলেই তিনি চলে আসবেন এখানে তোমার সঙ্গে।'

শঙ্খপাল জানতে চাইলেন, 'আমি তো তাঁকে কোনওদিন দেখিনি? কী ভাবে চিনব তাঁকে?'

অশনি জবাব দিল, 'দরবারে নটীদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে সুন্দর দেখবে বুঝবে তিনিই আমার মা।'

অশনির মুখে এতক্ষণ পর হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'আমি একটা ক্ষুদ্র মূর্তি বানাচ্ছি। সেটা দেখলে চমকে যাবে তুমি। আর সম্রাট অমোঘবর্ষ সেটা দেখলে আমাকে নিশ্চয়ই তোমার মতো 'এলাপুর ভাস্কর' উপাধি দেবেন।'

শঙ্খপাল বললেন, 'তা হলে তো সে মূর্তি আমাকে দেখতেই হবে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শঙ্খপাল। উঠানে একজন মজুর দাঁড়িয়েছিল ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে। দ্রুতগামী অশ্বের পিঠে চেপে কৈলাস মন্দিরের

BanglaBook.org

প্রধান ভাস্কর রওনা হয়ে গেলেন রাজধানী মান্যখেতের দিকে। পথে যেতে যেতে অশনির কথাই ভাবতে লাগলেন শঙ্খপাল। ছেলেটার ওপর বড় বেশি মায়া পড়ে গেছে তাঁর। অথচ তাঁর সঙ্গে অশনির যোগাযোগের সময়কাল এক বৎসরও অতিক্রম করেনি। আর তার সঙ্গে অশনির সাক্ষাৎ বড় অদ্ভুতভাবে।

বর্ষার সময় কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকে শিল্পী-ভাস্কর-মজুরদের। প্রবল বর্ষণে চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথা থেকে জলধারা নেমে আসে মন্দির চত্বরে। কখনও বা পাথর খসে পড়ে। তাই একপক্ষ কাল কাজ বন্ধ থাকে। শ্রমিক-ভাস্করদের ছুটি থাকলেও যতদিন না মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের অবসর বলে কিছু নেই, নানা কাজের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। কাজেই ঝলমলে সেই সকালেও চরণন্দ্রী পাহাড়ের পাদদেশে নিজের পাথুরে কক্ষে বসে কৈলাস মন্দিরের অলিন্দের একটা থামের নকশা আঁকছিলেন তিনি। হঠাৎ উঠোনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখলেন মন্দিরের পাহারাদার অশ্বারোহী রক্ষীরা ধরে এনেছে এক বালককে। মন্দির চত্বরের বাইরে তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় রক্ষীদের। তাকে আটক করার পর তার থেকে উদ্ধার করা হয় কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি পশুপাখির মূর্তি।

সৈনিকদের ধারণা সে কোনওভাবে নির্জন মন্দির চত্বরে ঢুকে মন্দির গাত্র থেকে ছিন্ন করে এনেছে মূর্তিগুলো। যদিও বালক দাবি করছে যে মূর্তিগুলো সে নিজেই বানিয়েছে। রাজ আদেশে এ কাজের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় থরথর করে কাঁপছে ছেলেটা। মূর্তিগুলো দেখতে দেখতে শঙ্খপাল তাকে প্রশ্ন করলেন, 'মন্দিরগাত্র থেকে তুমি মূর্তিগুলো ছিন্ন করলে কেন? জানো এর শাস্তি কী? প্রাণদণ্ড।'

ছেলেটা তাঁর কথা শুনে কেঁপে উঠে বলল, 'ওগুলো ছিন্ন মূর্তি নয়। ওগুলো আমি নিজে তৈরি করেছি।'

শঙ্খপাল বললেন, 'একথা আমি বিশ্বাস করি না। এ তোমার কর্ম নয়। কৈলাস মন্দিরের কোনও এলাপুর ভাস্করের কাজ।'

আতঙ্কগ্রস্থ ছেলেটা বলে উঠল, 'না, না, ওগুলো আমিই বানিয়েছি। তুমি আমাকে পাথর দাও আমি তোমাকে এখনই তৈরি করে দিচ্ছি ওই

BanglaBook.org

রকম মূর্তি।'

ছেলেটা এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলল যে ধন্দে পড়ে গেলেন প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। যদিও ব্যাপারটা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তবু তাকে একবার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি তাকে বন্ধনমুক্ত করতে বললেন। তিনি তাকে ছোট একখণ্ড পাথর এনে দিলেন। ছেলেটার কাছে তার অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বাটালি আর হাতুড়িও পাওয়া গেছিল। যা দিয়ে সে সম্ভবত মন্দির গাত্র থেকে ছিন্ন করেছে মূর্তিগুলো। একজন রক্ষী সেগুলো তুলে দিল তার হাতে।

কাজ শুরু করল ছেলেটা। আর তাকে রক্ষীদের ঘেরাটোপে রেখে শঙ্খপাল ছুটলেন কৈলাস মন্দিরে কোথা থেকে মূর্তিগুলো সংগ্রহ করেছে তা স্বচক্ষে দেখে আসার জন্যে। কোথায় কোথায় মন্দিরগাত্রে ওই সব ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি আছে তা প্রধান ভাস্করের নখদর্পণে। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে সে জায়গাগুলো পরিদর্শন করে বেশ আশ্চর্য হলেন শঙ্খপাল। সব মূর্তিই সস্থানে আছে। কোনও মূর্তিই ছিন্ন করা হয়নি মন্দিরগাত্র থেকে!

এরপর শঙ্খপাল যখন ফিরে এলেন ততক্ষণে মূর্তি নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে সেই বালকের। তার হাতে শোভা পাচ্ছে অতীব সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি হস্তিমূর্তি। হাটু মুড়ে বসে আছে হাতিটা। ঠিক যেন কৈলাস মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে বসে থাকা হস্তিমূর্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ!

ভুল ভাঙল শঙ্খপাল আর রক্ষীদের। মুক্ত হল ছেলেটা। রক্ষীরা বিদায় নেওয়ার পর তিনি কাছে ডেকে নাম পরিচয় জানতে চাইলেন ছেলেটার। সে তার নাম বলল অশনি। অনেক দূরের এক গ্রাম কুন্দুরু থেকে ঘুরতে ঘুরতে এলাপুরে চলে এসেছে সে। হ্যাঁ, সে লেহুদ গোত্রের। তার পিতা ছিল কাষ্ঠশিল্পী, দারুকাঠের খেলনা বানাত সে। আর তার মা ছিল 'নটী' অর্থাৎ নর্তকী। অশনির পিতা নাকি অদ্ভুত সুন্দর খেলনা বানাতেন। তার কাছেই শিল্প পাঠের হাতেখড়ি হয়েছিল অশনির।

একদিন হঠাৎ সর্পাঘাতে মৃত্যু হল তাঁর। অশনির একমাত্র অবলম্বন তখন হয়ে দাঁড়ালেন তার মা। বাবার অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনিও চাইলেন অশনি যেন এলাপুর ভাস্কর হয়ে ওঠে। নৃত্যগীতের জন্য অশনিকে একলা ফেলে বহু দূর দূর যেতে হত তাঁকে। তিনি অশনিকে বলতেন, 'যদি আমি কোনওদিন হঠাৎ আর না ফিরে আসি তবে শেষ ইচ্ছাটা

BanglaBook.org

পূরণ কোরো। এলাপুর ভাস্কর হোয়ো তুমি।'

সত্যি তাঁর মা আর একদিন হারিয়ে গেলেন কোথাও। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে আর মাকে খোঁজার জন্যে শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছেড়েছে অশনি। ঘুরতে ঘুরতে সে চলে এসেছে চরণন্দ্রী পাহাড়ের পাদদেশে এলাপুর গ্রামে। অশনির হাতের কাজ দেখে আর তার কথা শুনে তার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হলেন শঙ্খপাল। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি ভাবছিলেন তেমন কাউকে পেলে তাকে তিনি ভাস্কর্য শিক্ষা দেবেন।

তিনি যা জানেন তা সব কিছু শেখাবেন তাকে। শঙ্খপাল তাকে বললেন, 'আমি এলাপুরের প্রধান ভাস্কর। আমার কাছে শিল্প শিক্ষা করবে তুমি?'

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলেটা জবাব দিল 'হ্যাঁ।'

তারপর থেকে শঙ্খপালের কাজেই রয়ে গেছে অশনি। ইতিমধ্যে সে ক্ষুদ্র মূর্তি নির্মাণে এলাপুর ভাস্করদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। শিষ্য নির্বাচনে ভুল করেননি শঙ্খপাল। শঙ্খপালের ছোট বাড়িটাতে একমনে কাজ শেখে সে। ভাস্কর্যই তার ধ্যানজ্ঞান। তার বাইরে শুধু সে একটাই কথা ভাবে। তার মায়ের কথা। কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে তাকে? একজন দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের ক্ষেত্রে এ ভাবনা স্বাভাবিক। বড় হবার সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো একদিন তার এ ভাবনা মুছে যাবে। অশনিকে নিয়ে নানা কথা ভাবতে-ভাবতে পাহাড়-অরণ্য, ছোট-ছোট জনপদ অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন শঙ্খপাল।

BanglaBook.org

৩

মান্যখেতে। রাট্টা সম্রাটদের রাজধানী। কলচুরি রাজাদের আমলে এ নগরীর পত্তন হয়। তারপর বাতাপি চালুক্যরা ক্ষমতায় এসে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে একে গড়ে তোলেন। বেরারের সামন্তরাজ দান্তিদুর্গ বাতাপি চালুক্য রাজ কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে চালুক্য সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল জয় করে নেন। চালুক্য সম্রাটের পতন ঘটলে দান্তিদুর্গর উত্তরসূরী রাজা কৃষ্ণ এই প্রাচীন নগরীতে রাট্টা সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই থেকে এই

মান্যখেতেই রাট্টা সাম্রাজ্যের রাজধানী। এ নগরী এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে রাট্টা রাজবংশের সঙ্গে। বহিঃপৃথিবীতে লোকে এ রাজবংশকে বলে 'মান্যখেতের রাট্টা।'

অশ্বপৃষ্ঠে শঙ্খপাল যখন নগরীর তোরণদ্বারে এসে পৌঁছোলেন তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। বিশাল তোরণ। তার গায়ে খোদিত আছে রাট্টা বা রাষ্ট্রিক সম্রাটের প্রতীক পঞ্চমহাশব্দর চিত্র। বিশাল তোরণের মাথায় উড়ছে সাদা পতাকা।

দ্বাররক্ষীরা গতিরোধ করল এলাপুর ভাস্করের অশ্বের। শঙ্খপালকে মহাসন্ধিবিগ্রহী এক বিশেষ 'সুবর্ণা' বা স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন। সেটাই শঙ্খপালের মান্যখেতে বা রাজপ্রাসাদে ঢোকার ছাড়পত্র। এই সুবর্ণা দেখিয়ে সাম্রাজ্যের যে-কোনও স্থানে যেতে পারেন শঙ্খপাল। অশ্বপৃষ্ঠেই তিনি পোশাক থেকে সেই বিশেষ সুবর্ণা বার করে দেখালেন রক্ষী বাহিনীকে। দ্বাররক্ষী বাহিনীর প্রধান দেখলেন সেই সুবর্ণায় খোদিত আছে পতাকা, শঙ্খ, পদ্মা, শ্বেতছত্র ও ঢাকের ছবি! এগুলি রাট্টা সম্রাট অমোঘবর্ষর ব্যক্তিগত প্রতীক। সুবর্ণাটা দেখা মাত্রই রক্ষীপ্রধান অশ্বারূঢ় শঙ্খপালের প্রতি সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে নগরীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন।

রাজধানী মান্যখেতে প্রবেশ করলেন শঙ্খপাল। পাথুরে মসৃণ রাস্তা সোজা চলে গেছে নগরীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত রাজপ্রাসাদের দিকে। রাস্তায় লোকজনের ভিড়। সাধারণ মানুষরা চলেছে পদব্রজে। আর বিত্তশালীরা গো-শকটে বা অশ্বপৃষ্ঠে। দেশের প্রধান বাণিজ্য নগরী মান্যখেতে। নানা দেশের নানা জাতের মানুষ আসে এখানে। পারসীক, আরব, মিশরীয়রা যেমন আসে তেমনই আসে দূর সাগরপাড়ের সাদা চামড়ার লোকরা। রাস্তার দু-পাশে সার সার বিপণিতে কেনাবেচা চলছে। খন্দেশের তুলা, উজ্জয়িনীর মসলিন, মাইশূর বন্দরের ধূপ ও চন্দনকাঠ, বীজাপুরের তাম্রখণ্ড থেকে শুরু করে গোলকুণ্ডার হিরা, সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে। স্বর্ণমুদ্রা সুবর্ণা বা গদ্যনকের বিনিময়ে কেনাকেটা চলছে এখানে। আর বিপণিহীন লহুদরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে বেতের ঝুড়ি, কাঠের খেলনা, চর্মদ্রব্য। রাস্তার প্রধান চক সরগরম। নারী ও শিশুর দল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওরা ক্রিতদাস হিসাবে বিক্রি হতে এসেছে।

চক পেরিয়ে রাস্তার পাশে বিশাল এক মন্দির। মাথার ওপর স্বর্ণধ্বজা।

BanglaBook.org

মন্দিরের প্রবেশ তোরণের মাথার ওপর শ্যেনপক্ষীর সোনার মূর্তি। রাট্টা সম্রাটদের কুলদেবী রাষ্ট্রশ্যেনা বা লাটানা দেবীর মন্দির এটি। পাথরের দু-পাশ দেখতে-দেখতে শঙ্খপাল এক সময় পৌঁছে গেলেন রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে।

প্রবেশ তোরণে ঘোড়া থেকে নামতেই রক্ষীরা ঘিরে ধরল তাঁকে। একজন মহাসামন্ত এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। শঙ্খপাল সুবর্ণাটা বাড়িয়ে তাঁর আসার কারণ ব্যক্ত করলেন তার কাছে। একজন সাধারণ পোশাক পরা লোকের কাছে সম্রাটের বিশেষ চিহ্ন আঁকা সুবর্ণা দেখে যেন বেশ বিস্মিতই হলেন মহাসামন্ত। শঙ্খপালকে প্রবেশ তোরণে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রথমে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে শঙ্খপালকে নিয়ে চললেন রাজদরবারের উদ্দেশ্যে।

রাট্টা সম্রাট বীরনারায়ণ রাজাধিরাজ অমোঘবর্ষর দরবার। সোনা-রুপোর পাতে মোড়া স্তম্ভ, দেওয়াল গাত্রের অপরূপ কারুকাজ ঝলমল করছে হাজার প্রদীপের আলোতে। বিশাল কক্ষের শেষ প্রান্তে একটা উঁচু বেদিতে দারুকাঠের সিংহাসনে স্বর্ণভূষণে সজ্জিত হয়ে বসে আছেন সম্রাট অমোঘবর্ষ। প্রৌঢ়ত্বের সীমা তিনি অতিক্রম করেছেন অনেকদিন। রাজ সিংহাসন থেকে দু-পাশে কিছুটা তফাতে সম্রাটের একপাশে বসে আছেন মহাসন্ধিবিগ্রহী বা মুখ্যমন্ত্রী, ও তাঁর অধীনস্থ প্রধানমন্ত্রী। আর অন্যপাশে বসে আছেন মহাক্ষপতনধিকৃত বা বিদেশমন্ত্রী। এবং দণ্ডনায়েক বা সেনাপতি। এরা চারজনই রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে সম্রাটের অবলম্বন। অন্যান্য মহামাত্য, মহাসামন্তরা কক্ষের দু-পাশে সার বেঁধে বসে আছেন।

সেই মহাসামন্ত শঙ্খপালকে নিয়ে প্রবেশ করলেন দরবার কক্ষে। দু-পাশে সার বেঁধে বসে থাকা অন্য মহাসামন্তদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শঙ্খপালকে দাঁড় করানো হল সম্রাটের সিংহাসনের নীচে বেশ কিছুটা তফাতে।

শঙ্খপালকে দেখতে পেয়ে মহাসন্ধিবিগ্রহী কী যেন বললেন সম্রাটকে। সম্রাট যেন একবার তাকালেন শঙ্খপালের দিকে। উদাসীন অথবা তাচ্ছিল্যময় দৃষ্টি। তাঁর মুখের ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না। শঙ্খপাল মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন সম্রাটকে।

সম্রাট অমোঘবর্ষ শঙ্খপালের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপের

BanglaBook.org

প্রয়োজন অনুভব করলেন না। পরামর্শ হয়েই ছিল। তিনি তাকালেন মহাসন্ধিবিগ্রহীর দিকে। মহাসন্ধিবিগ্রহী সম্রাটের চোখের ইশারা বুঝতে পেরে শঙ্খপালের উদ্দেশে বললেন, 'মহামহিম সম্রাট রাট্টাকুলশ্রেষ্ঠ বীরনারায়ণ অঘোমবর্ষ জ্ঞাত হয়েছেন যে এলাপুরস্থিত কৈলাস মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। রাজ জ্যোতিষী আগামী পূর্ণিমাতিথিতে মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও মূর্তির আবরণ উন্মোচনের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন। সম্রাট ওই দিন পদার্পণ করবেন এলাপুরস্থিত কৈলাস মন্দিরে। প্রধান ভাস্কর আপনার এ বিষয় কোনও বক্তব্য আছে?'

পূর্ণিমা তিথি মানে মাঝে মাত্র তিন রাত। অবশ্য তার মধ্যেই যেটুকু কাজ বাকি আছে তা সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই শঙ্খপাল মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন তাঁর কিছু বলার নেই।

মহাসন্ধিবিগ্রহী বললেন, 'দ্বিতীয় কথা হল, আপনি হয়তো শুনেছেন যে পশ্চিম সাগরের হস্তিদ্বীপে সম্রাট মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছেন। সে কাজও যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করতে চান সম্রাট। সম্রাট কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্করকেই এই দায়িত্ব প্রদান করতে ইচ্ছুক। কৈলাস মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ক'দিন পরই হস্তিদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করবে শিল্পীদের দল। আপনি কি এই দায়িত্ব পালনে আগ্রহী?'

সম্রাটের ইচ্ছা মানেই তো আদেশ। শঙ্খপাল নিজেও আগ্রহী এ ব্যাপারটাতে। তাই তিনি বললেন, 'সম্রাট আমাকে যে কাজের দায়িত্ব ভার দেবেন সে কাজেই আমি আগ্রহী।'

আবছা হাসলেন মহাসন্ধিবিগ্রহী। তারপর হাত নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন আপাতত তাঁর কথা শেষ।

মহাসন্ধিবিগ্রহীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভাগৃহতে রাখা একটা বিশাল ভেরিতে ঘা দিল এক ভৃত্য। সভা ভেঙে গেল। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট। তাঁর বিশ্রামের সময় হয়ে গেছে। তাঁর পারিষদবর্গ ও সভাকক্ষের সবাই উঠে দাঁড়ালেন সম্রাটকে দেখে। শঙ্খপালের সঙ্গে আসা মহাসামন্ত ইশারায় সরে দাঁড়াতে বললেন শঙ্খপালকে। একপাশে সরে দাঁড়ালেন শঙ্খপাল।

সম্রাট যখন ঠিক তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক তখনই শঙ্খপালের নজর পড়ল সম্রাটের ডান হাতের পাতায়। অন্য আঙুলগুলোতে হিরকখচিত

BanglaBook.org

অঙ্গুরীয় ঝলমল করলেও সম্রাট অমোঘবর্ষর তর্জনীটা নেই।

কয়েক পা এগোতেই শঙ্খপাল দেখতে পেলেন প্রাসাদের একপাশ থেকে আসছেন মহাসন্ধিবিগ্রহী। সম্ভবত তিনি সম্রাটকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছেন। কিছুটা দূর থেকেই তিনিও দেখতে পেলেন শঙ্খপালকে। হাতের ইশারায় তিনি থামতে বললেন তাঁকে। একটা স্তম্ভর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন শঙ্খপাল।

মহাসন্ধিবিগ্রহী এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। তারপর মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'সম্রাটকে কেমন দেখলেন?'

শঙ্খপাল মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ঠিক সম্রাটের মতোই।'

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মহাসন্ধিবিগ্রহী। তিনি শঙ্খপালের এই জবাব শুনে হাসলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'সব কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন তো?'

প্রধান শিল্পী জবাব দিলেন, 'সম্পন্নই বলা যায়। সামান্য যা বাকি আছে তা আগামী কালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'মূর্তি নির্মাণের কাজ?'

'সে কাজও সম্পন্ন। আপনি তো নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন সেই কাজ। আজ সম্রাটকে স্বচক্ষে দেখে বুঝতে পারলাম তার মূর্তি নির্মাণ সঠিক ভাবে করতে পেরেছি আমি। মূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে আমার অবচেতনে যদি সামান্য কিছু সংশয় থাকে তা মুছে গেছে আমার মন থেকে।' শঙ্খপাল একথা বললেও হঠাৎ কেন জানি এতক্ষণ পর তাঁর মনে পড়ে গেল সেই জৈন সন্ন্যাসীর কথা। তাঁর কথা কি ঠিক?

মহাসন্ধিবিগ্রহী খুশি হলেন তাঁর কথায়। তারপর চাপা স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই মূর্তিটা নিয়েই আমার চিন্তা বেশি। সম্রাট অঘোমবর্ষ সম্ভবত পিতৃ-পিতামহর সনাতন হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছেন। জিনসেন নামের এক জৈন সন্ন্যাসী সম্রাটের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে আর তেমন খুঁটিয়ে দেখবেন না। তিনি আর এখন সনাতন ধর্মর প্রতি তেমন আগ্রহী নন। তিনি ভালো করে দেখবেন তাঁর মূর্তিটা...।'

তাঁর কথার মাঝেই শঙ্খপাল বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে যে

BanglaBook.org

তিনি দক্ষিণ সাগরে মন্দির নির্মাণের জন্য লোক পাঠাচ্ছেন?'

মহাসন্ধিবিগ্রহী জবাব দিলেন, 'এর পিছনে দুটো কারণ আছে। কলচুরি সম্রাটদের আমলে ওই হস্তিদ্বীপে বেশ কিছু গুহা মন্দির নির্মিত হয়েছে। অসাধারণ তার শিল্প সুষমা। সম্রাট ওই কৃতিত্ব কলচুরিদের দিতে চান না। তাই ওখানে তাঁর শাসনকালে গুহা মন্দির নির্মাণ করতে চান। ঠিক যেমন কলচুরি ও চালুক্য আমলের চরণন্দ্রী পাহাড়ের বৌদ্ধ গুহাগুলোর সংস্কার করে হিন্দু গুহায় সেগুলোকে রূপান্তর করে সেখানে নিজেদের নাম খোদাই করেন রাট্টা সম্রাটরা। যাতে ভবিষ্যতের মানুষ ভাবে যে সবই রাট্টা সম্রাটদের কীর্তি।

'আর হস্তিদ্বীপে হিন্দু মন্দির নির্মাণের পিছনে দ্বিতীয় কারণ হল সম্রাটের আমরা চারজন প্রধান প্রশাসকসহ রাট্টা সাম্রাজ্যের অধিকাংশ নাগরিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। সম্রাট নিজে জৈন ধর্ম নিতে চলেছেন। রাজ্যবাসীর মনে এ কারণে যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাই তিনি ওই হস্তিদ্বীপে হিন্দু মন্দির নির্মাণ করে আমাকে আপনাকে দেখাতে চাইছেন যে ব্যক্তিগতভাবে তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতি সমান আস্থাশীল।'

৪

এলাপুর থেকে মান্যখেতে অনেক যোজন পথ। মান্যখেতে থেকে যাত্রা শুরু করে যখন তিনি এলাপুরে পৌঁছোলেন, তার অনেক আগেই চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠে গেছে। কৈলাস মন্দিরের অনতিদূরেই চরণন্দ্রী পাহাড়ের পাদদেশে শিল্পীদের বাসস্থান। পাথর নির্মিত সার সার ঘর। আর তার কিছুটা তফাতে মজুরদের পর্ণ কুটির। চারপাশ নিঝুম নিস্তব্ধ।

কোথাও কোনও আলো জ্বলেছে না কোনও ঘরে। শুধু একটা ঘর থেকেই ক্ষীণ আলোকরেখা ভেসে আসছে। তার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলেন শঙ্খপাল। এটা কৈলাস মন্দিরের সহকারী প্রধান ভাস্কর চন্দ্রপালের বাসস্থান। তাঁর কাছ থেকে সারাদিনের কাজকর্মের অগ্রগতি সম্বন্ধে খবর নিতে হবে প্রধান শিল্পীকে। সম্রাট-দরবার থেকে তিনি যে

BanglaBook.org

খবর সংগ্রহ করেছেন তাও জানাতে হবে চন্দ্রপালকে। বৃদ্ধ বহুদর্শী মানুষ চন্দ্রপাল।

শঙ্খপালের শিক্ষক শিষ্যর প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে যদি তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার নির্বাচন না করে যেতেন, তবে নির্ঘাত কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্করের দায়িত্ব পেতেন চন্দ্রপাল। তবে তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই চন্দ্রপালের। নিজের শিল্পসৃষ্টিতেই ডুবে থাকেন তিনি।

ঘোড়ার খুড়ের শব্দেই সম্ভবত বৃদ্ধ ভাস্কর তাঁর কক্ষ ছেড়ে উঠোনে দাঁড়ালেন। শঙ্খপাল প্রথমে তাঁর কাছে সারাদিনের কাজের অগ্রগতির খবর জানতে চাইলেন। বৃদ্ধ সহকারী প্রধান ভাস্কর জানালেন কাজ প্রায় সব শেষ। শঙ্খপাল এরপর তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন রাজ নির্দেশের কথা। দ্বারোদ্‌ঘাটনের কথা। দক্ষিণ সমুদ্রে হস্তিদ্বীপে যেসব শিল্পী যেতে ইচ্ছুক, তাদের নামের তালিকাও তিনি প্রস্তুত করতে বললেন অভিজ্ঞ ভাস্করকে। চন্দ্রপাল সানন্দে গ্রহণ করলেন সব দায়িত্ব।

এক সময় শঙ্খপালের খেয়াল হল তাকে ফিরতে হবে। চন্দ্রপালের থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন তিনি।

নিজের গৃহ অভিমুখেই ফিরছিলেন শঙ্খপাল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল অশনি তো নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েক প্রহরের তো ব্যাপার। মন্দিরে গিয়ে রাজার উড়নীর কাজটা শেষ করে ঘরে ফেরা যেতে পারে। ভাবনাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোড়ার মুখ ফেরালেন মন্দিরের দিকে।

চত্বরের প্রবেশমুখে রক্ষী মোতায়েন থাকে। তাদের জিম্মায় ঘোড়াটা রেখে শঙ্খপাল চত্বরে প্রবেশ করলেন। উপস্থিত হলেন নন্দী মণ্ডপে।

মশালের আলো ফেলতেই চমকে উঠলেন তিনি। আগের দিনের মতোই অমোঘবর্ষর মূর্তির তর্জনীটা নেই। সেটা মাটিতে খসে পড়ে আছে! শঙ্খপালের চোখে মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল সেই দৃশ্য। অমোঘবর্ষ হেঁটে যাচ্ছেন তাঁর সামনে দিয়ে। তাঁর ডান হাত তর্জনী বিহীন! কিন্তু আজও কী ভাবে খসে পড়ল আঙুলটা। তবে কি সংযোগ স্থানে ভালো করে বজ্রপ্রলেপ লাগানো হয়নি? আঙুলটা স্বযত্নে এক জায়গাতে তুলে রাখলেন তিনি। ভাস্কর ভাবলেন আজ আগে তিনি সম্রাটের উড়নির অলংকরণটা শেষ করবেন তারপর জুড়ে দেবেন মূর্তির আঙুল। সেই মতো ছেনি-

BanglaBook.org

হাতুড়ি তুলে নিয়ে কাজ শুরু করলেন তিনি।

সব কাজ শেষ হলে ভাস্কর ভালো করে তাকালেন হাতটার দিকে। না, সব কিছুই ঠিক মতো হয়েছে, এবার নিশ্চয়ই আর খসে পড়বে না তর্জনী। জিনিসপত্র আবার গুছিয়ে নিয়ে মশালটা এরপর স্তম্ভর গা থেকে খুলে নিতে যাচ্ছিলেন শঙ্খপাল। কিন্তু পেছন ফিরেই তিনি দেখলেন তাঁর অলক্ষে কখন যেন একজন এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পেছনে। গত রাতের সেই জৈন সন্ন্যাসী।

আজও তাঁকে দেখতে পেয়ে বেশ অবাক হলেন শঙ্খপাল। লোকটা আজ আবার কী বলতে এসেছে?'

শ্রমন মূর্তির দিক থেকে চোখ ফেরালেন শঙ্খপালের দিকে। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি রাজসন্দর্শনে যাননি?'

শঙ্খপাল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'দেখা পেয়েছেন তাঁর?'

শঙ্খপাল বললেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি সম্রাট অমোঘবর্ষকে। গতকাল আপনি বলেছিলেন সম্রাটের মূর্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। কিন্তু তাঁকে দেখার পর আমি নিশ্চিত সম্রাটের মূর্তি হুবহু তাঁরই মতো। তাঁর চেহারার সঙ্গে এ মূর্তির অসঙ্গতি নেই।'

'ভাস্কর, তবে নিশ্চয়ই আপনি তাঁর ডান হাতের তর্জনীটাও দেখেছেন?'

সন্ন্যাসী কী বলতে চাইছেন তা এবার স্পষ্ট হয়ে গেল শঙ্খপালের কাছে।

সন্ন্যাসী এরপর বললেন, 'তাহলে আপনি ওই ছিন্ন তর্জনীটা বারবার মূর্তির হাতে জোড়া দিচ্ছেন কেন? সম্রাটের ওই তর্জনীটা তো নেই। আপনি সত্যের অপলাপ করছেন কেন? সত্যই তো সুন্দর।'

শঙ্খপাল জবাব দিলেন, 'শ্রমন, একজন শিল্পীর চোখে সুন্দরই হল সত্য। তাই সম্রাটের ছিন্ন তর্জনী জোড়া দিচ্ছি আমি।

সন্ন্যাসী আবারও বললেন, 'কিন্তু এতো সত্যের অপলাপ।'

শঙ্খপাল বললেন, 'আমি তো বললাম আপনাকে যে একজন শিল্পীর চোখে তার শিল্পের সৌন্দর্যই সবচেয়ে বড় সত্য। তা তিনি যে-কোনও শিল্পী হতে পারেন। কাষ্ঠশিল্পী, প্রস্তরশিল্পী, মৃৎশিল্পী, চিত্রশিল্পী এমনকী অক্ষরশিল্পীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

BanglaBook.org

মগধ সম্রাট অশোক, গৌতম বুদ্ধ তো একদিন রক্ত-মাংসর মানুষ ছিলেন। অশোক ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং কুরূপ। সারা দেহ তাঁর আবে ভর্তি ছিল। তাঁর অঙ্গ দেখে হাসাহাসি করায় চণ্ডাশোক তাঁর এক রানিকেও অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর যে মূর্তি দেখতে পাই সে মূর্তি ধর্মাশোকের মূর্তি। সর্বাঙ্গ সুন্দর কমনীয় এক মূর্তি। আনত চোখ থেকে করুণা ঝরে পড়ছে তাঁর। শান্ত, সৌম্য, নতমস্তক এক মানুষের ছবি।

সন্ন্যাসী তাঁর কথাগুলো শুনে হেসে বললেন, 'শিল্পী না হয়ে আপনি অবশ্যই তার্কিক হতে পারতেন। মানছি আপনার যুক্তিজাল খুবই সুন্দর। কিন্তু আমি জৈন সন্ন্যাসী। বর্ধমান আমাদের যে সত্যর পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেটাই আমার পথ। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, সত্যকেই সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন আপনি। সর্বাঙ্গীন সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মুক্তির উপায়।'

শঙ্খপাল বললেন, 'আমার মুক্তির উপায় আমার শিল্প। তার সৌন্দর্য।'

বড় বিরক্তিকর সন্ন্যাসীর কথাগুলো। তাঁর এই আকস্মিক উপস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর। লোকটা যাতে আবার এ জায়গাতে ফিরে না আসেন তাই শঙ্খপাল তাঁকে বললেন, 'আপনি চলে যাবার আগে একটা কথা জানাই আপনাকে। এই মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হওয়ার আগে কিন্তু কারও প্রবেশাধিকার নেই এই মন্দিরে। শুধুমাত্র শিল্পী-মজুরদেরই এখানে প্রবেশ করার অনুমতি আছে। এ নির্দেশ স্বয়ং সম্রাট অমোঘবর্ষর। রক্ষীরা দেখতে পেলে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। কাজেই...

প্রধান শিল্পীর বাক্য অসমাপ্ত হলেও তা বুঝে নিতে সম্ভবত অসুবিধা হল না সন্ন্যাসীর। চলে যেতে গিয়েও কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সন্ন্যাসীর চোখের তারায় যেন বিদ্রুপ ফুটে উঠল। প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনি কি আমাকে এই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে নিষেধ করছেন? এ চত্বরে আমার আসা-যাওয়া আমার ইচ্ছাধীন। আমার গতিরোধ করার ক্ষমতা আপনার বা রক্ষী বাহিনীর নেই।' একথাগুলো বলে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

শঙ্খপালের মাথার মধ্যে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ন্যাসী

BanglaBook.org

কি তবে ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে সম্রাটের আঙুল? কিন্তু এত বড় দুঃসাহস কীভাবে হবে এক সাধারণ সন্ন্যাসীর?

৫

শঙ্খপাল মন্দির চত্বরের বাইরে যখন এসে দাঁড়ালেন তখন শিল্পী-মজুরের দল আসতে শুরু করছে মন্দিরের দিকে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়। মজুরদের মন্দিরে প্রবেশের এই সময়টা প্রত্যহ চত্বরের প্রবেশ মুখে হাজির থাকেন রক্ষী প্রধান মারীচ। রক্ষীদের কাজকর্ম তদারক করেন তিনি। যাতে শিল্পী বা মজুরদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত কেউ প্রবেশ না করতে পারে মন্দিরে। সব শিল্পীদের কাছে এক বিশেষ চিহ্ন যুক্ত গদ্যনক স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া আছে। আর মজুরদের কাছে দেওয়া আছে কথর্ন নামের রৌপ্য মুদ্রা। ওই মুদ্রাই হল শিল্পী-মজুরদের মন্দিরে ঢোকার অনুমতিপত্র।

প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল তাঁকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ভালো হল। একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। আমি গতকাল মান্যখেতে রাজদরবারে গেছিলাম। মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন বলা যায়। যতটুকু কাজ বাকি তা আজই শেষ হয়ে যাবে। তবে আগামী কালও মজুররা মন্দিরে আসবে অবাঞ্ছিত পাথর খণ্ড ইত্যাদি মন্দির চত্বর থেকে সরিয়ে ফেলে মন্দির পরিষ্কার করার জন্য। কারণ, এই পূর্ণিমা তিথিতেই মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন। রাট্টা সম্রাট পদার্পণ করতে চলেছেন এখানে।'

সম্রাট আসছেন! বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল রক্ষীপ্রধান মারীচের মুখে।

প্রধান ভাস্কর বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি সত্যিই আসছেন। আর মাঝে মাত্র দুই রাত বাকি। এই দু-দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কোনওভাবে কেউ যেন মন্দিরের কোথাও সামান্যতম ক্ষতি সাধনও না করতে পারে। আর একটা কথা, মন্দিরের পশ্চাৎদেশের বেশ কিছুটা অংশ অরক্ষিত। পাহাড়ের গায়ে যেখানে প্রাচীন জৈন গুহাগুলো আছে, সেদিক থেকেও যাতে কেউ মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ওদিকেও রক্ষী মোতায়ন করবেন। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে আমি আবার ফিরে

BanglaBook.org

আসছি এখানে। তখন কোনও পরামর্শর প্রয়োজন হলে বলবেন।' কথাগুলো বলে আর সময় নষ্ট না করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন শঙ্খপাল।

কিছু সময়ের মধ্যেই নিজগৃহে ফিরে এলেন শঙ্খপাল। পাথুরে প্রাঙ্গণে ঘোড়া থেকে নেমে কক্ষে প্রবেশ করতে না করতেই অশনি পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে দেখে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তুমি এসেছ! আমি সারারাত জেগে বসে আছি তুমি আসবে বলে।'

শঙ্খপালের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নেই। কেউ কোনও দিন তাঁর জন্য এমন প্রতীক্ষা করে থাকেনি। অশনির কথা শঙ্খপালের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। তিনি সস্নেহে অশনির মাথায় হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরি হয়ে গেল ফিরতে। অনেক দূরের পথ তো! তারপর গেলাম মন্দিরে। সেখানেই রাত কেটে গেল।'

অশনি এরপর উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল, 'তাঁর দেখা পেলে?'

শঙ্খপাল প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ। দেখা পেলাম। এই প্রথম সম্রাট অমোঘবর্ষকে চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম আমি। সে কী জৌলুশ রাজদরবারের! কত লোকজন সেখানে...'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে অশনি বলে উঠল, 'না, না। আমি সম্রাটের কথা তোমাকে জিগ্যেস করছি না...

অশনি এবার কী জানতে চাইছে তা বুঝতে পারলেন শঙ্খপাল। আসলে নানা চিন্তার চাপে তাঁর মাথায় আসেনি ব্যাপারটা। ভ্রম সংশোধন করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না, তেমন সুন্দরী কাউকে দেখলাম না, যিনি তোমার মা হতে পারেন।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অশনির চোখের সব উজ্জ্বলতা নিভে গেল। তাকে উৎসাহিত করার জন্য শঙ্খপাল এরপর বললেন, 'মান্যখেতের থেকে কী সংবাদ নিয়ে এলাম শোনো। দরবারে স্বয়ং সম্রাটের সামনে আমাকে জানাল যে হস্তিদ্বীপে যে মন্দির নির্মাণ হবে তারও প্রধান ভাস্করের দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। মহাসন্ধিবিগ্রহী আমাকেই শিল্পী নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। গত রাতে সম্রাট মূর্তির যেটুকু কাজ বাকি ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। মন্দিরের অন্য সব কাজও শেষ। মাঝে মাত্র দু-রাত। পূর্ণিমা তিথিতেই সম্রাট মন্দিরে আসছেন দ্বারোদ্‌ঘাটন ও নিজ মূর্তি আবরণ

BanglaBook.org

উন্মোচন করতে।

খুব ধুমধাম হবে সেদিন। আমি তোমাকে নতুন পোশাক এনে দেব। সে পোশাক পরে তুমি মন্দিরে যাবে। সম্রাট অমোঘবর্ষকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে। তা ছাড়া এতদিন তো তোমার গতিবিধি ওই নন্দী মণ্ডপ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ছিল। মূল মন্দিরে প্রবেশ করার সুযোগ হয়নি। ওই দিন সে সুযোগ হবে। দেখতে পাবে কী অসাধারণ শিল্পকীর্তি আছে ওই মন্দিরের অভ্যন্তরে। একশো বছর ধরে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা গড়ে তুলেছেন ওই সব মূর্তি। দেখে অবাক হয়ে যাবে তুমি।'

শঙ্খপাল ফের বললেন, 'দ্বারোদ্‌ঘাটনের ক'দিনের মধ্যেই কিন্তু পশ্চিম সাগরের হস্তিদ্বীপে যাব আমরা। শিল্পী হিসেবেই তুমি সেখানে যাবে। সেখানে তোমার কাজ করার কোনও বাধা থাকবে না।'

শঙ্খপালের কথার কোনও জবাব দিল না অশনি। ধীরে ধীরে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শঙ্খপাল মনে মনে ভাবলেন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন পর্ব মিটে যাওয়ার পর একবার সত্যিই তিনি খোঁজার চেষ্টা করবেন অশনির মাকে। তিনি শুনেছেন মান্যখেতের কয়েক জায়গাতে নটীদের বাসস্থান আছে।

টানা দুদিন বিশ্রামের সুযোগ পাননি শঙ্খপাল। অশনি অন্য কক্ষে চলে যাওয়ার পর তিনি সজ্জা গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এল তাঁর চোখে। এক সময় অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি। সম্রাট অমোঘবর্ষ এসেছেন মন্দির পরিদর্শনে। শাঁখ বাজছে, ভেরি বাজছে। তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে চলেছেন সম্রাট। তাঁর কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল ও সহ-প্রধান ভাস্কর চন্দ্রপাল। পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে সম্রাটের মাথায়। চারপাশে অনেক লোকজন। হঠাৎই ভিড়ের মধ্যে শঙ্খপাল দেখতে পেলেন সেই জৈন সন্ন্যাসীকে। তার চোখের তারায় যেন হাসির ঝিলিক।

কিন্তু তার দিকে বেশি দৃষ্টিপাত করার মতো তখন সময় নেই শঙ্খপালের। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে চলেছেন সম্রাট শ্রেষ্ঠ। রক্তবর্ণের রেশম বস্ত্রের আচ্ছাদন সরিয়ে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন সম্রাট। সবাই তাকাল সেই মূর্তির দিকে আর শঙ্খপাল তাকালেন সম্রাটের মুখের দিকে তাঁর অভিব্যক্তি বোঝার জন্য। মূর্তির দিকে তাকিয়ে ধীরে

BanglaBook.org

ধীরে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎই যেন থমকে গেল সেই হাসি। কুঞ্চিত হয়ে উঠল সম্রাটের শুভ্র ভ্রূ যুগল। সম্রাট চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী! আমার মূর্তির দক্ষিণ হস্তের তর্জনী কোথায়? এই কুৎসিত মূর্তি কে নির্মাণ করেছে? কার এত বড় দুঃসাহস যে আমাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে!' ক্রোধে থরথর করে কাঁপছেন বীরনারায়ণ।

শঙ্খ, ঢাকের বাদ্যি সেই মুহূর্তে থেমে গেল। যে সব রমণীরা পুষ্পবৃষ্টি করছিল, সম্রাটের ক্রোধ দেখে আতঙ্কে পাথরের মূর্তি বনে গেল তারা। সম্রাট আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'বলো বলো? কার এই ধৃষ্টতা?'

মহাসন্ধিবিগ্রহী এবার পাশ থেকে কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন, 'এই মূর্তি নির্মাণ করেছে প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল।'

সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমি তাঁর প্রাণদণ্ডর আদেশ দিচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সহকারী ভাস্করেরও প্রাণদণ্ড হবে। এই কুৎসিত মূর্তির দু-পাশের থামে বেঁধে আজ চাঁদ ওঠার পর যেন তাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।'

এই বলে ক্রুদ্ধ সম্রাট এগোলেন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ হস্তির দিকে। সম্রাটের কথা পালনের জন্য দণ্ডনায়েকের নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর আর চন্দ্রপালকে টেনে হিঁচড়ে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো স্তম্ভে রজ্জুবদ্ধ করল একদল সৈনিক। আর তারপরই কিছুক্ষণের জন্য যেন স্বপ্নের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেল সব কিছু।

এরপর শঙ্খপাল দেখলেন, তিনি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন একই জায়গায়। পাশের স্তম্ভে একই ভাবে বাঁধা বৃদ্ধ শিল্পী চন্দ্রপালও। চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। আর এরপরই চত্বর ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল ভীষণাকৃতি এক জহ্লাদ। তার হাতের খড়গ ঝিলিক দিয়ে উঠল চাঁদের আলোতে।

শঙ্খপালের সামনে এসে দাঁড়াল ঘাতক। খড়গটা সেই জহ্লাদ মাথার ওপর তুলল আঘাত হানার জন্য। অন্তিম মুহূর্তে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল শঙ্খপালের কণ্ঠ থেকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। শঙ্খপাল বুঝতে পারলেন তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। দ্রুত সজ্জা ত্যাগ করলেন শঙ্খপাল। পোশাক পরিবর্তন করে তিনি যখন কক্ষ ত্যাগ করতে যাচ্ছেন

BanglaBook.org

ঠিক তখনই হাজির হল অশনি। তার হাতে কাপড় জড়ানো কী একটা। অশনির মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

শঙ্খপাল জবাব দিলেন, 'মন্দিরে। সম্রাট আসবেন সেজন্য নানা প্রস্তুতি আছে। ফিরে আসতে সম্ভবত সন্ধ্যা নেমে যাবে।'

এরপর তার সঙ্গে আর কোনও কথা না বলে কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন তিনি। রওনা হলেন কৈলাস মন্দিরের দিকে।

৬

নির্জন দুপুর। একলা কক্ষে বসে আছে অশনি। খালি কান্না পাচ্ছে তার। কতদিন যে দেখেনি মাকে। এত বড় পৃথিবীতে মা-ই যে ছিল তা একমাত্র আপনজন। আর কি কোনও দিন তার দেখা হবে মা-র সঙ্গে? তাঁর ইচ্ছাটাও তো পূরণ করতে পারল না অশনি। মন্দিরের কাজ শেষ।

তার আর এলাপুর ভাস্কর হওয়া হল না। এর চেয়ে সেদিন জহ্লাদের হাতে মৃত্যু হলেও তার ভালো হত। শঙ্খপাল তাকে স্নেহ করেন ঠিকই। কিন্তু তিনি কি পারতেন না অন্তত কাজের সুযোগটা দিতে। তিনি তো প্রধান ভাস্কর। সবাই তো তাঁর নির্দেশেই চলে।—এসব কথা ভাবতে ভাবতে শঙ্খপালের প্রতি একটা চাপা অভিমান আর মাকে খুঁজে না পাওয়ার বেদনা গুমরে উঠতে লাগল তার মনে। সত্যিই তার চোখ থেকে দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল তার হাতে ধরা কাপড় জড়ানো মূর্তিটার ওপর।

গতকালই এই ছোট্ট মূর্তিটার কাজ শেষ করেছে সে। শঙ্খপালকে মূর্তিটা সে দেখাবে ভেবেছিল, কিন্তু তার আগেই বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ঘরে আর থাকতে ভালো লাগছে না অশনির। দেওয়ালগুলো যেন চারপাশ থেকে চেপে ধরতে চাইছে।

এক সময় চোখের জল মুছে মূর্তিটা বুকে চেপে অশনি উঠে দাঁড়াল। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে কিছুটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই উঠতে শুরু করল চরণন্দ্রী পাহাড়ের ওপর দিকে। সেখানে সার সার দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন গুহাগুলো। সে উঠে এল গুহামন্দিরগুলোর সামনে। ওপর থেকে

BanglaBook.org

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীচের কৈলাস মন্দির চত্বর। অনেক লোকজন কাজ করছে সেখানে। ওপর থেকে তাদের ছোট ছোট পুতুলের মতো দেখাচ্ছে। তার ছোট বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গুহা মন্দিরগুলোর গা ঘেঁষে চাঁদের ফালির মতো যে অর্ধবৃত্তাকার পথ এগিয়েছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, সে-পথ ধরে এগিয়ে চলল অশনি।

গুহাগুলো সব পশ্চিমমুখী। সূর্যদেব পশ্চিম মুখে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে গুহামন্দিরগুলোর ওপর। প্রথম গুহাগুলো বৌদ্ধ গুহা। শঙ্খপাল একবার অশনিকে বলেছিলেন যে এই গুহাগুলোই সবচেয়ে প্রাচীন। ভগবান বুদ্ধর মৃত্যুর দু-তিনশো বছর পরই নাকি এ গুহাগুলোর নির্মাণ কার্য শুরু হয়। এর মধ্যে কোনও কোনও গুহা এক সময় ছিল 'বিহার' অর্থাৎ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বাসস্থান, আবার কোনও গুহা হল 'চৈত্য' বা উপাসনালয়। তার বিরাট বড় পাথুরে উঠানগুলো বড় বিষণ্ণ। এক সময় পবিত্র অগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হত চৈত্যগুলোর ভেতর।

শঙ্খপালের সঙ্গে এই চৈত্য গুহাগুলোর ভিতর অনেকবার এসেছে অশনি। বৌদ্ধ চৈত্যগুলো অতিক্রম করার পর শুরু হল হিন্দু গুহামন্দিরগুলো। এ গুহাগুলোর সামনে স্তম্ভ আছে। কোনও গুহা দ্বিতল বা ত্রিতল প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। পশ্চিমগামী সূর্যালোকে ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে গুহা মন্দিরের গায়ে খোদিত দেবদেবীর মূর্তিগুলো।

কত শতাব্দী ধরে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওই সব প্রাচীন মূর্তিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এ জায়গাটা বড় ভালো লাগে অশনির। কত দিন সে একলা এসে তন্ময় ভাবে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে এই মূর্তিগুলোর সামনে। কিন্তু আজ যেন কিছুই ভালো লাগছে না তার। গুহাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করে একটার পর একটা গুহা অতিক্রম করে অশনি চলল তন্দ্রাচ্ছন্নর মতো।

কিন্তু এক সময় থামতেই হল অশনিকে। পথ এসে থেমেছে এক গুহা মন্দিরের সামনে। এ জায়গায় এর আগে কোনওদিন আসেনি অশনি। চরণন্দ্রী পাহাড়ের প্রান্ত ভাগ এ জায়গা। এখানেও বেশ কয়েকটা গুহামন্দির, আছে তবে তারা যেন বিচ্ছিন্ন।

অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে অশনি। দুপুর গড়িয়ে কখন যেন

BanglaBook.org

বিকাল হয়ে গেছে। অশনি দেখতে পেল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক পাথুরে মূর্তি। এ মূর্তি আগে কোনওদিন দেখেনি অশনি। ঋজু দণ্ডায়মান মূর্তিটা অনেকটা বুদ্ধমূর্তির মতো দেখতে হলেও সেটা বুদ্ধমূর্তি নয়। যে শিল্পী এ মূর্তি নির্মাণ করেছেন তিনি কোনও পোশাকে আবৃত করে রাখেননি মূর্তির দেহের কোনও অংশ, জন্ম নেওয়ার সময় মানুষ যে অবস্থায় থাকে ঠিক সেই অবস্থায় নগ্ন মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটা দেখে নিজের অজান্তেই যেন অশনি বলে ফেলল, 'বড় অদ্ভুত মূর্তি তো! এ কার মূর্তি?'

'এ মূর্তি তীর্থঙ্কর বর্ধমানের। মহাবীরের মূর্তি।'—হঠাৎ এভাবে তার প্রশ্নর উত্তর ভেসে আসায় অশনি চমকে উঠে পাশে তাকাতেই দেখতে পেল একজন লোককে। শুভ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে কিছুটা আবৃত করা তার দেহ। নির্জন জায়গাতে এমন এক অদ্ভুত পোশাকের লোক হঠাৎ তার সামনে আবির্ভূত হওয়ায় একটু ভয় পেয়ে গেল অশনি।

লোকটা মনে হয় তার মনের কথা পাঠ করতে পারল। সে বলল, 'তুমি ভয় পেও না। আমি একজন জৈন সন্ন্যাসী। ভয় পেও না, আমরা কোনও প্রাণীকে আঘাত করি না। এমনকী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীকেও আমরা হত্যা করি না। আমার মুখমণ্ডলে এই বস্ত্রখণ্ডর আচ্ছাদন কেন জানো? যাতে পোকা-মাকড় আমার মুখগহ্বর বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে তাদের মৃত্যু ঘটাতে না পারে।'

অশনি জৈন সন্ন্যাসীদের কথা আগে শুনলেও এই প্রথম চাক্ষুস করল কোনও জৈন সন্ন্যাসীকে। তাঁর কথা শুনে বেশ আশ্বস্তও হল সে। অশনি এরপর মূর্তিটা দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'ওই মূর্তির গায়ে পোশাক নেই কেন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'মানুষ যখন মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে তখন মানুষের দেহে কোনও পোশাক থাকে না। ওটাই তার সত্য রূপ। তীর্থঙ্কর সত্যের পূজারি।'

একথা বলার পর সন্ন্যাসী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কী? তুমি কোথা থেকে আসছ? কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছে তোমাকে!'

সে জবাব দিল, 'আমার নাম অশনি। এলাপুর গ্রামে থাকি কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের গৃহে। ঘুরতে ঘুরতে চলে

BanglaBook.org

এসেছি এখানে।'

প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল! নামটা শুনে মৃদু চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী। এবার তিনি বুঝতে পারলেন ওই বালককে কেন তার চেনা মনে হচ্ছে। সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও কৈলাস মন্দিরের কাছে যান। পাহাড়ের ঢালে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেন মন্দির চত্বরের কর্মকাণ্ড। তখনই তিনি খেয়াল করেছিলেন ওই বালককে।

জৈন সন্ন্যাসী অশনির জবাব শুনে প্রশ্ন করলেন, 'প্রধান শিল্পী শঙ্খপাল তোমার কে হন?'

অশনি জবাব দিল, 'তিনি কেউ হন না। আমাকে প্রায় এক বৎসর কাল ধরে প্রতিপালিত করছেন তিনি?'

'কেন? প্রতিপালিত করছেন কেন?' জানতে চাইলেন সন্ন্যাসী।

অশনি তার সঙ্গে কেন কীভাবে শঙ্খপালের পরিচয় হল তা ব্যক্ত করল সন্ন্যাসীকে। তারপর সে সন্ন্যাসীকে বলল, 'আচ্ছা তুমি আমার মাকে খুঁজে দিতে পারো? তুমি যখন সন্ন্যাসী তখন নিশ্চয়ই অনেক জায়গাতে ঘুরে বেড়াও?'

সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'তা বেড়াই ঠিকই। তবে তাঁকে চিনব কী ভাবে? কী নাম তাঁর?'

অশনি জবাব দিল, 'তাঁর নাম তো জানি না। পিতা তাঁকে সম্বোধন করতেন 'নটী' বলে। আর আমি তাঁকে সম্বোধন করতাম 'মা' বলে। আমি তাঁর নাম জানার প্রয়োজনবোধ করিনি কখনও। 'মা'—এই সম্বোধনই তো তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নাম ছিল আমার কাছে।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি সত্যের পূজারি। তাই সত্য কথাই তোমাকে বলি। শুধু 'মা' নামে কাউকে এত বড় পৃথিবীতে খোঁজা সম্ভব নয়।'

অশনি বলল, 'তাঁকে চিনতে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। যে নারীকে দেখবেন সবচেয়ে বেশি সুন্দর, বুঝবেন তিনিই আমার "মা"।'

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন তার কথা শুনে। তারপর বললেন, 'তোমার হৃদয়কে আমি আঘাত দিতে চাই না। কিন্তু সত্য কথাটা আমাকে বলতেই হয়। এভাবেও কাউকে খোঁজা যায় না। কারণ, সব বালকের চোখেই তার মা সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। তোমার বদলে অন্য কেউ যদি থাকত, তবে সে-ও একই কথা বলত।'

BanglaBook.org

সন্ন্যাসীর কথা শুনে প্রথমে থমকে গেল অশনি। এই সন্ন্যাসীর বক্তব্য মৃদু কঠোর হলেও তাতে সত্যতা আছে। সব বালকের চোখেই তো তার মা সবচেয়ে সুন্দর। তাহলে তাঁকে বোঝাবার উপায় কী? আর একথা ভাবার পরই তার হঠাৎ খেয়াল হল তার হাতে ধরা মূর্তিটার কথা। উজ্জ্বল হয়ে উঠল অশনির চোখ। যদিও তখনও মূর্তিটা দেখানো হয়নি শঙ্খপালকে তবু এরপর সে তাঁর বুকে ধরা মূর্তিটা কাপড়ের ভাঁজ থেকে খুলে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিলে বলল, 'এই যে আমার মা'র মূর্তি। হুবহু তাঁর মতো দেখতে। এ মূর্তি আমি নিজে বানিয়েছি। এবার নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তাঁকে দেখলে চিনতে অসুবিধা হবে না আপনার।'

সন্ন্যাসী হাতে নিলেন মূর্তিটা। উচ্চতায় খুব বেশি হলে বিশ আঙুল হবে মূর্তিটা। কিন্তু এত সুন্দর মূর্তি, যে দেখে অবাক হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। ক্ষুদ্রাকৃতি এমন নিখুঁত মূর্তি এর আগে কোনওদিন দেখেননি সন্ন্যাসী। এমনকী সেই নারীমূর্তির চিবুকের তিলটা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে রচনা হয়েছে মূর্তিতে। এ মূর্তি যাঁর, সত্যিই তাঁকে অসামান্য রূপসীই বলতে হবে।

কিন্তু মূর্তিটাকে ভালো করে দেখতে দেখতে হঠাৎই যেন সন্ন্যাসীর মনে হল এই রমণীকে তিনি কোথায় যেন দেখেছেন! ঠিক যেমন এই বালককে প্রথম দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে ইতিপূর্বে তিনি তাকে দেখেছেন।

সন্ন্যাসী কোথায় দেখেছেন এই নটীকে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল সন্ন্যাসীর মনে। সন্ন্যাসী অশনিকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মা কত বৎসর কাল নিখোঁজ আছেন?'

অশনি জবাব দিল, 'প্রায় দুই বৎসর কাল অতিক্রান্ত হতে চলেছে।'

সন্ন্যাসীর মনের সন্দেহটা যেন তার কথা শুনে আরও দৃঢ় হল। তিনি নিজে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল বসবাস করছেন চরণন্দ্রী পাহাড়ের নির্জন গুহামন্দিরে। অনেক ঘটনাই তিনি দেখেছেন, শুনেছেন সবার অলক্ষে। তিনি অশনিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ মূর্তি প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালকে দেখিয়েছ?'

অশনি জবাব দিল, 'এ মূর্তি নির্মাণ গতকালই শেষ করেছি আমি। তাঁকে এ মূর্তি দেখাতে পারলাম কই। তিনি বড় ব্যস্ত এখন। আর দু-রাত বাদেই পূর্ণিমা তিথিতে কৈলাস মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে। সম্রাট অঘোমবর্ষ কৈলাস মন্দির দর্শনে আসবেন ওই দিন। সে-কাজের প্রস্তুতিতে

BanglaBook.org

নিয়োজিত আছেন প্রধান ভাস্কর। আমি তাঁকে মূর্তিটা দেখাতে যাচ্ছিলাম। তিনি তার আগেই কক্ষ ত্যাগ করলেন।'

গত রাতের পর এদিন দ্বিপ্রহরেও মন্দিরের দিকে একবার গেছিলেন সন্ন্যাসী। দিনের আলোতে তিনি মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেন না কখনও। কিন্তু মন্দিরের ওপরের ঢালেই সেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে তিনি লক্ষ করেছেন রক্ষী সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে মন্দির চত্বরে। যেদিক দিয়ে তিনি নীচে নেমে মন্দিরে প্রবেশ করেন, সেদিকেও প্রহরী মোতায়েন করা হয়েছে। শ্রমিকদের কর্মতৎপরতাও যেন হঠাৎই বেড়ে গেছে। এবার সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন ওই তৎপরতার পেছনে কারণটা কী? মনে মনে তিনি বললেন, 'কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে সত্য প্রতিষ্ঠা যে ভাবেই হোক করতে হবে।'

অশনির কথা শোনার পর তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এই নটী মূর্তিটা আমার কাছে আপাতত থাক। এই মূর্তির কথা, আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের কথা কাউকে জানানোর দরকার নেই। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর তুমি ঠিক এই স্থানে এসো। আমি সত্য সন্ধানী। যদি এই নারীর সন্ধান আমি পাই তবে সত্য উদ্‌ঘাটন করব তোমার কাছে। তার জন্য আজ রাতটুকু সময় দিতে হবে আমাকে।'

৭

সন্ধ্যা নয়, তারও বেশ কিছুক্ষণ পর নিজের ঘরে ফিরলেন শঙ্খপাল। তখন চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথার ওপর ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। মন্দিরে যাওয়ার পর সেখানে একদণ্ড বিশ্রামের সুযোগ পাননি তিনি নানা কাজের তদারকির জন্য। শিল্পীদের যেটুকু কাজ এদিকে-ওদিকে বাকি ছিল তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। মন্দির চত্বর থেকে শ্রমিকরা পাথর খণ্ড আর বিভিন্ন মূর্তি—যেগুলো কাজ করার সময় ভেঙে যাওয়ার ফলে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলতে শুরু করেছে।

এলাপুরে যত মালাকার আছে তারা এ-রাত থেকেই মালা গাঁথা শুরু করবে। পরদিন পাথরখণ্ডগুলো সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলার পর মন্দিরগাত্র,

BanglaBook.org

নন্দীমণ্ডপ ধুয়ে-মুছে মালা দিয়ে সাজানো হবে। তারপর শুধু একটা রাতের প্রতীক্ষা। মহাসন্ধিবিগ্রহী একজন মহাসামন্তর নেতৃত্বে একদল অশ্বরোহী সৈনিককে আজ মান্যখেতের থেকে পাঠিয়েছিলেন সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। স্বয়ং রাট্টা সম্রাট মন্দিরে আসবেন বলে কথা!

তাদের কাছ থেকে কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছেন তা হল, মান্যখেতে থেকে সূর্যোদয়ের পরই যাত্রা শুরু করে দ্বিপ্রহরের আগেই এলাপুরে এসে উপস্থিত হবেন রাট্টাকুলধীপ বীরনায়ারণ অমোঘবর্ষ। তারপর মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন, মূর্তির আবরণ উন্মোচন ইত্যাদি কার্য সমাধা করে মন্দিরে কিছু সময় ব্যয় করে আবার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবেন সম্রাট।

শঙ্খপাল কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন গবাক্ষর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অশনি। তার দৃষ্টি দূরে চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথার দিকে নিবদ্ধ। তাকে দেখে বেশ কষ্ট হল শঙ্খপালের। কাজের চাপে তাকে দু-দণ্ড সময় দিতে পারছেন না শঙ্খপাল। একলাই থাকতে হচ্ছে অশনিকে। তার ওপর এখনও সেই নটীর সন্ধান না পাওয়ায় সব সময় বিষণ্ণ থাকে ছেলেটা।

শঙ্খপাল তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন তার মাথায়। মৃদু চমকে উঠে অশনি ফিরে তাকাল তাঁর দিকে। শঙ্খপাল সস্নেহে তাকে বললেন, 'আর তো মাত্র দুটো দিন। তারপর একলা থাকতে হবে না তোমাকে। আমরা হস্তিদ্বীপে যাব। শুনেছি সে জায়গা খুব সুন্দর। আমি যা কাজ জানি, সব শেখাব তোমায়।'

তাঁর কথা শুনে অশনি বলল, 'কিন্তু মাকে খুঁজে না পেলে আমি সেখানে যাব কী করে? হয়তো তিনিও আমাকে খুঁজছেন। আমি সেখানে চলে গেলে তিনি আমাকে খুঁজে পাবেন কীভাবে?'

এত বড় পৃথিবীতে শুধু 'মা' নামে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না সেকথা আর সেই সত্য-সন্ধানী জৈন সন্ন্যাসীর মতো ছেলেটার মুখের ওপর বলতে পারলেন না শঙ্খপাল। তিনি বললেন, 'মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের কাজ মিটে গেলেই আমি তাঁর সন্ধানে মান্যখেতে যাব।'

একথা বলার পর প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য তিনি বললেন, 'তুমি একটা মূর্তি আমাকে দেখাবে বলেছিলে। কোথায় সেটা? দেখি কেমন মূর্তি বানিয়েছ তুমি?'

BanglaBook.org

অশনির মনে পড়ে গেল সেই জৈন সন্ন্যাসীর নির্দেশের কথা। সে জবাব দিল, 'ও মূর্তি আমি তোমাকে পরে দেখাব।' তারপর শঙ্খপাল মূর্তি প্রসঙ্গে আরও কিছু জিগ্যেস করেন সেই ভয়ে কক্ষত্যাগ করল সে।

পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কৈলাস মন্দিরে যেতে হবে। তাই আহারাদি সাঙ্গ করে তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করলেন শঙ্খপাল।

চরণন্দ্রী পাহাড়ের ঠিক মাথার ওপর পৌঁছে গেল চাঁদ। কিন্তু মাঝরাতে আবার সেই বিকট স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি হল ঘুমের মধ্যে। সেই একই স্বপ্ন! সম্রাট মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে গিয়ে দেখলেন তাঁর তর্জনী নেই।

আর তারপরই তাঁর মনে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করলেন তিনি। অতি দ্রুত পোশাক পালটে তিনি কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলেন। চরণন্দ্রী পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তাঁর ঘোড়ার খুরের শব্দ।

প্রায় ঝড়ের বেগেই মন্দির চত্বরের প্রবেশ তোরণে পৌঁছে গেলেন শঙ্খপাল। প্রবেশ তোরণ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন রক্ষী প্রধান মারীচসহ তার বাহিনী। শঙ্খপালের নির্দেশেই এই প্রহরার ব্যবস্থা। শঙ্খপাল তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'সব ঠিক আছে তো? মন্দির চত্বরে কেউ প্রবেশ করেনি তো?'

মারীচ জবাব দিলেন, 'সব ঠিক আছে। চত্বরের ভিতরেও প্রহরী মোতায়েন আছে। তবে এক জৈন সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করেছেন।'

শঙ্খপাল তাঁর কথা শুনে আঁতকে উঠে বললেন, 'তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেন কেন?'

রক্ষী প্রধান বললেন, 'সন্ন্যাসীকে আমি না চিনলেও তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার বা আপনারও নেই। তাঁর কাছে সম্রাটের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ আঁকা সুবর্ণা আছে! ওই মুদ্রা সঙ্গে থাকলে রাজঅন্তঃপুরেও প্রবেশ করা যায়। সম্রাটের প্রধান সহকারী সহ আর মাত্র কয়েক জনের কাছে ওই মুদ্রা থাকে। তাঁর গতি আমি রোধ করি কীভাবে?'

মারীচের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অশ্ব সমেতই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেন শঙ্খপাল। তাঁর বুকের ভিতর কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। পাথুরে চত্বরে ঘোড়ার খুরের ঝড় তুলে শঙ্খপাল গিয়ে দাঁড়ালেন নন্দী মণ্ডপের একপাশে সেই আচ্ছাদন ঘেরা

BanglaBook.org

জায়গাতে। উত্তেজনায় তাঁর হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কী দেখবেন তিনি? কাঁপা কাঁপা হাতে চক্‌মকি পাথর ঘষে মশাল জ্বালিয়ে পর্দা সরালেন। পর মুহূর্তেই তাঁর উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। না, সম্রাট অমোঘবর্ষর তর্জনী যথাস্থানেই আছে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে সেই সন্ন্যাসীকে। কে তিনি? যার কাছে আছে সম্রাটের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দেওয়া সুবর্ণা!

মূর্তিটা আবার আচ্ছাদিত করে একজন রক্ষীকে হাঁক দিলেন তিনি। শঙ্খপালের প্রশ্নর জবাবে সে জানল যে একজন জৈন সন্ন্যাসীকে সে কৈলাস মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখেছে। তার কথা শুনে শঙ্খপাল সে জায়গায় প্রহরীকে দাঁড় করিয়ে রেখে মশাল হাতে এগোলেন সন্ন্যাসীর খোঁজে।

ছাদহীন নন্দী মণ্ডপ অতিক্রম করে শঙ্খপাল পৌঁছে গেলেন কৈলাস মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারে। তার দু-পাশে দুটো ধ্বজাস্তম্ভ আকাশের দিকে মুখ তুলে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ন্যাসীকে খোঁজার জন্য শঙ্খপাল আগে একতলার কক্ষগুলো পরিভ্রমণ করতে শুরু করলেন।

শঙ্খপাল অন্তত হাজারবার দেখেছেন এখানকার একটি ভাস্কর্য। কত প্রহর তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছে এই পাথর খোদিত চিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। তাঁর শিক্ষাগুরু বিষ্ণুপালের রচনা। কৈলাস মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্যের নিদর্শন তাঁর সামনে। মশালটা আরও ভালো করে তিনি তুলে ধরলেন সেই দেওয়াল চিত্রের সামনে। দশানন রাবণ এসেছেন মহাদেবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে। শিব রাজি না হওয়ায় কৈলাস পর্বত সহ শিবকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ হাতে কৈলাস পর্বতকে উৎপাটন করার চেষ্টা করছেন ঘর্মাক্ত রাবণরাজ। থরথর করে কাঁপছে কৈলাস পর্বত।

এ চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল, শিল্পীর দক্ষতায় পাথর খোদিত চিত্রর দিকে তাকালেই মনে হয় সত্যিই যেন থরথর করে কাঁপছে কৈলাস পর্বত। শঙ্খপাল যতবার তাকিয়েছেন ততবারই তাঁর একই মনে হয়েছে। হঠাৎ পদশব্দে সম্বিত ফিরল তাঁর। পিছনে ফিরে তিনি দেখলেন কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই সন্ন্যাসী!

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। দুজনেই তাকিয়ে রইলেন দুজনের

BanglaBook.org

দিকে। তারপর সন্ন্যাসী বললেন, 'একটা কথা মানতেই হবে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, এ মন্দিরের শিল্পকার্যগুলো কিন্তু সত্যিই অসাধারণ।'

একজন জৈন সন্ন্যাসীর কাছ থেকে হিন্দু মন্দিরের ভাস্কর্যের এ প্রশংসা আশা করেননি শঙ্খপাল। স্মিত হেসে শঙ্খপাল বললেন, 'ধন্যবাদ।'

সন্ন্যাসী এরপর বললেন, 'চলুন আমরা নীচে নেমে চত্বরে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ করি। আশাকরি দুজনেরই কিছু বলার আছে। সুন্দর চাঁদ উঠেছে আজ।'

নীচে নামতে নামতে শঙ্খপাল খেয়াল করলেন আজ সন্ন্যাসীর হাতে কাপড় জড়ানো কী যেন একটা ধরা আছে।

চত্বরে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন শিল্পী ও সন্ন্যাসী। চারপাশে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, 'মন্দির চত্বরের প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দেখছি!'

কৈলাস মন্দিরের প্রধান শিল্পী প্রথমে হেসে বললেন, 'পূর্ণিমাতিথিতে অমোঘবর্ষ মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে আসছেন। ওই সময়কালের মধ্যে কেউ যাতে মন্দিরের কোনও ক্ষতি সাধন করতে না পারে তাই এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা।'

এরপর শঙ্খপাল সন্ন্যাসীর হাতে বস্ত্রখণ্ড জড়ানো বস্তুটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার হাতে বস্ত্রজড়ানো কী জিনিস আছে। ছেনি বা কীলক জাতীয় যন্ত্রপাতি আছে নাকি ওর মধ্যে? তাহলে সে প্রচেষ্টা আপনার সফল হবে না।'

সন্ন্যাসী শঙ্খপালের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বললেন, 'না, এর মধ্যে ওই জাতীয় কোনও বস্তু নেই। এই বস্ত্রখণ্ডর মধ্যে সত্য ধরা আছে। যে সত্যর সন্ধান পেয়ে গেছি আমি। এর মধ্যে একটা মূর্তি আছে। এই মন্দির থেকে ছিন্ন করা কোনও মূর্তি নয়। অন্য এক মূর্তি।'

জৈন সন্ন্যাসী এরপর বললেন, 'তীর্থঙ্কর মহাবীর আমাকে সত্য কথা বলতে শিখিয়েছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন যে সম্রাট মূর্তির তর্জনী আমিই ছিন্ন করেছিলাম। হ্যাঁ, আমিই অন্ধকার নামার পর গোপনে মন্দিরের পশ্চাৎভাগ দিয়ে চত্বরে প্রবেশ করার পর দু-দুবার ছিন্ন করেছি ওই তর্জনী।'

তাঁর কথা শুনে শঙ্খপাল বলে উঠলেন, 'আপনি কে? কী আপনার পরিচয়? রক্ষীপ্রধান বললেন, আপনার কাছে সম্রাটের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন যুক্ত

BanglaBook.org

সুবর্ণা আছে! অর্থাৎ আপনি সম্রাটের অতীব ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙক্ষী। আবার আপনিই সম্রাট-মূর্তির তর্জনী ছেদন করেছেন? সম্রাটের কোনও হিতাকাঙক্ষী সম্রাট-মূর্তির তর্জনী ছেদন করতে পারে না। আপনি কী ভাবে সংগ্রহ করেছেন ওই সুবর্ণা?'

শঙ্খপাল ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বললেও সন্ন্যাসী বেশ শান্ত স্বরেই বললেন, 'আমি তস্কর নই। সম্রাট নিজের হাতে আমাকে এই সুবর্ণা দিয়েছেন। যাতে কোথাও কেউ আমার গতিরোধ করতে না পারে।'

বিস্মিত শঙ্খপাল বলে উঠলেন, 'তবে কে আপনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি গৃহহীন, সম্পদহীন ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত অতি নগণ্য এক জৈন সন্ন্যাসী। আমার নাম জিনসেন। আমি সম্রাটের হিতাকাঙক্ষী।'

জিনসেন! মহাসদ্ধিবিগ্রহীর কথা এ নামটা শুনে মনে পড়ে গেল শঙ্খপালের। তাহলে এই সেই সন্ন্যাসী! শঙ্খপাল এবার বুঝতে পারলেন কেন সেই সুবর্ণার অধিকারী তিনি। শঙ্খপাল আরও বিস্মিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'শুনেছি সম্রাটকে জৈন ধর্মে দীক্ষিত করতে চলেছেন। তবে আপনি সম্রাটের মূর্তির অনিষ্ঠ সাধন করছেন কেন?'

সন্ন্যাসী জিনসেন বললেন, 'আপনার বক্তব্য সঠিক। আমার হাত ধরেই সম্রাট সত্যমার্গে দীক্ষিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ পথ একাধারে অতি সহজ আবার অতীব কঠিনও বটে। আমি দেখতে চাই সম্রাট সর্বসমক্ষে নিজের সম্বন্ধে কঠিন সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে পারেন কিনা? সাম্রাজ্য নয়, রাজ ঐশ্বর্য্য নয়, মানুষের কাছে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় হল তার নিজের সৌন্দর্য। যদি দেখি সম্রাট তাঁর নিজের সত্যকে অস্বীকার করছেন তাহলে বুঝব তিনি এখনও তীর্থঙ্করের দেখানো পথে চলার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেননি। তাই সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই সম্রাটমূর্তির তর্জনীছেদ করেছি আমি।'

শঙ্খপাল অবাক হয় জৈন সন্ন্যাসী জিনসেনের কথা শুনে।

সন্ন্যাসী এরপর শঙ্খপালকে বললেন, 'আপনার কাছে আমার শেষ অনুরোধ সম্রাট মূর্তির ওই তর্জনী ছেদ করে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করুন। আপনিও বর্ধমানের দেখানো সত্যপথের পথিক হন। আপনারও মুক্তি ঘটবে এতে।'

BanglaBook.org

জিনসেনের কথা শুনে শিল্পী শঙ্খপাল বলে উঠলেন, 'তা কখনোই সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীর কাছে সত্য সুন্দর হলেও শিল্পীর কাছে শেষ সত্য হল তাঁর শিল্প। এ মূর্তির কোনওরূপ ক্ষতিসাধন আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সন্ন্যাসীর মুখে আচ্ছাদন থাকলেও শঙ্খপালের মনে হল যে তাঁর কথা শুনে তিনি যেন হাসলেন। শঙ্খপালের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'দেখা যাক আপনি না আমি, শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হয়।'—একথা বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন মন্দির চত্বরের বাইরে যাওয়ার জন্য। কৈলাস মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে চন্দ্রালোকে চরণন্দ্রী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলতে চলতে জিনসেন ভাবতে লাগলেন শঙ্খপালকে তিনি সম্রাটের মূর্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন বলে এলেও সেকাজ বর্তমানে খুব কঠিন। রক্ষীপরিবৃত মন্দির চত্বর। সেখানে তাঁর প্রবেশাধিকার থাকলেও সত্যিই তাঁর মূর্তি ভাঙার অধিকার নেই। তর্জনী ছেদনে বাধা দেবে রক্ষীরা। কিন্তু কাজটা যে তাকে করতেই হবে। নইলে সম্রাটের পরীক্ষা নেওয়া তাঁর হবে না। শঙ্খপালের শিল্পের কাছে পরাজিত হবে জিনসেনের সত্য। কাজটা তাঁকে যেভাবেই হোক করতে হবে।

৮

গত রাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছে অশনি। সেই সন্ন্যাসীর কথা শোনার পরে উত্তেজনায় ঘুম আসেনি তার। মাঝরাতে শঙ্খপাল কক্ষ ছেড়ে রওনা হওয়ার পর সে প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। সেই সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছিল যদি সেই সন্ন্যাসী তার মাকে খুঁজে দেন তবে এত বড় কাজের জন্য তাঁকে কিছু উপহার দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কী উপহার দেওয়া যায় তাঁকে? আর এরপরই তাঁর মাথায় এল যদি তাঁকে গুহার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহাবীরের মূর্তিটা বানিয়ে দেওয়া যায় তবে কেমন হবে? তাহলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন সেই সন্ন্যাসী।

অশনির ঘরে ছোট-বড় পাথর আছে। শঙ্খপালই সেসব এনে দিয়েছেন তাকে ঘরে বসে মূর্তি বানাবার জন্য। যা দিয়ে অশনি বানিয়েছে তার মা-র মূর্তি সহ অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি। তেমনই একটা পাথর তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

ভাবনাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করেছিল অশনি। এক প্রহরের মধ্যেই সে বানিয়ে ফেলেছে হাতের তালুতে রাখা যায় এমন ক্ষুদ্রাকৃতি এক মহাবীরের মূর্তি। তারপর শেষ রাতে প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

আলো ফোটার পর থেকেই অশনি মূর্তিটা হাতে ধরে গবাক্ষর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, দিক্‌চক্রবালে যেখানে চরণন্দ্রী পাহাড়ের প্রান্তসীমা মিশেছে সেদিকে তাকিয়ে। ওখানেই তো তার জন্য অপেক্ষা করে আছেন সেই সন্ন্যাসী। সত্যিই কি তিনি তার মায়ের খোঁজ পেয়েছেন? অশনি গল্প শুনেছে অনেক সন্ন্যাসী নাকি দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন হন। তাঁরা ধ্যানযোগে সব কিছু দেখতে পান, জানতে পারেন। এ সন্ন্যাসী কি তেমন কেউ?

'অশনি?'—পাশের কক্ষ থেকে শঙ্খপালের ডাক শুনে অশনির চিন্তাজাল ছিন্ন হল। তাঁর কখন ঘুম ভেঙেছে অশনি খেয়াল করেনি। ঘুম বেশ কিছুক্ষণ আগেই ভেঙেছে শঙ্খপালের। বাইরে বেরোবার জন্যে ইতিমধ্যে তৈরিও হয়ে নিয়েছেন তিনি। এদিন সব কাজ সম্পন্ন করে তিনি কখন ঘরে ফিরতে পারবেন জানেন না শঙ্খপাল। ব্যাপারটা অশনিকে জানাবার জন্যই তিনি ডাক দিলেন তাকে।

অশনি ডাক শুনে তাড়াতাড়ি সেই ক্ষুদ্র মূর্তিটা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে নিজের কক্ষ ছেড়ে পাশের কক্ষে শঙ্খপালের সামনে হাজির হতে যাচ্ছিল। কিন্তু অসাবধানতায় চৌকাঠে মৃদু হোঁচট খেল সে। আর সেই ছোট্ট মূর্তিটা শঙ্খপালের পায়ের সামনে ছিটকে পড়ে দু-টুকরো হয়ে ভেঙে গেল! শঙ্খপালের ধারণা হল অশনি মূর্তিটা তাঁকেই দেখাবার জন্য আনছিল। তিনি তাড়াতাড়ি মাটি থেকে খণ্ড দুটো তুলে নিয়ে সে দুটো জুড়ে একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'মহাবীর মূর্তি! খুব সুন্দর হয়েছে! কিন্তু এ মূর্তি তুমি কোথায় দেখলে? কৈলাস মন্দিরে তো এ মূর্তি নেই?'

অশনি একটু ইতস্তত করে বলল, 'চরণন্দ্রী পাহাড়ের শেষ প্রান্তে একটা গুহার সামনে এ মূর্তি দেখেছি।'

চরণন্দ্রী পাহাড়ের শেষ প্রান্তে জৈন গুহাগুলোতে এমন বেশ কিছু মূর্তি আছে তা জানেন শঙ্খপাল। তাঁর মাথায় আজ অনেক কাজের চাপ। এই একটা দিনই সময় হাতে। সম্রাট অমোঘবর্ষর আগমনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। তাই তিনি আর সময় নষ্ট না করে অশনির হাতে

BanglaBook.org

মূর্তির অংশ দুটো ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সুন্দর মূর্তি! তোমার দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই। বজ্রপ্রলেপ দিয়ে মূর্তিটা জোড়া যাবে। আমি এখন মন্দিরে যাব। ফেরার সময় আমি নতুন পোশাক আনব তোমার জন্য। ওই পোশাক গায়ে দিয়ে আগামীকাল তুমি আমার সঙ্গে মন্দিরে যাবে।'

অশনির মুখে হাসি ফুটে উঠেছে দেখে শঙ্খপালও হেসে কক্ষত্যাগ করলেন। শঙ্খপালের ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই মূর্তির ভাঙা টুকরো দুটো হাতে নিয়েই অশনি রওনা হল চরণন্দ্রী পাহাড়ে। অশনি পাহাড়ের ঢালে একটার পর একটা গুহামন্দিরকে পিছনে ফেলে অর্ধচন্দ্রাকার পথ বেয়ে যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলল চরণন্দ্রী পাহাড়ের প্রান্তসীমার দিকে। এক সময় সে পৌঁছে গেল সেখানে। অশনি দেখল সেই বিশাল তীর্থঙ্কর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জৈন সন্ন্যাসী।

ভোরের আলো ফোটার পর থেকেই জৈন সন্ন্যাসী জিনসেনও অশনির মতো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন দুজনের সাক্ষাতের।

সত্য অনুসন্ধানী জৈন সন্ন্যাসী সন্ধান পেয়েছেন সেই নটীর। আর অনেক ভাবনার পর সম্রাটমূর্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠার একটা পথও তিনি খুঁজে পেয়েছেন। সেটাই হয়তো একমাত্র পথ। নইলে তাঁকে পরাজিত হতে হবে শিল্পী শঙ্খপালের কাছে। শিল্পর কাছে পরাজিত হবে সত্য। তা কিছুতেই হতে দিতে পারেন না জিনসেন। তিনি ভেবে রেখেছেন এক সত্যর বিনিময়ে আর এক সত্যকে অশনির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। হ্যাঁ, একমাত্র এই বালকের পক্ষেই সম্ভব এই কাজ।

অশনি এসে দাঁড়াল সন্ন্যাসীর সামনে। সে যেন আর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারছে না। তার ছোট্ট শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। সে মাথা ঝুঁকিয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করল, 'তাঁর সন্ধান তুমি পেয়েছ?'

একটু চুপ করে থেকে সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সন্ধান আমি পেয়েছি।'

অশনি বলে উঠল, 'কোথায় তিনি? কোথায়?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তাঁকে আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁর সন্ধান আমি তোমাকে দেওয়ার আগে তার বিনিময়ে তোমাকে আমার একটা শর্ত পূরণ করতে হবে। আমি যে কাজের দায়িত্ব দেব তা পালন করতে হবে

BanglaBook.org

তোমাকে।'

অশনি বলল, 'আপনি আগে বলুন তিনি কোথায়? আমার অনুমান আপনি যখন তাঁকে দেখেছেন তিনি কাছাকাছিই আছেন। আমি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি, তারপর আপনি যেকাজ বলবেন আমি সেকাজ করে দেব।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, আগে কার্য সম্পাদন করতে হবে তারপর আমি তাঁর সন্ধান দেব। তাঁকে দেখার পর হয়তো তুমি বিহ্বল হয়ে পড়বে। তা ছাড়া যেকাজের দায়িত্ব আমি তোমাকে দেব সেকাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় বড় কম আছে হাতে। বলো তুমি সেকাজ সম্পন্ন করবে? নচেৎ তোমাকে আমি খোঁজ দেব না সেই নটীর।' বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাগুলো বললেন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনে এবার একটু থমকে গিয়ে অশনি তাঁকে বলল, 'কী কাজ?'

সন্ন্যাসী তাকে বললেন, 'তোমাকে আমি কৈলাস মন্দির চত্বরে দেখেছি। তুমি প্রধান শিল্পী শঙ্খপালের আশ্রিত বলে রক্ষীরা তোমার গতিরোধ করে না তাই তো?'

অশনি মাথা নেড়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ। আমাকে রক্ষীরা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতে দেয়। যদিও প্রধান শিল্পী আমাকে বেশিক্ষণ থাকতে দেয় না সেখানে।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'চত্বরে সম্রাট অমোঘবর্ষর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা তুমি জানো?'

অশনি জবাব দিল, 'হ্যাঁ, প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল নির্মাণ করেছেন সেই মূর্তি। সম্রাট মূর্তি আমি না দেখলেও আচ্ছাদিত সে-স্থান আমি দেখেছি। শুনেছি ভাস্কর শঙ্খপাল নাকি অসাধারণ সুন্দর নির্মাণ করেছেন সম্রাট মূর্তি।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, সে মূর্তি সুন্দর নয়। কারণ সে মূর্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। কারণ, সত্যই সুন্দর, তুমিই একমাত্র পারো তাকে সুন্দর রূপ দিতে।'

বিস্মিত অশনি জানতে চাইল, 'কী ভাবে?'

তার প্রশ্নের জবাবে সন্ন্যাসী যা বললেন তা শুনে অশনি এতটা চমকে

BanglaBook.org

উঠল যে বজ্রপাত হলেও সে এত চমকাত না। সন্ন্যাসী বললেন, 'মন্দির চত্বরে ঢুকে সবার অলক্ষে ওই সম্রাট মূর্তির দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ছেদন করে দিয়ে আসতে হবে।'

চমকে উঠে অশনি বলল, 'কেন? আমি মূর্তির তর্জনী ছেদ করব কেন?'

সন্ন্যাসী বললেন সম্রাটের দক্ষিণ হস্তে তর্জনী নেই। চালুক্য বিদ্রোহীরা বহুদিন আগে একবার আক্রমণ করেছিল সম্রাটের রাজ্য। ভীষণ বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন সম্রাট। যুদ্ধে জয়লাভের আশায় কোতলাপুরে মহালক্ষী মন্দিরে নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বলি দিয়ে তিনি দেবীর কাছে জয় প্রার্থনা করেছিলেন। যুদ্ধে অবশ্য শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিলেন সম্রাট। তবে তারপর থেকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত তর্জনীহীন। আমি জৈন সন্ন্যাসী। সত্যই আমার পথ। মানুষকে সত্য দর্শন করানোই আমার ব্রত। সম্রাটকে আমি সত্য দর্শন করাতে চাই। সত্যই সুন্দর।'

তাঁর কথা শুনে অশনি বলল, 'কিন্তু প্রধান ভাস্কর যে বলেন একজন শিল্পীর কাছে সবচেয়ে সত্য হল তার শিল্প? তার মধ্যেই নাকি লুকিয়ে আছেন ঈশ্বর? শিল্পই নাকি শিল্পীর মুক্তির একমাত্র পথ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল অত্যন্ত বড় ভাস্কর ঠিকই। কিন্তু তিনি সত্যদ্রষ্টা নন। তাই আপাত দৃষ্টিতে তাঁর শিল্পকর্মকে সুন্দর মনে হলেও তা অসুন্দর। তুমি এ কার্য সম্পাদনে রাজি কি না বলো?'

অশনি আঁতকে উঠে বলল, 'আমি প্রধান শিল্পী শঙ্খপালের আশ্রিত। তিনি কত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছেন ওই সম্রাট মূর্তি? সবচেয়ে বড় কথা মূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি সম্রাটের কোপে পড়বেন। যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন আমি তাঁর প্রাণদণ্ডের কারণ হব কীভাবে? এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সন্ন্যাসী বললেন প্রধান শিল্পী শঙ্খপালের আশ্রয় পরিত্যাগ করে তুমি সত্যর আশ্রয় গ্রহণ করো। সত্যই মুক্তির একমাত্র পথ। এ কার্য সম্পাদন না করলে কখনোই সেই নটীর সংবাদ আমি দেব না তোমাকে।'

এবার মৃদু ধন্ধে পড়ে গেল অশনি। কী করবে সে?

সন্ন্যাসী এরপর বলতে শুরু করলেন, 'সম্রাট অমোঘবর্ষও সত্যর পথ গ্রহণ করতে চলেছেন। আমিই তাঁকে তীর্থঙ্করদের আদর্শে দীক্ষিত করতে

BanglaBook.org

চলেছি। সম্রাটের ভাবনা চিন্তার ওপর আমার অসীম প্রভাব। আমার বক্তব্যর তিনি অমর্যাদা করেন না। আমি মিথ্যা বচন বলি না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না। এই সত্যর প্রতিমূর্তি তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তির তলে দাঁড়িয়ে তাঁকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ওই তর্জনী ছেদনে তোমার বা প্রধানশিল্পী শঙ্খপালের কোনও ক্ষতি হবে না। মূর্তির আবরণ উন্মোচনের সময় উপস্থিত থাকব সম্রাটের কাছে। আমি সম্রাটের ক্রোধ প্রশমিত করব। আমি তাঁকে বলব এ কাজে শঙ্খপালের কোনও দায় নেই। তার অগোচরে মূর্তির অঙ্গুলি ছেদন আমার নির্দেশেই হয়েছে। আমি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনতে শুনতে অশনির ভাবনা এবার ধীরে ধীরে যেন প্রভাবিত হতে শুরু করল। তিনি এরপর বলে যেতে লাগলেন—'তুমি যদি ওই মূর্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারো তবে তোমাকে আমি আমার প্রধান শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

তোমার পিতামাতার শেষ ইচ্ছা তুমি 'এলাপুর ভাস্কর' হও। প্রধান শিল্পী শঙ্খপাল যে ব্যবস্থা করতে পারেননি সে কাজের ব্যবস্থা আমি করব। সম্রাট তর্জনীহীন মূর্তি দর্শনের পর তুমি আবার নির্মাণ করবে সেই তর্জনী। তুমি হয়তো জানো যে মন্দির চত্বরে এক প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে 'এলাপুর ভাস্কর'-দের নাম। ওই তর্জনী পুনরায় নির্মাণের পর সম্রাটের নির্দেশে ওই প্রস্তর ফলকে খোদিত হবে তোমার নামও।

অশনি, তুমি কি চাওনা তোমার গর্ভধারিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? তুমি কি ভুলে যাবে তাঁর ভালোবাসার কথা? তাঁর আত্মত্যাগের কথা? তাঁকে খুঁজতেই তো তুমি এতদূরে ছুটে এসেছ। তাহলে কি তোমার মাকে খোঁজার প্রচেষ্টা একটা ছল ছিল?—একই কথা বারবার নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে যেতে লাগলেন সন্ন্যাসী জিনসেন। সেকথা শুনতে শুনতে এক সময় অশনি চিৎকার করে বলে উঠল, 'না, না, আপনি এমন কথা বলবেন না। মাকে খোঁজা আমার ছল নয়। তাঁকে পাওয়ার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

অশনি এরপর চোখ মুছে বলল, 'চলুন, কীভাবে আমাকে সেকাজ করতে হবে তা দেখিয়ে দিন।'

ঠিক এই মুহূর্তর জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি বললেন,

BanglaBook.org

'চলো, কৈলাস মন্দিরের দিকে আমাদের যেতে হবে।' এই বলে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। অশনি এক তুমুল মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনুসরণ করল তাঁকে।

চরণন্দ্রী পাহাড়ের একপ্রান্তে জৈন গুহাগুলি, অন্যপ্রান্তে কৈলাস মন্দির। সেদিকে এগোতে এগোতে জিনসেন হঠাৎ খেয়াল করলেন অশনির মুঠোতে কী যেন ধরা আছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'তোমার হাতে কী আছে?'

অশনি নিস্পৃহভাবে তীর্থঙ্কর মূর্তির খণ্ড দুটো তুলে দিল সন্ন্যাসীর হাতে। তীর্থঙ্করের মূর্তি দেখে বেশ চমৎকৃত হলেন জৈন সন্ন্যাসী। তিনি বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই এ মূর্তি বানিয়েছ? এত সুন্দর মূর্তি ভাঙল কীভাবে?'

সামান্য একটু মাথা নেড়ে মূর্তিটা যে সেই বানিয়েছে সে ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করল অশনি। তার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। একবার তার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে তার দুঃখিনী মায়ের মুখচ্ছবি আর একবার তার আশ্রয়দাতা কৈলাস মন্দিরের প্রধান শিল্পী শঙ্খপালের স্নেহার্দ্র মুখমণ্ডল!

সন্ন্যাসী বললেন, 'কিছুটা এগোলেই আমাদের যাত্রাপথের পাশে এক বৃক্ষ আছে। তার কাণ্ডে আঘাত করলেই বজ্র প্রলেপ নির্গত হয়। তা দিয়ে এ মূর্তি জুড়ে দেব আমি। তারপর এ মূর্তি আমি সম্রাট অমোঘবর্ষকে উপহার দেব।'

সন্ন্যাসীর কথা শুনে অশনি একবার মুখ তুলে তাকাল সেই বৃক্ষর দিকে। বটবৃক্ষর মতো দেখতে গাছটা। সন্ন্যাসী এরপর তাঁর পোশাকের ভিতর থেকে একটা ক্ষুদ্র ধারালো ছুরিকা বার করে তার কাণ্ডে আঘাত করতেই ঘন দুধের মতো সাদা রস বেরিয়ে এল তার গা বেয়ে। বজ্রপ্রলেপ। তা দিয়ে মূর্তির খণ্ড দুটোকে জুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী আবার হাঁটতে শুরু করলেন। এক সময় তারা পৌঁছে গেল কৈলাস মন্দিরের কাছে।

মন্দির চত্বরে তখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। অনেক লোকজন সেখানে। কাঠের বালতিতে জল নিয়ে মন্দির গাত্র আর নন্দী মণ্ডপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করছে একদল মজুর। কেউ কেউ নানা রঙের নিশান টাঙাচ্ছে এখানে-ওখানে। তার মধ্যে সম্রাট অমোঘবর্ষর গঙ্গা-যমুনা নিশানও আছে।

দ্বিপ্রহরের পর কাজের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল। দিনের শেষ

BanglaBook.org

আলো এসে পড়েছে কৈলাস মন্দির ও নন্দী মণ্ডপ চত্বরে। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে চত্বরসহ মন্দিরটা। সেদিকে তাকিয়ে অশনিও যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল সব কিছু। সন্ন্যাসী জিনসেন এরপর তার হাতে সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা তুলে দিয়ে বললেন, 'সময় হয়েছে। এবার তুমি যাও।

সামনের সুড়িপথ বেয়ে তুমি মন্দিরে পৌঁছে যাবে। আমি তোমার জন্য এই স্থানে প্রতীক্ষা করব। তুমি তোমার কাজের প্রমাণস্বরূপ কর্তিত তর্জনীটা 'আমার হাতে এনে দেবে।'

৯

কৈলাস মন্দিরে শঙ্খপালের সব কাজ যখন শেষ হল তখন চরণন্দ্রী পাহাড়ের গুহা মন্দিরগুলোতে শেষ বিকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। জীবন্ত হয়ে উঠেছে গুহা মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন মূর্তিগুলো।

মন্দির চত্বর পরিত্যাগ করার আগে শঙ্খপাল একবার এসে দাঁড়ালেন নন্দী মণ্ডপ সংলগ্ন সেই জায়গাতে। রেশমের পর্দা দিয়ে ঘেরা হয়েছে জায়গাটা। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে চারপাশ। পর্দা সরিয়ে প্রধান শিল্পী শঙ্খপাল তাকালেন মূর্তিটার দিকে। দীর্ঘ একটা মালা পরানো হয়েছে সম্রাট মূর্তির গলায়। নিজের শিল্পকর্ম দেখে নিজেই বিস্মিত বোধ করলেন ভাস্কর শঙ্খপাল। কোনও পাথরের মূর্তি নয়, স্বয়ং অমোঘবর্ষই যেন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে! সম্রাটের দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন শঙ্খপাল। শেষ পর্যন্ত তবে জয় হল শিল্পরই।

চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথায় সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে এক পোশাক বিক্রেতার কাছে গেলেন তিনি। তার থেকে অশনির জন্য একটা লাল রেশমের পোশাক সংগ্রহ করে যখন তিনি ফিরলেন তখন অন্ধকার নেমে গেছে। কক্ষে অশনিকে দেখতে না পেয়ে বেশ একটু অবাক হলেন শঙ্খপাল।

শেষ বিকালের আলোতে পশ্চিমমুখী মন্দিরগুহাগুলোর ভাস্কর্য প্রাণ ফিরে পায়। অশনি ওই সময় মাঝে মাঝে সেগুলো দেখতে যায়। মনে মনে ভাবলেন হয়তো তেমনই কিছু হবে। স্নান সেরে, পোশাক পরিবর্তন করে,

BanglaBook.org

সামান্য কিছু আহারাদি গ্রহণ করে শঙ্খপাল রওনা হয়ে গেলেন তাঁরই ডাকা সভার উদ্দেশ্যে।

সারা এলাপুর গ্রামই যেন ভেঙে পড়েছে সেই সভায়। শিল্পী, মজুর, রক্ষিবাহিনীর সবাই সে-সভায় উপস্থিত থেকে শঙ্খপালের নির্দেশ শুনলেন ও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করলেন। সভা ভাঙতে মাঝ রাত্রি হয়ে গেল। ঘরে ফেরার জন্য শঙ্খপাল যখন ঘোড়ার উঠতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই মন্দির থেকে একজন রক্ষী এসে খবর দিল মহাসামন্তর নেতৃত্বে সম্রাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীদের একটা দল হাজির হয়েছে মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য। তারা প্রধান ভাস্করের সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁর জন্য সেই মহাসামন্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারে প্রতীক্ষা করছেন।

একথা শোনার পর কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের আর ঘরে ফেরা হল না। পরপর রাত্রি জাগরণ ও পরিশ্রমের ফলে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। তিনি ভেবেছিলেন ঘরে ফিরে কিছুটা সময় নিদ্রা দেবেন। তার পরিবর্তে এ সংবাদ পেয়ে সহকারী প্রধান ভাস্কর চন্দ্রপালকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন কৈলাস মন্দিরের দিকে।

মন্দির চত্বরের প্রবেশ তোরণেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল মহাসামন্তর। তার সঙ্গে সম্রাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী। পরস্পরকে প্রথামাফিক সম্মান প্রদর্শনের পর মহাসামন্ত জানালেন, তারা এসেছেন মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ও মন্দির চত্বরের দখল নিতে। সম্রাট এসে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তারাই সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকি করবে। মন্দিরের ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখানে সম্রাট গমন করবেন সেই স্থান রক্ষীদের চিনিয়ে দিতে হবে শঙ্খপালকে। কলচুরি বিদ্রোহীরা নাকি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা গুপ্তহত্যার চেষ্টা করতে পারে সম্রাটকে।

মহাম: বক্তব্য শোনার পর প্রবেশতোরণ খুলে দেওয়া হল। মহামাত্য ও তাঁর অস্ত্রধারী সঙ্গীদের নিয়ে কৈলাস মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেন দুই শিল্পী।

চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে তুষারধবল কৈলাস মন্দির। রুপালি চাঁদের আলো যেন চুঁইয়ে পড়ছে তার গা বেয়ে। চত্বরের বিভিন্ন জায়গাতেও দাঁড়িয়ে আছে নানা দেবদেবী-নটী-অপ্সরামূর্তি। এ যে স্বপ্নে দেখা মায়াপুরী!

BanglaBook.org

কোন এক অলীক সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে চোখের সামনে! মহাসামন্ত বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে শঙ্খপালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ মন্দির আপনারা নির্মাণ করেছেন!'

প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাই। একশো বছর ধরে হাজার শিল্পী-মজুরদের পরিশ্রমের ফলে গড়ে উঠেছে এই মর্তের বিস্ময়।'

মহাসামন্ত এবার মন্দিরের দিকে এগোতে এগোতে স্বগতোক্তি করলেন, 'হ্যাঁ, এ স্থাপত্য মর্তের বিস্ময়ই বটে! এ মন্দির দেখার পর সম্রাট যদি মান্যখেত থেকে তাঁর রাজধানী এই এলাপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন তা হলে আমি আশ্চর্য হব না।'

মহাসামন্তকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল দ্বিতলের উপসনা কক্ষে। সেখানে হর-পার্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন সম্রাট। তারপর মন্দিরে আনাচে-কানাচে তাঁকে পরিদর্শন করিয়ে অবশেষে তাঁকে এনে দাঁড় করানো হল রেশমবস্ত্রে ঘেরা সেই নির্দিষ্ট জায়গার সামনে। সে-জায়গা দেখিয়ে প্রধানশিল্পী শঙ্খপাল বললেন, 'এর ভিতর সম্রাট অমোঘবর্ষর মূর্তি আছে। সম্রাট অমোঘবর্ষ কাল এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন।'

মহাসামন্ত ঘেরা জায়গাটার চারদিক একবার প্রদক্ষিণ করে বললেন, 'আমার পরিদর্শন শেষ। মন্দির রক্ষণের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করছি। অনেক রাত হল। এবার আপনারা ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।'—এই বলে মহাসামন্ত এগোলেন চত্বরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা নটী মূর্তি দেখার জন্য।

এবার ফিরতে হবে। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে শঙ্খপালের শরীর। যাওয়ার আগে নিছকই একবার মূর্তিটাকে দেখার জন্য রেশমের পর্দা সামান্য সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন শঙ্খপাল। পর্দা সরাতেই চাঁদের এক ফালি আলো এসে পড়ল সম্রাট মূর্তির গায়ে। শঙ্খপাল সেদিকে তাকালেন। তারপরই থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি। আর একটু হলে তিনি পড়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রপাল তাঁকে ধরে ফেললেন।

তিনি বললেন, 'কী হল আপনার? অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

স্তম্ভ ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে প্রধান শিল্পী বললেন, 'সম্রাটের দক্ষিণ হস্তের তর্জনী নেই। তর্জনী ছেদন করা হয়েছে।'

তাঁর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন

BanglaBook.org

চন্দ্রপাল। তিনি দেখলেন, হ্যাঁ, সত্যি দক্ষিণ হস্তে তর্জনী নেই! কেউ যেন ছুরিকা দিয়ে নিপুণ ভাবে ছেদন করেছে অঙ্গুলি। মূর্তি বেদির আশেপাশে কোথাও পড়ে নেই সেই ছিন্ন তর্জনী! সঙ্গে সঙ্গে আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ শিল্পী। স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে তখনও কেঁপে চলেছেন প্রধান শিল্পী। চন্দ্রপাল বললেন, 'হ্যাঁ, কোথাও নেই সম্রাটের তর্জনী। কিন্তু কে করল এই দুঃসাহসী কাজ? আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?'

প্রশ্ন শুনে শঙ্খপাল অতি সংক্ষেপে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলেন জৈন সন্ন্যাসী জিনসেনের ঘটনা। চন্দ্রপাল বিস্মিত হলেন তাঁর কথা শুনে। তিনি বললেন, 'এখন কী করা যায়?'

শঙ্খপাল হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'এখন আর কিছু করার নেই। আপনি তো জানেন প্রথামতো সম্রাট মূর্তির যাবতীয় যন্ত্রপাতি, পাথর খণ্ড যাতে দ্বিতীয়বার অন্য মূর্তি নির্মাণে ব্যবহার করা না হয় সেজন্য মাটির গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর এক টুকরো পাথর নেই কোথাও। যদিও পাথর সংগ্রহ করা যায় তবে তা জুড়বার জন্য বজ্রপ্রলেপ পাব কোথায়? তা ছাড়া ওই যে দেখুন মন্দির চত্বরে মহাসামন্ত দাঁড়িয়ে আছেন। কাজ শুরু করলে তিনি বা তাঁর রক্ষীবাহিনীর লোকেরা শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে দেখে ফেলবে আসল ব্যাপারটা। রাজমূর্তির অঙ্গুলি ছেদ করা হয়েছে, ভাঙা মূর্তি জোড়া দেওয়া হয়েছে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে আসা সম্রাটের কানেও এ খবর পৌঁছোবে। আর তারপর...

বৃদ্ধ চন্দ্রপাল বুঝতে পারলেন প্রধান শিল্পী শঙ্খপাল ঠিক কথাই বলছেন। তর্জনী নির্মাণ করে আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। প্রধান শিল্পী শঙ্খপাল এরপর বললেন, 'সম্রাট এসে তর্জনীহীন মূর্তি দেখে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন তাতে আমার দুঃখ নেই। দুঃখ হল ধর্মের কাছে পরাজিত হল শিল্প। আমি সেই সন্ন্যাসী জিনসেনকে বলেছিলাম ধর্মর চেয়ে শিল্প বড়। শিল্পীর চোখে শিল্পর চেয়ে বড় সত্য নেই। কিন্তু তাঁর কথাই তিনি প্রমাণ করলেন। সত্যকে শিল্পর চেয়ে বড় বলে প্রতিষ্ঠা করলেন। কথাগুলো বলতে বলতে ধরে এল তাঁর কণ্ঠস্বর। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল শঙ্খপালের।

চন্দ্রপাল বললেন, 'আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর হয়তো কয়েকটা দিন বাঁচব।

BanglaBook.org

আপনার চিন্তা নেই। আমি সম্রাটকে বলব যে সবার অলক্ষে সম্রাটের প্রতি আক্রোশে আমি মূর্তির তর্জনী ছেদন করেছি। আমার বৃদ্ধ পিতামহ ছিলেন কলচুরি সম্রাটের ভাস্কর। দণ্ডভোগ আমি করব।'

শঙ্খপাল বললেন, 'না, তা হয় না। আপনি আমার দণ্ড নিজে বহন করলে অনন্ত নরকবাস করতে হবে আমাকে। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

চাঁদের আলোতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলেন দুই ভাস্কর নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। এক সময় চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথার জঙ্গলে চাঁদের দিকে মুখ তুলে ডেকে উঠল শৃগালের দল। তা শুনে শঙ্খপাল হতাশ ভাবে বললেন, 'আর কিছু করার নেই। ভোরের আলো ফুটতে আর মাত্র দু-প্রহর বাকি। চলুন আমরা ফিরে যাই। বিধাতা পুরুষ কাল আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তাই ঘটবে।'

বৃদ্ধ ভাস্কর নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে এই বিপদ মুক্তির উপায় ভাবছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল। তিনি বললেন, 'মূর্তির গলায় পরানো রেশম নির্মিত কাপড়ের ফুলের মালাগুলো হয়তো আমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারবে। কণ্ঠ থেকে জানু পর্যন্ত দীর্ঘ মালাটার কৃত্রিম ফুলগুলো বেশ বড় বড়। মালাটা আমরা সম্রাট মূর্তির হাতের ওপর দিয়ে সাজিয়ে দেই। দেখে মনে হবে কণ্ঠে পরানো মালার এক অংশ যেন দক্ষিণ হস্তে ধরে আছেন সম্রাট। আসলে ওই বড় বড় ফুলগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে সম্রাটের ছিন্ন তর্জনী। কেউ নিশ্চয়ই মালা সরিয়ে দেখতে যাবে না সম্রাটের তর্জনী আছে কি নেই। এ ভাবনা কারো মাথাতেই আসবে না। সম্রাট ফিরে যাবার পর আমরা জুড়ে দেব তাঁর তর্জনী।'

বৃদ্ধ বুদ্ধিমান শিল্পীর কথা শুনে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন শঙ্খপাল। বুদ্ধিটা মন্দ নয়। এই মুহূর্তে বিপদ মুক্তির আর অন্য কোনও উপায়ও খোলা নেই তাঁর সামনে। ভাস্করের কথায় সম্মতি প্রকাশ করলেন শঙ্খপাল। এরপর তারা দুজন ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকে মালাটা পরিকল্পনা মতো সাজালেন। তর্জনী সমেত সম্রাটের দক্ষিণ হস্তের বেশ কয়েকটা অঙ্গুলি অদৃশ্য হয়ে গেল রেশমের আড়ালে। একটু স্বস্তি পেলেন তাঁরা দুজন। কাজ শেষ করে তারা দুজন চত্বরের বাইরে বেরিয়ে এলেন

BanglaBook.org

ঘরে ফেরার জন্য। তোরণের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রক্ষীপ্রধান মারীচ। তাঁকে দেখে শঙ্খপাল প্রশ্ন করলেন, 'কালকের সেই জৈন সন্ন্যাসী কি আজ আবার পদার্পণ করেছিলেন মন্দির চত্বরে? বাইরের অন্য কেউ ভিতরে প্রবেশ করেছিল?'

মারীচ জবাব দিলেন, 'না, তিনি আসেননি। মন্দির চত্বরে অন্য কেউ প্রবেশ করেনি। শুধু একজন রক্ষী আমাকে জানিয়েছিল সম্রাট মূর্তির কাছে সে আপনার আশ্রিত অশনিকে দেখেছে সায়াহ্নের সময়। সম্ভবত সে আপনাকে খুঁজতে এসেছিল। যেমন সে ইতিপূর্বেও এসেছে।'

রক্ষীপ্রধানের মুখে একথা শুনে হঠাৎই যেন প্রশ্নচিহ্ন দানা বাঁধতে শুরু করল শঙ্খপালের মনে। অশনির জৈন মূর্তি নির্মাণ, অন্ধকার নামার পরও ঘরে ফিরে না আসা। সায়াহ্নে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করা, এসব কীসের ইঙ্গিত? এক অশুভ ভাবনায় কেঁপে উঠল শঙ্খপালের বুক। একথা ভাবার পরই তাঁর মনে হল, না, না, এ হতে পারে না। অশনি তাঁর আশ্রিত, তার প্রাণ রক্ষা করেছেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা বালক হলেও তার মধ্যে শিল্পী মন আছে। কত সুন্দর মূর্তি গড়ে সে। কোনও কারণেই কোনও মূর্তির ক্ষতি করতে পারে না সে।

তবু আর সময় নষ্ট না করে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঘোড়ায় চেপে বসলেন শঙ্খপাল। ভাস্কর চন্দ্রপালের থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অশ্বখুরের শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দ্রুত ছুটলেন তাঁর আস্তানার দিকে।

চরণন্দ্রী পাহাড়ের পাদদেশে এলাপুর গ্রামের অন্য কুটীরগুলো থেকে বেশ কিছুটা তফাতে চাঁদের আলোতে একলা দাঁড়িয়ে আছে কালো পাথরের তৈরি শঙ্খপালের আবাসস্থল। তার নিষ্প্রদীপ কক্ষগুলো যেন কোনও অজানা আশঙ্কায় থমথম করছে। উঠানে ঘোড়া থেকে নেমে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তিনি। অন্ধকার কক্ষ। অশনি কি ঘরে ফিরেছে? সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ব্যাপারটা দেখার জন্য শঙ্খপাল প্রবেশ করলেন তার কক্ষে। না, অশনি ঘুমায়নি। গবাক্ষর সামনে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে আছে দূরে চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা কৈলাস মন্দিরের দিকে। শঙ্খপালের পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল অশনি। অন্ধকারে তার দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে। শঙ্খপাল তাকে প্রশ্ন করলেন, 'সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে? সায়াহ্নে তুমি

BanglaBook.org

মন্দির চত্বরে গিয়েছিলে?'

একটু চুপ করে থেকে অশনি জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

উত্তর শুনে শঙ্খপাল একটু ভয়ে ভয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'যে ঘেরা জায়গার ভেতর সম্রাট মূর্তি আছে সেখানে কি তুমি প্রবেশ করেছিলে?'

অশনি চুপ করে রইল।

শঙ্খপাল মনে মনে কামনা করছেন অশনি যেন বলে, 'না, আমি ওই ঘেরা জায়গাতে প্রবেশ করিনি।' কিন্তু মৌনতা ভঙ্গ করে অশনি বলল, 'হ্যাঁ, প্রবেশ করেছিলাম।'

শঙ্খপালের বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পেটা শুরু হল। নিস্তব্ধ বেশ কিছু মুহূর্ত। তারপর শঙ্খপাল তাকে জিগ্যেস করে বললেন, 'তুমি কী সম্রাট মূর্তির তর্জনী ছেদন করেছ?'

অশনি জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল শঙ্খপালের গলা থেকে। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কেন? কেন? কেন তুমি একাজ করলে অশনি? তুমি কি জৈন সন্ন্যাসীর নির্দেশে একাজ করলে? কি প্রলোভন তিনি দেখালেন তোমাকে?'

অশনি চুপ করে রইল।

তার উত্তর না পেয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন শঙ্খপাল। তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালাম, এক বৎসর যাবৎ সন্তানস্নেহে প্রতিপালন—এই তার প্রতিদান? কেন তুমি আমার জীবনের সব সাধনাকে এক মুহূর্তে এভাবে নষ্ট করে দিলে? কেন কেন? শঙ্খপালের আর্তনাদ ঘুরপাক খেতে লাগল অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

অশনির চোখ বেয়ে জল ঝরছে। শঙ্খপালের কথাগুলো আর সহ্য করতে পারছে না সে।

শঙ্খপাল ক্ষোভ-অভিমান ঘৃণায় বলে উঠলেন, 'তুমি নাকি ভাস্কর! কোনও ভাস্কর কোনওদিন কোনও শিল্প ধ্বংস করে না। তুমি ভাস্কর তো নয়ই, কসাই বা জহ্লাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমার মায়ের শেষ ইচ্ছা ছিল নাকি তুমি এলাপুর ভাস্কর হও। যে পাপ তুমি করলে, তাতে তুমি কোনওদিন আর মাটির মূর্তিও গড়তে পারবে না। আর মাকেও তুমি খুঁজে পাবে না। তোমার কোনও স্বপ্নই কোনওদিন সফল হবে না, হবে না...

BanglaBook.org

শঙ্খপালের এই তিরস্কার সত্যিই আর সহ্য করতে পারল না অশনি। অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল কণ্ঠ থেকে। থর থর করে কাঁপছে শঙ্খপাল। তার পাশ কাটিয়ে এক ছুটে সেই অন্ধকার কক্ষ ত্যাগ করে গৃহের বাইরে বেরিয়ে এল অশনি। তারপর চন্দ্রালোকে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল চরণন্দ্রী পাহাড়ের দিকে। তার কানে তখনও বেজে চলেছে শঙ্খপালের আর্তনাদ।

১০

সূর্যালোকে ঝলমল করছে কৈলাস মন্দির। মাথায় উড্ডীন বিজয় কেতন। ফুলমালা শোভিত চত্বরে পতপত করে উড়ছে রঙিন নিশান। মহাসম্রাট অমোঘবর্ষর গঙ্গা-যমুনা পতাকা। বাতাসে ফুলের সৌরভ। প্রবেশ তোরণের দু-পাশে সার বেঁধে বসে বাদ্যকররা। এলাপুর গ্রাম তো বটেই, আশেপাশের সমস্ত মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছে প্রবেশ তোরণের বাইরে। তারা রাট্টা সম্রাট অমোঘবর্ষকে দর্শন করবে, কৈলাস মন্দির দর্শন করে নিজেদের মানব জন্মকে সার্থক করবে।

মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিল্পীরা আর সম্রাটের রক্ষীবাহিনী। শিল্পীদের পরনে নতুন পোশাক, উত্তরীয়। সবার মনেই আজ আনন্দ। সমবয়স্ক শিল্পীরা পরস্পরকে আবেগে আলিঙ্গন করছেন, নবীনরা মাথা নত করে প্রবীণদের প্রণাম জানাচ্ছে।

চত্বরের একপাশে সবার থেকে কিছুটা তফাতে একলা দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। সারা রাত আর ঘুমোতে পারেননি তিনি। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মন্দিরে চলে এসেছেন। তাঁর আর ঘরে ফেরা হবে কিনা তিনি তা নিজেও জানেন না।

চন্দ্রপাল ইতিমধ্যে একবার চুপিসারে এসে তাঁকে আশ্বস্ত করে গেছেন এই বলে যে, 'আমি ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি। কেউ ধরতে পারবে না ব্যাপারটা।' তবুও উত্তেজনা কমছে না শঙ্খপালের। অশনির প্রতি অভিমান, সেই জৈন সন্ন্যাসীর প্রতি ঘৃণা, পরাজয়ের গ্লানি তাঁর বুকের ভেতর যেন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসছে। তবু মুখে হাসি নিয়ে

BanglaBook.org

সম্রাটের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

দ্বিপ্রহর এক সময় গড়িয়ে গেল। প্রবেশ তোরণের বাইরে লোক সমাগম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অবশেষে বিকাল নাগাদ পুবের দিক্‌চক্রবাল থেকে ভেসে এল তুরী-ভেরী-দুন্দুভীর শব্দ। সেই শব্দ শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল সবাই। উল্লাসধ্বনি করে উঠল তোরণের বাইরে অপেক্ষারত জনতা। সম্রাট আসছেন। ওই তার সংকেত ধ্বনি! মন্দির চত্বরে যেসব রক্ষীবাহিনী ছিল তারা তাদের কর্তব্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিল্পীরা যে যেখানে ছিল তাঁরা এসে সমবেত হলেন চত্বরের ঠিক মাঝখানে। তারপর তাদের নিয়ে শঙ্খপাল এসে দাঁড়ালেন প্রবেশতোরণের সামনে সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রথমে পতাকাবাহী পদাতিকরা, তারপর বাদ্যকরের দল, তারপর ক্রমে ক্রমে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বরোহী সৈন্যবাহিনী। সূর্যালোকে ঝলমল করছে তাদের হাতে ধরা বর্শা, খড়গ, বল্ল। তারপর তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পরিবৃত সম্রাটের রাজহস্তি। তার পিঠে সোনার হাওদায় বসে আছেন স্বর্ণ অলংকার শোভিত মহাপরাক্রশালী রাট্টা সম্রাট। বীরনারায়ণ অঘোমবর্ষ। দূর থেকে ঝলমল করছে তাঁর হীরক খোচিত উষ্ণীষ।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে এসে বসে পড়ল রাজহস্তি। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, পট্টবস্ত্র পরিহিত সম্রাট অমোঘবর্ষ নেমে দাঁড়ালেন মন্দির প্রাঙ্গণে। শঙ্খপালের দৃষ্টি পড়ল সম্রাটের দক্ষিণ হস্তর দিকে। পট্টবস্ত্রের আড়ালে সে হাত বুকের কাছে ধরে রেখেছেন সম্রাট। তাঁর তর্জনী দেখা যাচ্ছে না। একজন ভৃত্য এগিয়ে এসে সম্রাটের মাথায় রাজছত্র ধরল।

সম্রাট একবার চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে তাঁর প্রধান চার অনুচর ও ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনী পরিবৃত হয়ে নন্দী মণ্ডপ পেরিয়ে এগিয়ে চললেন মন্দিরের দিকে। তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল, ভাস্কর চন্দ্রপাল সহ আর কয়েকজন প্রবীণ ভাস্কর। মন্ত্রোচ্চারণ করলেন পুরোহিত। একজন সুন্দরী দাসী দাঁড়িয়েছিল সোনার পাত্রে পদ্মপাপড়ি নিয়ে। সম্রাট পাত্র থেকে ফুল তুলে নিয়ে নিবেদন করলেন দেবতার পায়ে।

কয়েক মুহূর্তর জন্য দৃশ্যমান হল সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। তারপর সেটা আবার চলে গেল পট্টবস্ত্রের আড়ালে। অঞ্জলি নিবেদনের কাজটা তিনি

BanglaBook.org

এত দ্রুত সমাধা করলেন যে শঙ্খপালের মনে হল ওই তর্জনীহীন হাতের পাতাটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চান সম্রাট।

শিল্পীদের আশা ছিল সম্রাট হয়তো এরপর ঘুরে দেখবেন মন্দিরের ভাস্কর্য। তারিফ করবেন শিল্পীদের কাজের। কিন্তু মহাসন্ধিবিগ্রহী শঙ্খপালকে বললেন, 'সম্রাট এবার তাঁর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে যাবেন।

কথাটা শুনেই যেন ছলকে উঠল শঙ্খপালের বুকের রক্ত। মুহূর্তর জন্য তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হল চন্দ্রপালের সঙ্গে। মহাসন্ধিবিগ্রহীর কথায় সম্মতি জানিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে নীচের চত্বরে নেমে সম্রাটকে নিয়ে প্রধান ভাস্কর এগিয়ে চললেন সম্রাট মূর্তির কাছে। সম্রাটের যাত্রাপথের দু-পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শিল্পীসহ কিছু বিশিষ্টরা।

হঠাৎ চলতে চলতে সেই ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন সম্রাট। মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে সম্রাট আবার এগিয়ে চললেন সামনে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যাকে অভিবাদন জানালেন স্বয়ং রাট্টাধীপ অমোঘবর্ষ। ঘাড় ফিরিয়ে মুহূর্তর জন্য শঙ্খপাল দেখতে পেলেন তাঁকে। তিনি সেই জৈন সন্ন্যাসী জিনসেন। শঙ্খপাল চমকে উঠলেন।

নিজ মূর্তির আবরণ উন্মোচনের জন্য সম্রাট সেই রেশমের পর্দা ঘেরা জায়গার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে ঘিরে তাঁর প্রধান অনুচর, শিল্পী আর রক্ষীদের একটা বলয় রচিত হল। শঙ্খপাল খেয়াল করলেন জিনসেনও এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তাঁর চোখের তারায় যেন হাসির ঝিলিক। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলেন শঙ্খপাল।

শাঁখ বাজতে শুরু করল, রেশমের ফিতার ফাঁস টেনে পর্দা সরিয়ে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন রাট্টা সম্রাট বীরনারায়ণ অমোঘবর্ষ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাদ্যধ্বনি যেন থেমে গেল। সম্রাট তাকালেন নিজমূর্তির দিকে। শঙ্খপাল ভয়ে তাকাতে পারছেন না মূর্তির দিকে। কয়েক মুহূর্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকার পর সম্রাট বললেন, 'মালাটা সরিয়ে দাও। আমি ভালো করে দেখতে চাই মূর্তিটা।'

একথা শুনে এবার যেন সত্যিই স্তব্ধ হয়ে গেল প্রধান ভাস্কর শঙ্খপালের হৃৎপিণ্ড। সম্রাটের নির্দেশে কে যেন মূর্তির গলা থেকে সরিয়ে নিল মালাটা। সম্রাট চেয়ে রইলেন মূর্তিটার দিকে।

BanglaBook.org

মাটির দিকে চেয়ে আছেন শঙ্খপাল। সম্রাট চেয়ে আছেন মূর্তির দিকে। নিস্তব্ধ চারপাশ। এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা প্রহর মনে হচ্ছে শঙ্খপালের কাছে। মূর্তিটা নিরীক্ষণ করার পর সম্রাটের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে এই মূর্তি নির্মাণ করেছে?'

তাঁর প্রশ্ন শুনে শঙ্খপালের মনে মুহূর্তর জন্য ভেসে উঠল সেই ভয়ংকর স্বপ্ন!

সম্রাটের প্রশ্নের জবাবে মহাসন্ধিবিগ্রহী বললেন, 'এ মূর্তি নির্মাণ করেছেন কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল।'

শঙ্খপাল থরথর করে কাঁপছেন। মৃত্যুভয় নয়, পরাজয় আর হতাশার গ্লানিতে। কয়েক মুহূর্তর নিস্তব্ধতা। তারপর সম্রাট অমোঘবর্ষ বললেন, 'অসাধারণ সুন্দর শিল্পকীর্তি! শিল্পীকে আমি 'মহা ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করলাম। তার ওপর আমি হস্তিদ্বীপের মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করলাম।'

কথাটা শুনে চমকে উঠে শঙ্খপাল মুহূর্তর জন্য একবার তাকালেন মূর্তিটার দিকে। তিনি দেখলেন দক্ষিণ হস্তে তাঁর তর্জনী বিরাজমান।

কথা শেষ করে সম্রাট আর দাঁড়ালেন না। তিনি ফিরে চললেন প্রাঙ্গণের মাঝখানে অপেক্ষমান তাঁর পাট হস্তির কাছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মতো তাঁকে অনুসরণ করলেন শঙ্খপাল।

শঙ্খপালের যখন ঘোর কাটল তখন মন্দির চত্বর প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সম্রাট অমোঘবর্ষ অনেকক্ষণ আগে বিদায় নিয়েছেন। অন্য সবাইও কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে বলে ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছে। একটা কথাই শুধু বুঝতে পারছেন না শঙ্খপাল। এ অসাধ্য সাধন কীভাবে সম্ভব হল? তবে কাজটা নিশ্চয়ই অশনিরই। কী করে সে সম্ভব করল কাজটা? রক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার বিপদের ঝুঁকির কথা না-হয় ছেড়েই দেওয়া যাক। ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে সে কীভাবে সংগ্রহ করল পাথর, যন্ত্রপাতি, বজ্রলেপন? অসাধ্য সাধন করেছে সে। অশনি নিশ্চয়ই সেই জৈন সন্ন্যাসী জিনসেনের কোনও প্রলোভনে প্ররোচিত হয়ে কাজটা করেছিল। বয়সে সে তো নিতান্তই বালক। তারপর সে বুঝতে পেরেছিল নিজের ভুল।

চত্বরে একলা দাঁড়িয়ে অশনির কথা ভাবতে ভাবতে তার প্রতি আর্দ্র

BanglaBook.org

হয়ে উঠল শঙ্খপালের বুক। গত রাতে কত কটু কথা তিনি তাকে বলেছেন! কত অপমান করেছেন! কিন্তু অশনি এখন কোথায়? সে কি অনেক দূর চলে গেছে এলাপুর ছেড়ে? কী ভাবে তার খোঁজ পাওয়া যায়? সেই জৈন সন্ন্যাসী কি তার কোনও সন্ধান দিতে পারেন? এসব কথা ভাবতে ভাবতেই শঙ্খপাল হঠাৎ দেখতে পেলেন চত্বর পেরিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন জৈন সন্ন্যাসী জিনসেন।

জিনসেন এসে দাঁড়ালেন শঙ্খপালের সামনে। জিনসেনের চোখের দৃষ্টি ম্লান। বিজয়ীর পরাজিতকে ক্ষমা করে দেওয়া শোভন। তাই তাকে কটু বাক্য বলা থেকে শঙ্খপাল বিরত থাকলেন। তিনি সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'তাহলে শিল্পই শেষ সত্য, আমার ভাবনারই জয় হল শেষ পর্যন্ত, আপনার ভাবনা পরাজিত।'

সন্ন্যাসী ম্রিয়মান ভাবে জবাব দিলেন, 'আপনি জয়ী কিনা আমি জানি না। তবে আমি যে পরাজিত তা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।'

শঙ্খপাল আর এ প্রসঙ্গে কোনও কথা বাড়ালেন না। যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে। এখন তাঁর মাথায় অশনিকে কী ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই তিনি সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি অশনির কোনও খোঁজ জানেন?'

জিনসেন মাথা নীচু করে জবাব দিলেন, 'সম্ভবত জানি।'

কোথায় সে? উৎফুল্লভাবে জানতে চাইলেন শঙ্খপাল।

সন্ন্যাসী বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

শঙ্খপাল অনুসরণ করলেন তাঁকে। মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকলেন জিনসেন।

মন্দিরটাকে বেড় দিয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন মন্দিরের পিছনের অংশে। জায়গাটা বেশ একটু নির্জন। এ অংশটা মন্দিরের অন্য অংশের থেকে অবহেলিতও বটে। সচরাচর এদিকে কেউ আসে না। তবে মন্দিরের অন্য অংশের মতো এদিকেও অসংখ্য প্রস্তর খোদিত মূর্তি আছে। সেখানে পৌঁছে কিছুটা তফাতে আঙুল তুলে দেখিয়ে জিনসেন বললেন, 'ওই যে অশনি।'

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামবে। চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথা থেকে দিনের শেষ আলো এসে পড়েছে মন্দিরের পিছনের সে-অংশে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

থাকা এক নটীর মূর্তির ওপর। সেই আলোতে কেমন যেন বিষণ্ণ লাগছে আনত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই নটী মূর্তিকে। আর তার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে অশনি।

একটু বিস্মিতভাবে শঙ্খপাল বললেন, 'অশনি এখানে কী করছে?'

জিনসেন জবাব দিল, 'ওই নটী মূর্তি অশনির হারিয়ে যাওয়া মা। আমি অশনিকে তাঁর সন্ধান দিয়েছি।'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু আর্তনাদ করে উঠে শঙ্খপাল বলে উঠলেন তাহলে তো আর অশনির মা কোনওদিন ফিরবে না!'

সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'তা আমি জানি। মন্দির গাত্রে নটী মূর্তি নির্মাণের সময় আপনারা সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন কিছু জীবন্ত নটীকে পাঠানো হয় মন্দিরে। যাতে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন। যাতে মূর্তি আরও জীবন্ত মনে হয়...

জিনসেনের কথার মাঝেই বিহ্বল শঙ্খপাল বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আসলে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে করতে নটী মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে তাদের অঙ্গেও দেবতার আদল চলে আসছিল। আমরা চাইছিলাম দেবী নয়, মূর্তিগুলোকে রক্ত-মাংসের নটীর মতোই গড়ে তুলতে। তাই আমরা মহাসন্ধিবিগ্রহীর মাধ্যমে সম্রাটের কাছে আমাদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না এদের মধ্যে কেউ অশনির মা হতে পারেন!'

সন্ন্যাসী এরপর বললেন, 'সম্রাট আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। একদল সুন্দরী নটীকে পাঠানো হল এখানে। তাদের দেখে কাজও শেষ করলেন আপনারা। কিন্তু তাদের আর ঘরে ফেরা হল না। সম্রাটের ভাবনা হল, এ কথা যখন লোকমুখে প্রচারিত হবে তখন এ নটীদের নিয়ে অন্য কেউ মূর্তি নির্মাণ করতে পারে। তবে তো কৈলাস মন্দিরের ভাস্কর্যের কৌলিন্য থাকবে না। তাদের প্রতিরূপ তৈরি হবে! তাই সম্রাটের একদল নটীকে হত্যা করা হল, আর একদল নটীকে পাঠানো হল সুদূর যবদ্বীপে নির্বাসনে। হয়তো তারাও আজ আর কেউ বেঁচে নেই। সম্রাট অঘোমবর্ষ আমাকে নিজেই জানিয়েছেন এ কথাগুলো।'

শঙ্খপাল দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এ কথাগুলো অশনিকে জানিয়েছেন?'

BanglaBook.org

জিনসেন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। আমি সত্য পথের পথিক। কাল সায়াহ্নে সম্রাট মূর্তির তর্জনী নিয়ে সে যখন ফিরে এল তখনই আমি তাকে জানিয়েছি সব কথা। তর্জনী ছেদন করে আনলে আমি তার মা-র সন্ধান দেব এ ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম।'

দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। জিনসেনের কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর তাঁকে নিয়ে সামনে এগোলেন শঙ্খপাল। অশনির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা।

নটী মূর্তির পায়ের কাছে হাঁটুমুড়ে বসে মাথা তুলে মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অশনি। জল ঝরছে তার চোখ দিয়ে। কিছুক্ষণ সে দৃশ্যর দিকে তাকিয়ে থাকার পর জিনসেন তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'অশনি ওঠো। সম্রাট নয়, সত্য মার্গে দীক্ষিত হওয়ার উপযুক্ত তুমি। আমি তোমাকে সে পথে দীক্ষিত করব।'

শঙ্খপাল বললেন, 'তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পারো। তোমাকে আমি এ পৃথিবীর সেরা শিল্পীরূপে গড়ে তুলব। যদি নিজের অজান্তে এই কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর হিসেবে কোনও ক্ষমাহীন অন্যায়ের কারণ হয়ে থাকি তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করব। ভাস্কর হিসেবে আমার যা শিক্ষা যা সম্পদ আজ থেকে তোমার হবে। এলাপুর ভাস্করের থেকেও অনেক বড় ভাস্কর হবে তুমি।'

শিল্পী ও সন্ন্যাসীর কথায় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অশনি। দুজনেই তার মুখের দিকে তাকালেন। দুজনেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য আলিঙ্গনের হাত বাড়ালেন তার দিকে।

অশনি প্রথমে সন্ন্যাসী জিনসেনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে না আমার। আমার সত্য যে অন্যখানে আছে!'

কথাটা শুনে এই অবস্থাতেও হাসি ফুটে উঠল শিল্পী শঙ্খপালের ঠোঁটে। তবে এবারও শিল্পের জয় হল! অশনি এবার তবে তাঁর সঙ্গেই ঘরে ফিরে যাবে।

সন্ন্যাসীকে কথাগুলো বলার পর অশনি ফিরে তাকাল শঙ্খপালের দিকে। তাঁকে কোলে টেনে নেওয়ার জন্য শঙ্খপাল দু-বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন।

শঙ্খপালের দিকে তাকিয়ে এরপর অশনি বলল, 'আর আপনার সঙ্গে

BanglaBook.org

ও যাওয়া হবে না। আমার যে আর ভাস্কর হওয়াই হবে না।'

তার কথা শুনে শঙ্খপাল বলে উঠলেন, 'কেন হবে না? আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে গড়ে তুলব।'

শিল্পীর কথা শুনে অশনি কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল তাঁর দিকে। একটা আবছা হাসি যেন ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। ধীরে ধীরে সে তার ডান হাতটা মুঠি খুলে মেলে ধরল শঙ্খপালের সামনে। শঙ্খপাল স্তব্ধ হয়ে দেখলেন সে হাতে কোনও তর্জনী নেই! লাল দগদগে ক্ষতর ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা হাড়। যন্ত্র আর পাথর না পেয়ে জিনসেনের দেখানো গাছের বজ্রপ্রলেপ দিয়ে নিজের তর্জনী ছিন্ন করে সম্রাট মূর্তিতে জুড়ে দিয়েছে অশনি। ঝুপ করে যেন অন্ধকার নেমে এল চারপাশে। আর সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল অশনি।

চরণন্দ্রী পাহাড়ের মাথায় সোনার থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। ঘণ্টা বাজছে। কৈলাস মন্দিরে প্রথম সান্ধ্যারতির ঘণ্টা। মন্দির চত্বরে এক প্রস্তরফলকে সমস্ত এলাপুর ভাস্করদের নাম খোদাই করা আছে। মশালের আলোতে সেই ফলক থেকে নিজের নাম ছেনি দিয়ে মুছে ফেলে সেখানে অন্য এক নাম খোদাই করছিলেন কৈলাস মন্দিরের প্রধান ভাস্কর শঙ্খপাল। চরণন্দ্রী পাহাড়ের নির্জনে তখন সত্যর সন্ধানে ধ্যানে বসেছেন জৈন সন্ন্যাসী জিনসেন। শিল্পীর সত্য আর সন্ন্যাসীর সত্যর মাঝে হয়তো কোনও তৃতীয় সত্য আছে। যবদ্বীপ কোথায়, কতদূরে তা জানা নেই অশনির। তবে সেখানে তাকে পৌঁছোতে হবে। চন্দ্রালোকিত পথ ধরে অশনি তখন এগিয়ে চলেছে সেই তৃতীয় কোন সত্যের খোঁজে।

BanglaBook.org

চন্দ্রভাগার চাঁদ

চন্দ্রভাগার আকাশে তখনও শেষ প্রহরের চাঁদ জেগে আছে। তবে তার আলো কিছুটা বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ। সেই আলোতে নদীতটে দাঁড়িয়ে আছে নির্মিয়মাণ কালোপাথরের তৈরি সুউচ্চ বিশাল এক মন্দির। আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিয়েছে নদী। সেদিক থেকে ভেসে আসছে ভেজা বাতাস আর অস্পষ্ট মন্দ্র ধ্বনি। সমুদ্রের গর্জন। সেখানে চন্দ্রভাগা সমর্পণ করেছে নিজেকে।

মন্দিরের ছায়াবৃত নীচের পাথুরে চত্বর। নোনা বাতাসে বয়ে আনা অস্পষ্ট সমুদ্র গর্জন ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। অথচ সারাদিন এই চত্বর মুখরিত থাকে পাথরের গায়ে ছেনি-হাতুড়ির শব্দে, মজুর-শিল্পীদের কোলাহলে। সমুদ্র গর্জনের মতোই অনেক দূর থেকে শোনা যায় সেই শব্দ। বারো বছর ধরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন। যারা সেই শব্দ তুলে গড়ে তুলছে এই মন্দির, তারা এখন পরিশ্রান্ত দেহে নিদ্রামগ্ন চত্বরের বাইরে শনের কুটীরগুলোতে। কেউ কোথাও নেই। ঘুমন্ত মন্দির চত্বর। চন্দ্রালোকে শুধু জেগে আছে সুউচ্চ মন্দিরগাত্রে ঝুলন্ত অলিন্দ-কুলুঙ্গিতে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ-যক্ষ মূর্তিগুলো। পাথরের নয়, দক্ষ শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ওদের জীবন্ত বলেই ভ্রম হয়। সমুদ্রের নোনা বাতাস গায়ে মেখে ক্লান্তিহীন যৌবনের প্রতীক হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্দিরের তাকে, খিলানে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। এদিনের মতোই ভবিষ্যতের মানুষরাও বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে ওদের।

সেদিন কেউ হয়তো ক্ষনিকের জন্য হলেও স্মরণ করবে আজকের এই অনামি কারিগরদের কথা। সিন্ধু ছেঁচে মুক্ত আনার মতো যারা নিজেদের জীবন ছেঁচে প্রাণ সঞ্চার করেছে কঠিন পাথরে। তিলতিল করে গড়ে তুলেছে এই সব জীবন্ত মূর্তি, কালো পাথরের বিশাল এই অর্ক মন্দির।

মন্দিরের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন। শুধু মন্দিরের শীর্ষদেশে চতুষ্কোণ এক পাথর ও তার ওপর বিরাট মঙ্গল কলস বসানো বাকি। যার মাথায় উড়বে কীর্তিধ্বজ। বিঘোষিত হবে কলিঙ্গপতি নরসিংহদেবের কীর্তি। জয় নরসিংহদেব।

BanglaBook.org

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে প্রশস্ত সোপানশ্রেণি উঠে গেছে ওপর দিকে। নীচে কিছুটা তফাতে উন্মুক্ত পাথুরে চাতালে দাঁড়িয়ে আছে অরুণ মূর্তি খোদিত সূর্যস্তম্ভ আর নাট মন্দির। চাতালের এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে আছে নানা আকারের প্রস্তরখণ্ড, অসম্পূর্ণ নানা মূর্তি বা তাদের অংশবিশেষ। তবে তা সবই ছায়াবৃত।

নাট মন্দিরের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্ক মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আছে একজন। সে দাঁড়িয়ে আছে মন্দির গাত্রের নিশ্চল পাথরের মূর্তিগুলোর মতোই। যদিও জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এই শেষ রাতে মন্দির চত্বরেও কেউ নেই, তবুও সে উড়নি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। সাবধানের মার নেই। দৈবাৎ কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে তবে যাতে তাকে চিনতে না পারে তার জন্য এই সতর্কতা। এই মন্দির চত্বরে তার প্রবেশাধীকার কেড়ে নিয়েছেন কলিঙ্গরাজ। এখানে তার উপস্থিতি কানে গেলে শিরশ্ছেদের আদেশ দেবেন নরসিংহদেব।

তবু নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি এ লোকটা। সে সম্ভবনা মাথায় নিয়েও চন্দ্রভাগা পেরিয়ে চলে এসেছে এখানে। শয়নে-স্বপনে, ঘুমে-জাগরণে এই মন্দির তাকে ডাকে। হাতছানি দেয় চন্দ্রভাগার তট। এখানেই যে এক যুগ কাটিয়েছে লোকটা। এই সেদিন পর্যন্ত সেই ছিল মন্দিরের প্রধান স্থপতি। বলতে গেলে চন্দ্রভাগার মোহনায় সেই তো গড়ে তুলেছে বিশাল এই মন্দির। এ মন্দিরের প্রতিটা চত্বর, সোপানশ্রেণি, খিলান, স্তম্ভ, গর্ভগৃহ, এমনকী অনেক ওপরে মন্দির গাত্রে ঝুলন্ত তাকে চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটা মূর্তির ভঙ্গিমা, মায় হস্তমুদ্রাও চোখ বন্ধ করে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে লোকটা। যে বারোশো শিল্পী-কারিগর এখন নিদ্রামগ্ন শনের কুটীরে, তাদের প্রত্যেককে সে নামে চেনে। জানে তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কাহিনি। লোকটার সমস্ত সত্ত্বার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই মন্দির।

কয়েক পক্ষকাল আগেও সে যখন স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত এই মন্দির চত্বরে, সোপানশ্রেণি বেয়ে উঠে যেতে পারত চন্দ্রালোকিত মন্দিরের অলিন্দে, অসমাপ্ত শীর্ষদেশে, তখন এক এক সময় তার নিজেকে মনে হত সে যেন মন্দিরগাত্রের ওই প্রস্তরমূর্তিগুলোর মতোই এই মন্দিরেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার আলাদা কোনও সত্তা নেই। আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তিগুলোর মতোই যুগ-যুগ ধরে এই মন্দিরকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। কিন্তু

BanglaBook.org

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। তার এই স্বপ্ন মন্দিরে সামান্য সময়ের জন্য প্রবেশাধিকার নেই আজ।

নাট মন্দিরের আড়াল থেকে ক্ষয়াটে চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরের দিকে চেয়ে লোকটা ভাবছিল, ইতিহাস তো শুধু রাজাদের নাম মনে রাখে। এই মন্দিরের স্থপতি হিসাবে কেউ কী মনে রাখবে তাকে? মনে রাখবে দূরবর্তী শনের কুটীরে নিদ্রিত ওই মানুষগুলোকে? যারা দীর্ঘ বারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের ঘাম-রক্তের বিনিময় গড়ে তুলল এই সূর্যমন্দির, এই অতুলনীয় কীর্তি? সবাই জয়ধ্বনি দেবে রাজা নরসিংহদেবের, কিন্তু কেউ কি জানবে মন্দিরের প্রতিটা সোপানশ্রেণি, প্রতিটা মূর্তিতে মিশে আছে বারোশো শিল্পী-মজুর-কারিগরদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কত ইতিহাস? কত গোপন ব্যথা? চাওয়া না পাওয়ার করুণ কাহিনি? কিন্তু এ মন্দিরের প্রতি ঘটনা, গল্পের সাক্ষী সে।

ওই যে মন্দিরের সর্বোচ্চ তাকে বিষণ্ণ চাঁদের আলোতে অঙ্গুলি দেওয়ার ভঙ্গিতে একাকী দাঁড়িয়ে বিনম্র এক নারী মূর্তি, ওর নাম সুভগা। এ নামটা অবশ্য দিয়েছিল সুসেনই। সুসেন ছিল এক তরুণ ভাস্কর। নবপরিণীতা বালিকা বধূকে ঘরে রেখে মগধ থেকে সে এখানে এসেছিল অর্থ উপার্জনের জন্য। ভেবেছিল কিছু দিন কাজ করে সে আবার ফিরে যাবে সুভগার কাছে। কিন্তু সে জানত না, নরসিংহদেবের আদেশ,—কাজ শেষ হওয়ার আগে কেউ ফিরতে পারবে না ঘরে। যতদিন মন্দির সম্পূর্ণ না হয় ততদিন এখানেই আটকে থাকতে হবে সকলকে। পালাতে গেলে শূলে চড়ানো হবে। চড়ানোও হয়েছিল কয়েকজনকে। কার্যত বন্দি জীবন কাটাতে কাটাতে সুসেন নিজের বালিকা বধূর আদলে গড়ে তুলেছিল ওই অপরূপ নারী মূর্তি।

দীর্ঘ সময় পরিবার অদর্শনে সামান্য মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছিল তার। সুভগার মূর্তিটাকে সত্যি মানুষ ভেবে সে কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে চাইত না। একদিন মজুরের দল জোর করে তার কাছ থেকে মূর্তিটা কেড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে এল মন্দির গাত্রের অনেক ওপরে ওই ঝুলন্ত তাকে। এরপর থেকেই সবার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল সুসেন। চুপচাপ শুধু মন্দির গাত্রে খোদাই করত রথের চাকা। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই ঘটল সেই ঘটনা।

সে দিন সোনার থালার মতো চাঁদ উঠেছে চন্দ্রভাগার আকাশে। তার

BanglaBook.org

আলোতে প্লাবিত নদীতট, উন্মুক্ত মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দির গাত্রে মূর্তিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই আলোকে। শনের কুটীরগুলো ঘুমন্ত। কেউ কোথাও নেই। সুসেন এসে হাজির হল মন্দির চত্বরে। তারপর মন্দিরের গা বেয়ে অনেক ওপরে উঠে গিয়ে দাঁড়াল একটা ঝুলন্ত তাকে। তার ঠিক উলটোদিকের তাকেই দাঁড়িয়ে আছে সুভগা। দুটো ঝুলন্ত তাকের মাঝে শুধু হাত কুড়ির ব্যবধান। জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে সুভগার গা বেয়ে। পাথর নয়, সে এক জীবন্ত মূর্তি। সে ডাকছে সুসেনকে। সুসেন পা বাড়াল তার কাছে যাওয়ার জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে উড়ে আসা মেঘ মুহূর্তের জন্য ঢেকে দিল চাঁদটাকে। নিকষ কালো অন্ধকারে মুছে গেল চরাচর। পরদিন ভোরে মজুররা কাজ করতে এসে আবিষ্কার করল চত্বরে পড়ে থাকা সুসেনের দেহটা। সূর্যালোক তখন স্পর্শ করেছে সুভগাকে। মাটিতে পড়ে থাকা সুসেনের নিশ্চল চোখ দুটো যেন তাকিয়ে আছে অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মূর্তির দিকে। সুসেনের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি। মৃত্যু যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নেই তাতে। বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে সুসেন। নরসিংহদেব আর তাকে আটকে রাখতে পারলেন না।

এমন কত ঘটনা অদৃশ্য ভাবে খোদিত হয়ে আছে মন্দিরের গায়ে। যা ভবিষ্যতের মানুষ কোনওদিন জানবে না, জানা সম্ভব নয়। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে এ সব নানা ঘটনার কথাই ভাবছিল নাটমন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা উড়নিবৃত লোকটা। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের ডাকে সম্বিত ফিরল তার। সে তাকিয়ে দেখল আকাশে শুকতারা ফুটে উঠেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিনের প্রথম আলো এসে স্পর্শ করবে পুবের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা সূর্যমন্দিরের সূর্য মূর্তিকে। রথের আকারে নির্মিত বিশাল এই সূর্য মন্দিরে তিনটি সূর্যমূর্তি আছে। তাদের এমন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে দিনের প্রথম সূর্য কিরণ, মধ্যাহ্নের প্রথম সূর্য, আর দিনের শেষ পর্যায়ক্রমে ছুঁয়ে যাবে ওই তিন মুর্তিকে। সারা মাস, সারা বছর ঋতুচক্র নির্বিশেষে। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের অনেক গাণিতিক হিসাব কষে ওই সূর্য মূর্তিকে বসিয়েছে এই লোকটাই। হাজার বছর পরও এ ঘটনার কোনও অন্যথা হবে না।

ভোরের আলো ফোটার আগেই মন্দির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। চলে যেতে হবে দূরে। চন্দ্রভাগার তটে রাখা আছে তার ছোট্ট ডিঙি নৌকা।

BanglaBook.org

উড়নি ঢাকা লোকটা শেষ একবার মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে এল নাটমন্দির থেকে। তারপর চত্বরে ছড়িয়ে থাকা পাথর খণ্ডগুলোর ফাঁক দিয়ে সাবধানে এগোল বাইরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে। অরুণ স্তম্ভের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক ছায়ামূর্তি। তাকে দেখে পরমুহূর্তেই একটা পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করতে যাচ্ছিল উড়নিধারী। কিন্তু তার আগেই সেই ছায়ামূর্তির কণ্ঠ থেকে বিস্মিত চাপাস্বরে উচ্চারিত হল একটা নাম,—'শিবেই সান্তারা!'

ধরা পড়ে গেছেন শিবেই সান্তারা। লোকটা চিনে ফেলেছে তাকে। কণ্ঠস্বর শুনে তাকেও চিনে ফেলেছেন শিবেই। বিশু মহারানা! কারিগর দলের প্রধান সে। বিশু মহারানা ছিল শিবেই সান্তারার ডান হাত। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অন্যতম মাথা বিশু মহারানা। তাকে প্রধান সহকারী স্থপতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখন অবশ্য সে মহাবীর পট্টানায়কের আজ্ঞাবহ। নরসিংসদেব শিবেই সান্তারার স্থলাভিষিক্ত করেছেন মন্ত্রী মহাবীর পট্টানায়ককে।

বিশু মহারানাকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন শিবেই সান্তারা। তার এই দীর্ঘদিনের বিশস্ত সহকর্মী নিশ্চই তার উপস্থিতির কথা মহাবীর পট্টনায়কের কানে তুলবেন না। তারা দু-জনেই এরপর একটা পাথরের আড়ালে সরে আসার পর বিশু মহারানা তাকে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'আপনি এখানে?'

শিবেই জবাব দিলেন, 'আর থাকতে না পেরে চলে এলাম। আর কেউ দেখে ফেলার আগেই ফিরে যেতে হবে।'

কথাগুলো বলার সময় শিবেই সান্তারার বুকের ভিতর জমাট বাঁধা কষ্টটা স্পষ্ট বুঝতে পারল বিশু মহারানা। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'আমি তা জানি। মহাবীর পট্টানায়ক বলেছেন, এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তাঁকে। কলিঙ্গপতি নাকি আদেশ দিয়েছেন, এখানে আপনাকে দেখলেই গ্রেপ্তার করে শূলে চড়ানো হবে।'

বিষণ্ণ হেসে শিবেই সান্তারা বললেন, 'তাহলে ব্যাপারটা তুমি জানো দেখছি! তা আর কী বলেছেন মহাবীর?

বিশু মহারানা বলল, 'হ্যাঁ, আরও একটা কথা সে বলেছে। এখানে কোনও বুদ্ধমূর্তির খোঁজ মিললে সে খবরও যেন তাকে জানানো হয়। যে তার সন্ধান দেবে তাকে সে একশো স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবে। পুরস্কারের লোভেই অনেকেই তা খুঁজেছে, কিন্তু কেউ পায়নি। কেইবা বুদ্ধ মূর্তি তৈরি করবে

BanglaBook.org

এখানে! মহাবীর পট্টনায়ক অর্ক মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির খোঁজ কেন করছে,— এ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না!'

বিশু মহারানার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন শিবেই। তারপর প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই জিগ্যেস করলেন, 'তোমারও কী আমার মতো রোগ ধরল নাকি? আমি যখন এখানে ছিলাম তখন মাঝে-মাঝেই রাতে এভাবে মন্দির চত্বরে ঘুরে বেড়াতাম।'

বিশু মহারানা জবাব দিল, 'না, তা ঠিক নয়। কাল মহারাজা ডেকে পাঠিয়েছেন। রাতে ঘুম আসছিল না। তাই মাঝরাতে মন্দিরে চলে এলাম। তারপর দেখলাম আপনি মন্দির চত্বরে প্রবেশ করছেন। আমি প্রথমে আপনাকে চিনতে পারিনি। কে, কী অভিসন্ধি নিয়ে সন্তর্পণে মন্দিরে প্রবেশ করল তা বোঝার জন্য আড়াল থেকে আপনাকে লক্ষ করছিলাম।'

'মহারাজা ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?'

বিশু মহারানা চিন্তিত ভাবে জবাব দিল 'কারণটা ঠিক আমার বোধগম্য হচ্ছে না। মহাবীর পট্টানায়ক দুদিন আগে পুরী গেলেন। ফেরেননি। জানি না তিনি মহারাজকে কিছু বলেছেন কিনা? তার মনে আজকাল সন্দেহ জেগেছে যে ইচ্ছাকৃতভাবেই কারিগর মজুরের দল কাজে গাফিলতি করছে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উলটো। এত দিন পর কাজ সম্পন্ন হওয়ার মুখে মুক্তির আলো দেখতে পাচ্ছে তারা। দ্বিগুণ পরিশ্রম করছে সকলে। একটাই লক্ষ, কত দ্রুত কাজ শেষ করে ঘরে ফেরা যায়। বারোটা বছর...।' চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস মিশে গেল অন্ধকারে।

শিবেই বললেন, 'প্রধান স্থপতি মহাবীরের এরূপ সন্দেহর কারণ?'

বিশু মহারানা বলল, 'তার সন্দেহ, আপনার সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগ আছে। মহারাজের কাছে প্রধান স্থপতি মহাবীর পট্টানায়ককে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছি আমরা। মন্দির শীর্ষে যে পাথরটার ওপর মঙ্গল কলস বসানো হবে, সে পাথরটা দু-বারের চেষ্টাতেও বসাতে পারিনি আমরা। এতে তার সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর আরও সন্দেহ, মজুরদের মধ্যে বেশ কিছু লোক আসলে নাকি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।'

তার কথা শুনে যেন মৃদু হাসলেন শিবেই। তারপর বিশু মহারানার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, 'আমাকে এবার যেতে হবে, ওই দ্যাখো পুবে শুকতারা ফুটে উঠছে!'

BanglaBook.org

বিশু মহারানা জানতে চাইল, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

শিবেই জবাব দিলেন, 'রঘুরাজপুরে। তবে ভাবছি আরও দূরে কোথাও চলে যাব। সেখানে গেলে এই কোনাদিত্যক্ষেত্রের অর্ক মন্দিরের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারব আমি।'

'সে জায়গা কোথায়?'

বিশু মহারানার এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না শিবেই। চন্দ্রভাগার আকাশে বুড়ি চাঁদ মুছে যেতে শুরু করেছে। রুশতি জেগে উঠবে। নদী তটে যাওয়ার জন্য হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হারিয়ে গেলেন দৃশ্যপটের বাইরে।

তাঁর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে তাঁকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বিশু মহারানা মন্দির চত্বর ছেড়ে এগোল মজুরদের কুটীরগুলোর দিকে। তাদের জাগিয়ে দিতে হবে।

২

সমুদ্রের বুকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নির্জন বালুতটে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল দ্বাদশ বর্ষীয় এক বালক। দিন শেষের মায়াবী আলো এসে পড়েছে তার মুখে। বাতাসে উড়ছে কেশগুচ্ছ। কিছুটা তফাতে বালুতটে ঢেউ ভাঙছে সমুদ্র। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা ভাবছিল, কতদূর সেই চন্দ্রভাগার মোহনা? সেখানে নির্মিত হচ্ছে আশ্চর্য সেই মন্দির? সেখানে আছে তার...।

'ধর্মপদ—ও ও ও!'

ডাক শুনে পিছনে তাকিয়ে ধর্মপদ দেখল মা এসেছে। ধর্মপদকে যে এখানেই পাওয়া যাবে তা জানা সুদত্তার। ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে সে। ধর্মপদর কাছে এসে দাঁড়াল সুদত্তা। তাকাল ধর্মপদ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মাটির দিকে। ভেজা বালুতটে সে জায়গাতে অস্পষ্ট সব আঁক। ধর্মপদর ছোট্ট ছড়িটা মাটিতে পড়ে আছে। আঁক কষার তালপাতা কেনার ক্ষমতা নেই সুদত্তার। কাজেই ধর্মপদ এই নির্জন বালুতটে এসে মাটিতে ছড়ি দিয়ে আঁক কষে। তবে এ ব্যাপারে একটাই অসুবিধা, মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে সমুদ্রজল এসে মুছে দেয় সব চিহ্ন। আঁক গুলোর দিকে তাকিয়ে সুদত্তা জিগ্যেস করল, 'আজ কী আঁক কষছিলে বাবা?'

ধর্মপদ বলল, 'একটা মন্দিরের আঁক।'

এমনই রোজ এই বালুকাবেলায় কোনওদিন কোনও মন্দির, কোনওদিন কোনও প্রাসাদ, স্তম্ভ বা মহলের আঁক কষে ধর্মপদ। স্থাপত্যের জটিল সব মাপজোক, হিসাবনিকাশ। সুদত্তা এসব কেন, এগ্রামে যারা স্থাপত্য বিদ্যার চর্চা করেন তাঁরাও সব অবাক হয়ে যান ধর্মপদর আঁক দেখে। নির্ভুল সব আঁক। যার ওপর নির্ভর করে অবশ্যই বানিয়ে ফেলা যায় কোনও মন্দির বা দৃষ্টিনন্দন কোনও ইমারত। প্রাজ্ঞ স্থপতিরা ধর্মপদর আঁক দেখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে—'হবে নাই বা কেন? ওর বাবা যে এ-গ্রামের সেরা বাস্তুকার ছিল। ধর্মপদর রক্তেই মিশে আছে এসব আঁক।'

বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক বেশ কিছু পুরোনো পুঁথি আছে ধর্মপদর বাড়িতে। তালপাতার সেই পুঁথিগুলো ছিল ধর্মপদর বাবা বিশু মহারানার। সেসব পুঁথি তো বটেই, এগ্রামে এজাতীয় যত পুঁথি আছে ইতিমধ্যেই পাঠ করা হয়ে গেছে ধর্মপদর। মন্দিরের দেশ উৎকল। ধর্মপদ বলে, 'আমি বড় হয়ে এমন মন্দির বানাব যা সারা উৎকলে কোথাও নেই।' যদিও হাতে কলমে কোনও কাজ করার সুযোগ এখনও হয়নি ধর্মপদর। কারণ সে সুযোগ পাওয়ার মতো বয়স তার হয়নি। তবে সে সুযোগ তার একদিন নিশ্চয়ই আসবে। তার কথা শুনে লোকে তাকে আদর করে ডাকে 'খুদে বিশ্বকর্মা' বলে।

অন্যদিন হলে, সুদত্তার কথার জবাব দেওয়ার পর তাকে আঁকগুলো বোঝাবার চেষ্টা করত ধর্মপদ। তার সেই ব্যর্থ চেষ্টা চলত যতক্ষণ না আঁধার নামে, অথবা সমুদ্রর জল এসে মুছে দেয় তার আঁক। ধর্মপদ আজ কিন্তু সে চেষ্টা করল না। সুদত্তার কথার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বেশ কিছু মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সমুদ্রর দিকে। তারপর ছড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে সুদত্তাকে বলল, 'চলো এবার ফেরা যাক।'

ধর্মপদকে নিয়ে সুদত্তা যখন বাড়ি ফিরল তখন অন্ধকার নেমে গেছে। বাড়ি মানে মাটির দেওয়াল আর শনের ছাউনি দেওয়া একটা ঘর। সারা গ্রামের মধ্যে ধর্মপদর ঘরটাই সবচেয়ে শ্রীহীন। মন্দিরে সেবাদাসীর কাজ করে কোনওরকমে নিজের আর ছেলের পেটের ব্যবস্থা করে সুদত্তা, সে আর বাড়ি বানাবে কীভাবে? অথচ এ-ঘরে বসেই বিরাট বিরাট মন্দির দেউল

BanglaBook.org

ইমারত বানাবার স্বপ্ন দেখে খুদে বিশ্বকর্মা ধর্মপদ। তার বাবাও একদিন ওই ছাদের তলায় বসে একই স্বপ্ন দেখত। তাইতো যে দিন কোনাদিত্যক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণের ডাক এল, সেদিন বিশু মহারানাকে আর ঘরে বেঁধে রাখতে পারল না সুদত্তা। বিশু মহারানা কোনাদিত্যক্ষেত্রে চলে গেল তার স্বপ্নপূরণের জন্য।

ঘরে ঢুকে একটা মৃৎপ্রদীপ জ্বালালেন সুদত্তা। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই; মাদুর বিছানো একটা শোওয়ার জায়গা। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কিছু মৃৎপাত্র। কুলুঙ্গিতে রাখা আছে তালপাতার ওপর আঁকা ভগবান বিষ্ণুর বরাহবতারের ছবি। বরাহবতারের মন্দির আছে এই গ্রামে। তিনিই এ-গ্রামের কুলদেবতা। সুদত্তা সে মন্দিরেই সেবাদাসীর কাজ করে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে সুদত্তা ধর্মপদকে হাত ধরে এনে দাঁড় করালেন কুলুঙ্গিতে রাখা সেই বরাহবতারের ছবির সামনে। তারপর ঘরের কোনা থেকে কচুপাতা ঢাকা একটা মৃৎপাত্র এনে ধর্মপদর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেবতাকে প্রণাম করো। আজ তোমার জন্মদিন। দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলে তুমি।'

ধর্মপদ দেবতাকে প্রণাম জানাবার পর সুদত্তাকে বললেন, 'আমি আজ বড় হয়ে গেছি মা। পাঠশালায় গুরুমশাই বলেন যে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলে ছেলেরা বড় হয়ে যায়।'

সুদত্তা ধর্মপদকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে সস্নেহে চুমু খেয়ে বলল, 'গুরুমশাই যাই বলুন, তুমি এখনও মোটেই বড় হওনি। ছোট্টটিই আছ।'

ধর্মপদ আবার বলল, 'না, মা, আমি আজ সত্যিই বড় হয়ে গেছি।'

সুদত্তা বুঝতে পারল না আজ এই বালকের কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন দৃঢ়তা লুকিয়ে আছে। সে ছেলেকে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝলাম। এবার খেয়ে নাওতো বাবা।'

কচুপাতাটা ওঠাল সুদত্তা। মাটির পাত্রর মধ্যে আছে কিছু পরমান্ন। তা দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ধর্মপদর মুখ। এ জিনিস তার ভাগ্যে বিশেষ জোটে না। ছেলেকে পায়েস খাওয়াবার সামর্থ নেই সুদত্তার। এ পায়েসও সে নিজে বানায়নি। আসলে এটা বরাহবতার মন্দিরের ভোগ প্রসাদ। মহন্তকে বলে সে কিছুটা পায়েস এনেছে ছেলের জন্য।

পরম তৃপ্তিতে আজ আহার সম্পন্ন করল ধর্মপদ। তারপর অন্য একটা

BanglaBook.org

কুলুঙ্গি থেকে ন্যাকড়া জড়ানো কিছু জিনিস নিয়ে প্রদীপের সামনে বসল। ওতে আছে তালপাতার কিছু পুঁথি। বিশু মহারানার হস্তাক্ষর আছে তাতে। ধর্মপদ প্রায়সই এই পুঁথিগুলো নিয়ে বসে। বাস্তুবিদ্যার এই পুঁথিগুলো বহুবার পড়েছে ধর্মপদ। তবুও বারবার পড়ে। সুদত্তা খেয়াল করল না, আজ ধর্মপদ পুঁথি পড়ছে না। পরম মমতায় হাত বোলাচ্ছে পুঁথির পাতাগুলোতে। পুঁথিগুলোকে স্পর্শ করে সে যেন অদৃশ্য কারও কাছে পৌঁছোতে চাচ্ছে। যাকে সে কোনওদিনই দেখেনি, শুধু শুনেছে তার কথা। যে মিশে আছে ধর্মপদর রক্তে।

সুদত্তা লেগে গেল ঘরের কাজে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। সূর্যের আলো ফোটার আগেই তাকে রোজ উঠে পড়তে হয়। স্নান সেরে মন্দিরে দেবতার পূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করে তারপর লেগে পড়তে হয় মন্দির ধোয়া-মোছার কাজে। এরপর সারা দিন মন্দিরের নানা কাজেই কাটে তার। শেষ বিকালে সান্ধ্য আরতির জন্য ঘি-এর প্রদীপ সাজিয়ে তবে ছুটি মেলে।

মা'র কাজ সারা দেখে ধর্মপদ পুঁথি গুটিয়ে ফেলল। তারপর দুজনে মিলে শুয়ে পড়ল খেজুরপাতার পাটিতে। বাইরে থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রর গর্জন। মাটির প্রদীপটাও নিবুনিবু হয়ে এসেছে। ধর্মপদ বলল, 'সেই কোনাদিত্যক্ষেত্রের গল্পটা বলো না মা। সেই শাম্বর গল্পটা?'

সুদত্তা গল্প বলার আগে একবার তাকাল ধর্মপদর মুখের দিকে। বাইরে থেকে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে ধর্মপদর মুখে। সেই আলোতে শাম্বর মতো অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে ধর্মপদর মুখ। এ-ও তো এক শাম্বই। জন্মর পর থেকে বারো বছর ধরে যে বাবার মুখ দেখতে পেল না, সে-ও শাম্বর মতোই শাপগ্রস্ত।—মনে মনে কথাগুলো ভেবে গল্প বলতে শুরু করল সুদত্তা—

'কৃষ্ণ পুত্র শাম্ব। অপরূপ সুন্দর তাকে দেখতে। দেবতারা অনেকে আড়ালে বলতেন শাম্ব নাকি তার পিতা ভগবান কৃষ্ণর চেয়েও বেশি রূপবান। কীভাবে যেন এ কথাটা একদিন চলে গেল দেবর্ষী নারদের কানে। নারদ ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত। হরির গুণকীর্তন করে বেড়ান তিনি। আর কৃষ্ণ-হরি তো ভগবান বিষ্ণুরই রূপ। বিষ্ণু সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী। কোনও ক্ষেত্রে অন্য কারও চেয়ে তিনি খাটো—এ আলোচনা সহ্য করতে পারতেন না নারদ। ব্যাপারটা কানে যেতেই নারদ মনে মনে

BanglaBook.org

ঠিক করলেন এমন কাণ্ড ঘটাতে হবে যে শাম্ব, কৃষ্ণর থেকে সুন্দর—এ কথাটা আর কেউ যেন না বলতে পারে।

প্রাচীর বেষ্টিত এক সরোবরে ষোড়শ গোপিনিকে নিয়ে জলক্রীড়া করতেন ভগবান কৃষ্ণ। দেবতা-যক্ষ-নর, সকলের প্রবেশই সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। বালক শাম্বর এ ব্যাপারটা জানা ছিল না। একদিন কি একটা প্রয়োজনে শাম্ব যখন তার পিতার সন্ধান করছেন, তখন নারদ কৌশলে শাম্বকে পাঠিয়ে দিলেন সে জায়গায়। ভগবান তখন জল ক্রীড়ায় মত্ত। শাম্বকে সেখানে দেখে ভয়ংকর কুপিত হলেন। রাগের মাথায় তিনি পুত্রকে শাপ দিয়ে বসলেন, 'তোমার কুষ্ঠ হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল শাম্বর অপরূপ সৌন্দর্য। কুষ্ঠর ঘা ফুটে উঠল তার শরীরে। কদাকার চেহারা হল তার। তার করুণ অবস্থা দেখে রাগ কমলে ভগবান কৃষ্ণও বুঝতে পারলেন যে রাগের মাথায় পুত্রকে কঠিন শাস্তি দিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু একবার শাপ দিলে তো আর তা ফেরানো যায় না। এখন কী হবে উপায়? সূর্যরশ্মি হল সর্ব রোগ হরা। কৃষ্ণ তাই পুত্রকে পরামর্শ দিলেন সূর্যদেবের তপস্যা করার জন্য। পিতার কথা মতো দ্বারকা ছেড়ে শাম্ব চলে এলেন অনেক দুরে চন্দ্রভাগার মোহনায় কোনাদিত্যক্ষেত্রে। কোনাদিত্য অর্থাৎ যেখানে আদিত্য রশ্মি মাটিতে প্রথম কোন সৃষ্টি করে, বা প্রথম এসে পড়ে। নির্জন সেই চন্দ্রভাগা তটে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। বারো বছর পর সাধনা শেষ হল শাম্বর।

একদিন ব্রহ্মমুহূর্তে তিনি চন্দ্রভাগায় অবগাহন করে সিক্ত দেহে পাড়ে উঠে আসতে আসতে সূর্যমন্ত্র জপ করতে লাগলেন—

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধন্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোহস্মি দিবাকরম।।'

ঠিক এই সময় সূর্যদেবের প্রথম আলো এসে পড়ল কোনাদিত্যক্ষেত্রে। সেই আলো মেখে শাম্ব যখন পাড়ে এসে দাঁড়াল তখন সে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত। দীর্ঘ তপস্যার পর সূর্যদেবের পবিত্র কিরণে শাপমুক্তি হল শাম্বর। সে ফিরে পেল তার অপরূপ সৌন্দর্য। লোকে বলে এর পর ওই পবিত্র তটে নাকি শকদেশীয় ব্রাহ্মণরা এসে সূর্যপুজোর প্রচলন করে। সেখানেই তৈরি হচ্ছে সূর্যমন্দির।'

BanglaBook.org

'সেখানে আমার বাবা আছেন তাই না মা?'

গল্প শেষ করে ছেলের প্রশ্নের উত্তরে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সুদত্তা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ তিনি সেখানে আছেন। এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

প্রদীপ নিভে গেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধর্মপদ অস্পষ্ট ভাবে বলল, 'আমি বাবার কাছে যাব। যেখানে তিনি তৈরি করছেন সেই সূর্যমন্দির!'

ধর্মপদর কথা কানে গেল না সুদত্তার। সারা দিনের পরিশ্রমের পর তার ঘুম নেমে এসেছে।

ধর্মপদ কিন্তু ঘুমাল না। সে শুনতে লাগল বাইরে থেকে ভেসে আসা সমুদ্রর গর্জন। সেই মন্দ্র শঙ্খধ্বনী যেন তাকে ডাকছে। ওই সমুদ্রের পাড়েই তো কোথাও আছে পুরীক্ষেত্র, কোনাদিত্যক্ষেত্র, চন্দ্রভাগার মোহনা। যেখানে আছেন বিশু মহারানা, যেখানে তৈরি হচ্ছে আশ্চর্য সেই অর্ক মন্দির! ধর্মপদ আজ বড় হয়ে গেছে। তাকে যেতে হবে বাবার কাছে।

তখন মাঝ রাত। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ধর্মপদ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত সুদত্তার গায়ে। ঘরের পুঁথিগুলোর মধ্যে বিশু মহারানার আঁক কষা ক'টা পুঁথি আজ আলাদা করে রেখেছে সে। কুলুঙ্গিতে দেবতার ছবি আর মায়ের দিকে তাকিয়ে একবার প্রণাম জানিয়ে ধর্মপদ সেই পুঁথিগুলো কাপড়ে বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

৩

অশ্ব শকটে শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল বিশু মহারানা। সেখানে সে যখন পৌঁছল তখন সূর্য মাথার ওপর। বিশু হিসাব করে দেখল মহারাজার সঙ্গে এবেলা সাক্ষাতের সময় পেরিয়ে গেছে। দর্শনার্থীদের আবার তিনি দর্শন দেবেন সান্ধ্য সভায়। তবে এক দিক দিয়ে ব্যাপারটা ভালোই হয়েছে, এই ফাঁকে আজ মহোদধিতে স্নান সেরে জগন্নাথ দর্শন করতে পারা যাবে। মহারাজের মনে কী আছে জানা নেই। হয়তো এই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। ব্যাপারটা ভেবে মনে একটু খুশি হয়েই বিশু মহারানা এগোন স্বর্গদ্বারের দিকে। স্বর্গদ্বার সংলগ্ন সমুদ্রকে বলে মহোদধি। এখানে স্নান করলে

BanglaBook.org

সাত জন্মের পাপ মুক্তি ঘটে। মহোদধিতে নামার আগে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল সারা জীবনে সে কোনও পাপ করেছে কিনা?

সারা জীবন সৎ ভাবে কাটিয়েছে বিশু মহারানা। জ্ঞানত সে কোনও পাপ করেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার। যে মজুর-শিল্পী-কারিগরের দলকে সে মন্দির নির্মাণের জন্য সংগ্রহ করে এনেছিল তাদের আর ঘরে ফেরা হয়নি। কার্যত বন্দি জীবনই কাটাচ্ছে তারা। তাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু হয়েছে। অত্যধিক পরিশ্রমে বা প্রিয়জন বিচ্ছেদের কারণে কয়েকজন উন্মাদ হয়েছে। তাদের প্রিয়জনরা আজও হয়তো বসে আছে তাদের পথ চেয়ে। এ সব ঘটনার জন্য কী বিশু মহারানার পাপ লাগবে? এই ব্যাপারগুলো মাঝে মাঝেই পীড়া দেয় বিশুকে।

এ নিয়ে একদিন প্রশ্নও করেছিল শিবেই সান্তারাকে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'এ পাপ তোমার-আমার নয়। পাপ যদি কেউ করেই থাকেন তিনি স্বয়ং কলিঙ্গপতি নরসিংহদেব। তার নির্দেশেই তো এখানে বন্দি আছে সবাই।'

এ কথাগুলো সমুদ্র তটে দাঁড়িয়ে ভাবার পর আরও একজনের কথা মনে পড়ল বিশুর। সুদত্তার কথা। কেমন আছে সে? এ বারো বছরে তার প্রতি কোনও কর্তব্য পালনতো দূরের কথা তাকে চোখেও দেখেননি তিনি। এমনকী সে জীবিত না মৃত সে সংবাদও জানা নেই বিশুর। হ্যাঁ, এটা হয়তো তার প্রতি অন্যায় করেছে বিশু। সুদত্তার কথা মনে পড়তেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তার মনে জেগে উঠল একটা পাপবোধ, 'হে জগন্নাথ আমাকে ক্ষমা করো। পাপ মুক্ত করো।'—এই বলে বিশু মহারানা ডুব দিল মহোদধিতে।

স্নান সেরে পদব্রজে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হল বিশু। জায়গাটাতে মোহন্ত, পান্ডা, সেবাদাস, দর্শনার্থীদের ভিড়। মোহন্তরাই পরিচালনা করে এই মন্দির। তবে এখানে এসে একটু হতাশই হল বিশু। গর্ভগৃহর দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিপ্রহরে প্রভু এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। দর্শন হবে না। স্থাপত্য শিল্পের ওপর বিশুর আকর্ষণ প্রবল। তাই মন্দির চত্বর ঘুরে দেখার জন্য বিশু চত্বরে প্রবেশ করতে যেতেই দুজন দ্বাররক্ষী এসে তার সামনে দাঁড়াল। বিশুকে ভালো করে দেখার পর একজন দ্বাররক্ষী জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী?'

BanglaBook.org

'বিশু মহারানা।' জবাব দিল সে।

'কোথা থেকে আসা হচ্ছে?' জানতে চাইল অন্যজন।

'কোনাদিত্যক্ষেত্র থেকে।' উত্তর দিল বিশু।

তবুও পথ ছাড়ল না লোকদুটো। তাদের চোখেমুখে সন্দিগ্ধ ভাব। একজন বেশ কর্কশ ভাবেই বলল, 'তোমার নাম যে বিশু মহারানা, আর তুমি যে কোনাদিত্যক্ষেত্র থেকে আসছ, তার কোনও প্রমাণ আছে? প্রমাণ না দিলে ভিতরে ঢোকা যাবে না।'

তার কথা শুনে বিশুর আত্মসম্মানে ঘা লাগল। সে কী মিথ্যা বলছে? নাকি উৎকোচের আছিলায় দ্বাররক্ষীরা তার পথ আটকাচ্ছে?

বিশু কঠিন স্বরে জবাব দিল, 'প্রমাণ পেতে হলে তোমাদের আমার সঙ্গে মহারাজ নরসিংহদেবের দরবারে যেতে হবে। মন্ত্রী ও মহাবীর পট্টানায়ক আমাকে চেনেন। কোনাদিত্যক্ষেত্রে নির্মিয়মান সূর্যমন্দিরের প্রধান কারিগর আমি। মহারাজের আদেশই আমি শ্রীক্ষেত্রে এসেছি। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাদের দুজনের নাম জানতে ইচ্ছে হয়।'

বিশুর মুখে মন্ত্রী মহাবীর পট্টানায়কের নাম শুনেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বাররক্ষীদের ব্যবহার পালটে গেল। একজন বেশ ভীত কণ্ঠে বলল, 'অপরাধ নেবেন না। আসলে আপনার গায়ের উড়নিটাই আমাদের সন্দেহর উদ্রেক ঘটিয়েছিল। বৌদ্ধরা ওভাবে উড়নি গায়ে দেয়।'

বিশু এবার বুঝতে পারল লোকটা মিথ্যা বলছে না। আসলে রোদ থেকে পিঠ বাঁচাতে অনেকটা বৌদ্ধ শ্রমনরা যেভাবে দেহ আবৃত করে সেভাবেই উড়নি বেঁধেছে সে। বিশু উড়নিটা ঠিক করে বাঁধতে লাগল। সেই অবসরে অন্য আর একজন দ্বাররক্ষী বলল, 'জানেনইতো এ মন্দিরে হিন্দু ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষেধ। কিছু দিন আগে দুজন বৌদ্ধ আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মন্দিরে ঢুকে গেছিল। ভাগ্য ভালো গর্ভগৃহে ঢোকার আগেই তারা ধরা পড়ে গেল। তাই মন্দিরে কাউকে ঢুকতে দেওয়ার আগে আমরা সকলকেই একটু...।'

উড়নি ঠিক করে বিশু বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তা সেই বৌদ্ধদের নিয়ে কী হল তারপর?'

লোকটা জবাব দিল, 'প্রভু জগন্নাথের যা ইচ্ছা তাই হল। নরসিংহদেবের কাছে হাজির করার পর তাদের মশানে নিয়ে যাওয়া হল।'

BanglaBook.org

'প্রভু জগন্নাথের ইচ্ছা?' বিস্মিত বিশু দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করল। ভালোভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মন্দিরের গঠন শৈলী। প্রাচীন উৎকল রীতিতে তৈরি এ মন্দির। রাজা গঙ্গেশ্বর এ মন্দির নির্মাণ শুরু করান। কাজ সম্পন্ন হয় মহারাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের আমলে। বিশু শুনেছে, এ মন্দিরের ইতিহাস নাকি আরও প্রাচীন। অবন্তনগরের সূর্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদুম্ন বিষ্ণুর স্বপ্নাদেশে প্রথম নাকি এখানে জগন্নাথ মন্দির ও একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তখন সে গ্রামের নাম ছিল 'রামকৃষ্ণপুর' যা পরবর্তী কালে শ্রীক্ষেত্র নাম পায়। এ শহরকে অবশ্য আরও অনেক নামে ডাকতে শুনেছে বিশু। কেউ কেউ এই শ্রীক্ষেত্রের আকার শঙ্খ সদৃশ্য বলে এ জায়গাকে 'শঙ্খক্ষেত্র' নামে ডাকে। কেউ বলে দশাবতারক্ষেত্র, কেউ নীলাচল বা শ্রীপুরুষোত্তমধাম। আবার শ্রীবিষ্ণুর পুরী বলে অনেকে শ্রীক্ষেত্রকে 'পুরী' বলে ডাকে।

বিরাট জায়গা নিয়ে এই বিশাল মন্দির। মাথায় পতপত করে উড়ছে জয়ধ্বজ। যা জানান দিচ্ছে গঙ্গাবংশীয় রাজাদের ধর্মের গরিমা, তাদের প্রতাপ। মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে বেশ কিছু ছোটছোট মন্দির। বিষ্ণু, লক্ষ্মী, বিমলার মন্দির। মূল মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত অষ্টবিদ্যাপাল, দিকপালিকা, পশুপাখি, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নর-নারীর মূর্তি, ফুল-লতাপাতার অলঙ্করণ। এ সব দেখতে দেখতে বিশুর একটা কথা মনে হল, এ সব শিল্পকলা সুন্দর ঠিকই, কিন্তু চন্দ্রভাগার নির্জন তটে যে মন্দির ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সে মন্দিরের শিল্প সুষমার কাছে এসব শিল্প কিছুই না। প্রতিটা মূর্তি, এমনকী স্তম্ভ, সোপানশ্রেণিও সেখানে যেন জীবন্ত। আজ শুধু নয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে সে মন্দিরের দিকে। শ্রীক্ষেত্রের এই জগন্নাথ মন্দিরের মতো ধর্মীয় গুরুত্ব হয়তো সে মন্দির পাবে না, কিন্তু সে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে যে-কোনও লোককে এক বাক্যে বলতে হবে, 'নাঃ শিল্পী ছিল বটে লোকগুলো! এরকম স্থাপত্য ভূ-ভারতে নেই!

এ ব্যাপারটা ভেবে বেশ আত্মশ্লাঘা অনুভব করল বিশু। কিন্তু এর পরই একটা কথা ভেবে সে শঙ্কিত হল। যদি সেই চুম্বক পাথরটাকে মন্দির শীর্ষে স্থাপন না করা যায়? দুবার চেষ্টা করে তো ব্যর্থ হল তারা। বহুমূল্য ওই পাথর অনেক দূর থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। পাথরের আর দুটো মাত্র খণ্ড আছে যা কাজে লাগানো যেতে পারে। চুম্বক পাথরের বদলে অন্য

BanglaBook.org

কোনও বিশেষ পাথর মন্দির শীর্ষে স্থাপন করা যাবে না। কারণ, ওই পাথরটার সঙ্গে নাকি গর্ভগৃহে যে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে, ভেঙে না বললেও কথাটা একবার শিবেই বলেছিলেন। মন্দির শীর্ষে পাথর বসানোর ব্যাপারেই মহারাজ তাকে তলব করেছেন কিনা কে জানে?

এ ব্যাপারগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতেই আর এ মন্দিরে থাকতে ভালো লাগল না বিশুর। জগন্নাথের নাম নিয়ে মহারাজ সন্দর্শনে রওনা হল সে।

গুন্ডিচা মন্দিরের কাছে মহারাজা নরসিংহদেবের মন্ত্রণালয়। নরসিংহদেব সাক্ষাতপ্রার্থীদের বৈকালিক দর্শন দেন। বিশু মহারানা যখন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছল, তখন সমুদ্রর বুকে আবির গুলে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। প্রাসাদের বিশাল দরজা, ভিতর থেকে বন্ধ, কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মহারাজের পাট হস্তি। পর্বত সদৃশ তার কলেবর। সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত, পিঠে রুপোর শিবিকা। গম্ভীর প্রাণীটা মাথা নাড়ছে, আর মাটিতে পা ঠুকছে। ঝম্‌মম্ শব্দে বেজে উঠছে তার পায়ের শিকল। হাতিটাকে দেখে বিশু অনুমান করল মহারাজ নিশ্চয়ই প্রাসাদের ভিতরেই আছেন। সদর দরজার কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দরজা খোলার প্রতীক্ষা করতে লাগল বিশু। দিন শেষের অপার সৌন্দর্য সমুদ্র বুকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকলেও বিশুর বুকের ভিতর হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে। কী জানি কী বলবেন মহারাজ?

সূর্য একসময় হারিয়ে গেল সমুদ্রে। ঠিক এই সময় সদর দরজা খুলে গেল। মশাল হাতে বেরিয়ে এল একদল মন্ত্রী। প্রবেশ তোরণের পাশেই দেওয়ালের খাঁজে তারা গুঁজে দিল মশালগুলো। আলোকিত হয়ে উঠল তোরণের প্রবেশ মুখ। আর এর পরই তোরণের মাথায় ছোট কক্ষ মতো জায়গা থেকে সানাইয়ে সন্ধ্যার তান ধরল বাদযন্ত্রীরা। তোরণের দুপাশে সারবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল রক্ষীরা। বিশু কিছু ভয়ে ভয়েই তোরণের কাছে গিয়ে একজন দ্বাররক্ষীর কাছে তাকে মহারাজের ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটা জানাল। বিশুর কথা শুনে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদের পর সন্তুষ্ট হল রক্ষী। সে অপর একজন রক্ষীকে ভিতরে পাঠাল বিশুর বক্তব্যর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল সেই রক্ষী। মন্ত্রণাকক্ষে ডাক এসেছে বিশু মহারানার। সেই রক্ষীর সঙ্গে বিশু চলল মন্ত্রণাকক্ষের দিকে।

BanglaBook.org

মশালের আলোয় আলোকিত মন্ত্রণাকক্ষ। রক্ষী পরিবৃত। কক্ষের একটা দেওয়ালের গায়ে বেশ উঁচুতে দণ্ডায়মান মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের প্রস্তরমূর্তি। আর তার পদতলে সিংহাসনে বসে আছেন কলিঙ্গপতি, মহাপরাক্রান্তশালী, উৎকল নরেশ মহারাজ নরসিংহদেব। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর তার রাজ্য জগন্নাথদেবকে উৎসর্গ করেন এবং দেবতার সামন্ত হিসেবেই তিনি ও তাঁর উত্তরাধীকারীরা শাসন পরিচালনা করবেন বলে ঘোষণা করেন। নরসিংহদেবও দেবতার সামন্ত। তাই দেবতার পদতলে তার সিংহাসন। দুজন দাসী সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে চামর দোলাচ্ছে। মন্ত্রী-সভাসদরা দুপাশে সার বেঁধে দণ্ডায়মান।

বিশুকে এনে হাজির করানো হল মহারাজের সামনে। বিশু একবার সামনে তাকাতেই দেখতে পেল নরসিংহদেবের সিংহাসনের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রী পট্টানায়েক। বিশু করজোড়ে মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। সভাসদদের গায়ের পট্টবস্ত্রের মৃদু খসখস শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই ঘরে। বিশু অনুমান করল মহারাজ তার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

নরসিংহদেব সত্যিই বেশ কিছুক্ষণ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিশুর দিকে। মহাবীর পট্টনায়েকের মুখ থেকে ইতিপূর্বে তিনি শুনেছেন যে এ লোকটা নাকি তাঁর বিতাড়িত মন্ত্রী ও বাস্তুকার শিবেই সান্তারার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল!

বিশুকে ভালো করে দেখার পর নরসিংহদেব মৃদু ইশারা করলেন মহাবীর পট্টনায়েককে। বিশু নগণ্য মানুষ, তার সঙ্গে বাক্যালাপের অভিরুচি নেই কলিঙ্গপতির। তাঁর হয়ে যা কথা বলার তা বলবে মন্ত্রী মহাবীর। শুরু করলেন মহাবীর, 'কলিঙ্গপতি জানতে চান মন্দির নির্মাণের কাজ আর ক'দিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে?'

বিশু মাথা নীচু করে উত্তর দিল, 'আপনি তো সবই জানেন। কাজ প্রায় সম্পন্ন শুধু মন্দিরের মাথায় সেই কালো পাথরটা বসানো বাকি। যার ওপর বসানো হবে মঙ্গল কলস।'

'কবে সম্পন্ন হবে সে কাজ?'

বিশু জবাব দিল, 'যত শীঘ্র সে কাজ করার চেষ্টা করছি। ইতি পূর্বেও

BanglaBook.org

চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু...।'

তাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে প্রধান স্থপতি মহাবীর পট্টানায়েক বলে উঠলেন, 'আর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দুবার পাথর খসে পড়ে নষ্ট হয়েছে তাইতো?' মৃদু শ্লেষ তার কণ্ঠস্বরে।

সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বিশু বলল, 'হ্যাঁ। আপনি প্রধান স্থপতি। আপনিতো সবই জানেন।'

মন্ত্রী এবার বেশ কর্কশ স্বরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, সবই জানি। এ-ও জানি কেন পাথরটা বসানো হচ্ছে না। বিশেষ অভিসন্ধি আছে তাই।'

মহাবীর পট্টনায়েকের কথায় চমকে উঠল বিশু। তার সামনেই তো দু-দুবার পাথর বসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে মজুর কারিগরের দল। কী বলতে চাচ্ছেন পট্টনায়েক? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিশু।

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। নরসিংহদেব চাপা স্বরে কী যেন বললেন মহাবীরকে। মহাবীর এবার প্রশ্ন করলেন, 'মজুর-শিল্পী-কারিগরদের মধ্যে কে কে বৌদ্ধ আছে তা জানো?'

বিশু জবাব দিল, 'শিল্পী বা মজুরদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কেউ নেই। তারা সবাই শ্রীজগন্নাথের বা শ্রীবিষ্ণুর সেবক।'

বিশু জ্ঞানত মিথ্যা কথা বলেনি। তাদের কাউকে কোনওদিন বুদ্ধর উপাসনা করতে দেখেনি সে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে হয়তো তাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ একসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সে তো বহু শতাব্দী আগের কথা। কলিঙ্গ যুদ্ধর পর চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হলেন। বুদ্ধের স্মরণ নিলেন। তারপর কয়েক শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম প্লাবিত করেছিল এ দেশকে। তারপর আবার হিন্দুধর্মের ধ্বজা উড়ল উৎকলে। রাজ তরবারি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মুণ্ডিত মস্তকগুলো মাটিতে নামিয়ে আনল। প্রাণে বাঁচার জন্য তখন আবার সকলে গ্রহণ করতে শুরু করল হিন্দু ধর্ম। বৌদ্ধরা মুছে গেল উৎকল থেকে। সামান্য যে ক'জন বৌদ্ধ এখনও এদেশে আছে তাদের কোন নগর বা গ্রামে প্রবেশাধিকার নেই। তারা কার্যত বন্দি জীবন কাটায় ধৌলিগিরি বা রত্নগিরির জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম গুহাতে। শিল্পী-কারিগরদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকবে কীভাবে?

বিশুর জবাব শুনে মহাবীর পট্টনায়েক বললেন, 'তাহলে মন্দির চত্বরে বুদ্ধ মূর্তির দেখা মিলল কী ভাবে? কে বানাল সেই মূর্তি? মহারাজ

BanglaBook.org

নরসিংদেবের রাজত্বে এত বড় দুঃসাহস কার হল?'

মন্দির চত্বরে বুদ্ধ মূর্তি! তার কথায় চমকে উঠল বিশু। বিস্মিতভাবে সে বলল, 'কই আমিতো সে মূর্তি দেখিনি।'

মহাবীর ধমকে উঠলেন, 'সত্যি কথা বলো। আমি খবর পেয়েছি, মন্দিরের পিছনে পরিত্যক্ত স্তূপের মধ্যে সে মূর্তি ছিল। পরে সে মূর্তি অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলা হয়। কোথায় লুকানো হয়েছে সেই মূর্তি?'

ধমক শুনে কেঁপে উঠে মুখ তুলল বিশু। মুহূর্তের জন্য এবার চার চোখাচোখি হয়ে গেল সিংহাসনে আসীন নরসিংহদেবের সঙ্গে। মশালের আলোতে থমথম করছে তাঁর মুখ। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে। মহাবীর পট্টানায়েক সহ অন্য সভাসদদের দৃষ্টিও বিশুর ওপরেই নিবদ্ধ।

বিশু আবার মাথা নামিয়ে নিল। তারপর ভয়ার্ত কণ্ঠে হাতজোড় করে বলল, 'আমি ওই মূর্তির ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানি না মহারাজ। এ ব্যাপারটা আমি এখনই জানলাম। শ্রীজগন্নাথের নামে শপথ নিয়ে আমি এ কথা বলতে পারি।'

বিশুর কথা নরসিংহদেব বা মহাবীর পট্টনায়েকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হল কিনা তা বোধগম্য হল না বিশুর। নরসিংহদেবের সাথে চাপাস্বরে কি যেন আলোচনা করার পর মহাবীর বললেন, 'শোনো বিশু, আগামী শুক্লা সপ্তমী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য শুভ দিন। আর সাত দিন বাকি। শুক্লা সপ্তমীতেই মন্দিরের গর্ভগৃহে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। মহারাজের আদেশ তার আগেই মন্দির শীর্ষে পাথর বসানোর কাজ শেষ করতে হবে। আর অন্য কোনও পাথর নয়, ওই বিশেষ কালো পাথরই বসাতে হবে।'

বিশু বলল, 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব ও কাজ সম্পন্ন করার।'

মহাবীর বললেন, 'চেষ্টা নয়, কাজটা নির্ধারিত দিনের মধ্যে যে ভাবেই হোক করতে হবে। নইলে মহারাজ কঠিন দণ্ড দেবেন তুমি আর তোমার বারোশো লোককে।'

মহাবীর পট্টানায়েকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথম রাজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল বিশু। কোনও বাক্য নয়, ছোট্ট একটা শব্দ বেশ দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলেন কলিঙ্গপতি।—মৃত্যুদণ্ড!

শিঙা বেজে উঠল এরপর। সান্ধ্য সভা ভেঙে মহারাজ সিংহাসন ছেড়ে

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়ালেন। পাট হস্তি করে মহারাজকে জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। মহারাজ গাত্রত্থান করায় ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। মন্ত্রণালয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে কিছুটা দূরে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল বিশু। আকাশে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ঢেউ এসে ভাঙছে সমুদ্র তটে। তাদের মাথায় হীরকদ্যুতি। সমুদ্র আর বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি। কোনও মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে বোধহয়। কিন্তু বিশুর কানে সমুদ্র গর্জন বা ঘণ্টাধ্বনি—কোনও শব্দই ঢুকছে না। একটাই শব্দ তার কানে বাজছে—মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড!

৪

সারা রাত জেগে থাকার পর প্রদীপটা নিভে গেল। তেল শেষ হয়ে গেছে। ঘরে রাখা বরাহবতারের মূর্তির সামনে বসে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুঁথি পড়ছিলেন শিবেই। ধর্মীয় পুঁথি। রোজ রাতেই পুঁথি নিয়ে বসেন শিবেই। এক-একদিন তা পাঠ করতে করতে ভোর হয়ে যায়। আজও প্রায় তেমনই ঘটল। মাঝ রাত থেকেই বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাতি নিভে যাওয়ায় সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। জানলার বাইরে তাকালেন। এতক্ষণে বাইরে আবছা আলো ফুটে যাওয়ার কথা। কিন্তু আজ এখনও অন্ধকার। বৃষ্টি হচ্ছে। সারা রাত পুঁথিতে মগ্ন থাকায় বাইরে কি ঘটছে খেয়াল করেননি তিনি। এসময় রোজ সমুদ্র স্নানে বেরোন শিবেই। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শিবেই একবার ভাবলেন, তিনি আজ আর সমুদ্র স্নানে যাবেন না। কিন্তু এর পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, সমুদ্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক তো আর মাত্র ক'টা দিন। যেখানে তিনি বাকি জীবনটা কাটাবার জন্য যাচ্ছেন, সেখানে সমুদ্র নেই। তিনি আর শুনতে পাবেন না তার উদাত্ত আহ্বান। এই সমুদ্র তীরেই তো তিনি জন্মেছেন, বড় হয়ে উঠেছেন, সমুদ্রর পাড়েই কোনও একদিন খেলার ছলে প্রথম বালি দিয়ে তৈরি করেছিলেন কোনও স্থাপত্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আজ যে তাঁকে স্থপতি হিসাবে সারা উৎকল চেনে, তার আঁতুড় ঘরও তো ওই সমুদ্র তট। আর যে ক'টা দিন তিনি এ গ্রামে আছেন সে ক'টা দিন অন্তত সমুদ্র সান্নিধ্যে

BanglaBook.org

রাখবেন নিজেকে। ওই তো বজ্রপাতের শব্দ ছাপিয়ে শঙ্খনাদ শোনা যাচ্ছে। সমুদ্র তাকে ডাকছে। পুঁথিগুলো যত্ন করে শালুতে বাঁধলেন শিবেই। তারপর সেগুলোকে লুকিয়ে ফেললেন বরাহবতারের মূর্তির পাদমূলের গোপন খোপে। ঘর ছেড়ে বেরোলেন শিবেই সান্তারা। বৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে তিনি এগোলেন সমুদ্রের দিকে।

তিনি যখন সমুদ্র তটে পৌঁছলেন তখন অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এলেও বৃষ্টি আরও বাড়ল। তার সাথে মুহুর্মুহু বজ্রপাত। সমুদ্রর রূপ দেখে চম্‌কে উঠলেন শিবেই। কালনাগিণীর লক্ষ ফণার মতো ফুঁসে উঠে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তটে। বিদ্যুৎ চমকে সমুদ্রের দূরবর্তী অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সেখানে এক একটা ঢেউ যেন পর্বত সমান উঁচু হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। যেন মহাপ্রলয় শুরু হবে এখনি! শিবেই দক্ষ সাঁতারু। কিন্তু সমুদ্রের এই ভয়ানক রূপ দেখে তটে দাঁড়িয়ে শিবেই ভাবতে লাগলেন তিনি জলে নামবেন, নাকি ফিরে যাবেন? তটেও এভাবে বৃষ্টির মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। বাতাসের প্রবল ঝাপটা ছিটকে ফেলে দিতে চাইছে তাকে।

শেষ পর্যন্ত ফেরারই পথ ধরতে যাচ্ছিলেন তিনি, ঠিক এই সময় তড়িৎ শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। আর সেই আলোতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। পাড়ের থেকে কিছুটা দূরেই ঢেউয়ের মাথায় একটা ছোট্ট নৌকা! উত্তাল তরঙ্গরাশি যেন তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। বিস্মিত শিবেই আবছা আলোতে ভালো করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন নৌকাটিকে। একবার ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড়ের কাছাকাছি চলে আসছে নৌকাটা, তার পরই আবার পালটা ঢেউ তাকে মাঝ সমুদ্রে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কার নৌকা? কোনও পরিত্যক্ত নৌকা কী?

হঠাৎই একবার ঢেউয়ের ঝাপটে পাড়ের বেশ কাছাকাছি চলে এল নৌকাটি। সেই মুহূর্তেই আবারও বিদ্যুৎ চমকে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক। শিবেই এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন নৌকার মধ্যে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে একটা হাত! 'কে এমন দুঃসাহসী! কিন্তু ও যেই হোক ওকে বাঁচাতে হবে। নইলে সমুদ্র গ্রাস করে নেবে ওকে!'—এ কথাটা ভাবতে শিবেইয়ের যে ক'টা মুহূর্ত লাগল তার মধ্যেই আবার পালটা ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকাটা দূরে সরে যেতে লাগল।

শিবেই আর দেরি করলেন না। নৌকায় যে আছে তাকে বাঁচাবার জন্য

BanglaBook.org

ঝাঁপ দিলেন জলে। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। নৌকাটা সমুদ্রে হারিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু নৌকাতে যে ছিল তাকে শেষ পর্যন্ত পাড়ে তুলে আনতে সক্ষম হলেন শিবেই। তিনি তাকে পাড়ে এনে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎই যেন স্তিমিত হয়ে এল দুর্যোগ। বৃষ্টি ধরে এল। আকাশে মেঘ সরে গেল। দিনের প্রথম সূর্যকিরণ স্পর্শ করল মাটিতে যে অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছে তাকে। ছোট্ট একটা ছেলে! যেন এক ঘুমন্ত দেবশিশু। বুকের মধ্যে সে আঁকড়ে ধরে আছে একটা পুঁটলি। কে ও? কোথা থেকে এলো?' পুঁটুলিটা সরিয়ে বিস্মিত শিবেই কান পাতলেন তার বুকে। হ্যাঁ, প্রাণ এখনও আছে! শিবেই আর দেরি না করে ছেলেটাকে আর পুঁটলিটা উঠিয়ে নিয়ে রওনা হলেন বাড়ির দিকে।

এমনিতেই সারাদিন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোন না শিবেই। একলা বসে পুঁথি পড়েন বা ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে বসে থাকেন বরাহবতারের মূর্তির সামনে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুধু মাঝে মাঝে তাঁকে উঠতে হয়েছে পালঙ্কে শোয়ানো ছেলেটার অবস্থা দেখার জন্য। সারাটা দিন কেটে গেল। বাইরে সন্ধ্যা নামবে। শাঁখের আওয়াজ আর ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পুঁথি ছেড়ে উঠে কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বালালেন শিবেই। ঠিক সেই সময় একটা শব্দ শুনে তিনি দেখলেন সারাদিন পর অবশেষে চেতনা ফিরে পেয়েছে ছেলেটা। খাটে বসে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শিবেইয়ের দিকে। তিনি প্রদীপ নিয়ে খাটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছেলেটার ঠোঁট মৃদু মৃদু কাঁপছে। অস্পষ্ট স্বরে সে প্রথমে বলল, 'আমার পুঁথি? পুঁথিগুলো কোথায়?'

'কীসের পুঁথি? শিবেইয়ের পরক্ষণেই খেয়াল হল ছেলেটার সেই পুঁটলিটার কথা। কুলুঙ্গিতে সেটা রাখা আছে। শিবেই অবশ্য খুলে দেখেননি ওর ভিতর কি আছে। ব্যাপারটা অনুমান করে কুলুঙ্গির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে শিবেই বললেন, 'ওটাই কী খুঁজছ তুমি?'

পুঁটলিটা দেখামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল ছেলেটার চোখ-মুখ। মাথা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিল, হ্যাঁ ওটাই। তারপর সে জানতে চাইল 'এটা কোন জায়গা?'

শিবেই জবাব দিলেন, 'এ গ্রামের নাম রঘুরাজপুর।'

'রঘুরাজপুর! আমারতো যাওয়ার কথা ছিল চন্দ্রভাগার তটে।' নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা। তবে 'চন্দ্রভাগার তট' কথাটা কানে গেল শিবেইয়ের। একটু চমকে উঠলেন তিনি।

BanglaBook.org

শিবেই এবার তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়? ওরকম ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সমুদ্রে কি খেয়ালে নৌকো নামিয়েছিলে তুমি?'

ছেলেটা জবাব দিল, 'আমার বাড়ি পার্বতীপুর। নৌকো যখন নামিয়ে ছিলাম তখন সমুদ্র শান্তই ছিল। মাঝপথে ঝড় উঠল, আমি এখানে চলে এলাম।'

শিবেই বললেন, 'এতটুকু ছেলে, তুমি সমুদ্রে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লে! তোমার নাম কী? কাল সকালে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। নিশ্চয় তুমি পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে আসোনি? তারা জানলে তোমাকে সমুদ্রে নামতে দিতেন না।'

বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা শুনেই ছেলেটার মুখভঙ্গি পালটে গেল। একটু যেন ভয় পেয়ে গেল ছেলেটা। সে প্রথমে বলল, 'আমার নাম ধর্মপদ।' তারপর বলল, 'না, না, আমার নাম ধর্মপদ নয়, শাম্ব। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না। আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাব।'

তার বলার ঢং দেখে শিবেই হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার নাম ধর্মপদ অথবা শাম্ব। এমনকী কৃষ্ণও হতে পারে। তা এখান থেকে তুমি কোথায় যাবে?'

ধর্মপদ জবাব দিল, 'আমি যাব চন্দ্রভাগার তটে সূর্য মন্দিরে।'

চন্দ্রভাগার সূর্য মন্দির! এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন শিবেই। ও মন্দিরের সঙ্গে এ ছেলের কী সম্পর্ক?' তিনি বললেন 'ওখানে যাবে কেন? কী আছে ওখানে?'

ধর্মপদ জবাব দিতে গিয়েও সতর্ক হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না, ব্যাপারটা এই লম্বা সাদা দাঁড়িওলা লোকটাকে বলা ঠিক হবে কিনা? গঙ্গাপদ গম্ভীরভাবে শুধু জবাব দিল, 'ওখানে আমার একটা মস্ত দরকার আছে।

শিবেই ধর্মপদর পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, 'তোমার ইচ্ছা না হলে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে ব্যক্ত করার দরকার নেই। তবে তুমি তো সেখানে যেতে পারবে না। শুধু মাত্র কুষ্ঠরোগীদের সে জায়গাতে স্নান করতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন মহারাজা। মন্দির নির্মাণ যতদিন না সম্পন্ন হচ্ছে ততদিন সেখানে অন্য কারও যাওয়া নিষেধ। নরসিংহদেবের আদেশ। ধরা পড়লে শূলে চড়ানো হবে তাকে।'

BanglaBook.org

কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে গেল ধর্মপদর মুখ। সে বলে উঠল, 'আমি কী তবে সেখানে যেতে পারব না?'

শিবেই তার কথার জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি শুনতে পেলেন বাড়ির সদর দরজাতে কে যেন ঘা দিচ্ছে। ধর্মপদকে সে ঘরেই থাকতে বলে শিবেই কে এসেছে দেখতে গেলেন।

সদর দরজা খুলতেই তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করল চাদর মুড়ি দেওয়া একজন। নিজেই সে তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। শিবেই চিনতে পারলেন তাকে। দেবদত্ত। নরসিংহদেবের দরবারে সে তাম্বুল ভৃত্য। অর্থাৎ পান সাজে। দেবদত্ত শৈশবে মাতৃহারা হয়। তার পিতা বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। সহায় সম্বলহীন বালক দেবদত্ত এক সময় ভিক্ষা করত জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। শিবেই যখন মন্ত্রী ছিলেন সে সময় তিনি রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে মাহারাজার দরবারে ভৃত্যের কাজে লাগিয়ে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। দেবদত্ত শিবেইয়ের সেই উপকার আজও ভোলেনি। সুযোগ পেলেই সে গোপনে দরবারের নানা খবর দেয় শিবেইকে। ব্যাপারটা যেদিন মহারাজের কানে যাবে, সেদিন নির্ঘাত মুণ্ডু যাবে লোকটার। দেবদত্ত শিবেইকে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'আমি বেশিক্ষণ এখানে থাকব না। গুপ্তচরের দল চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'টা কথা বলেই চলে যাব।'

শিবেই বললেন, 'কী কথা?'

দেবদত্ত বলল, 'মহারাজের দরবারে প্রধান কারিগর বিশু মহারানার ডাক পড়েছিল। তাকে বলা হয়েছে আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমীর মধ্যে যে ভাবে হোক নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। নইলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে বারোশো লোককে। আমি যা বুঝতে পারছি, যা কানাঘুষো শুনছি, তাতে মহারাজ সেখানকার কোনও শিল্পী-মজুরকেই আর জীবিত রাখতে চান না। যাতে তারা অন্য কোনও দেশে গিয়ে অন্য কোনও রাজার নির্দেশে ওরকম আর একটা মন্দির নির্মাণ না করতে পারে সে জন্য। দ্বারোদঘাটনের সময়সীমা এজন্য এগিয়ে আনা হয়েছে যাতে কাজ শেষ না করার অছিলায় সবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। মহাবীর পট্টানায়েক মহারাজকে বলেছেন ওই পাথর বসানোর ব্যাপারটা অন্য লোককে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন।'

দেবদত্তর কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মন্দিরের ভূতপূর্ব প্রধান স্থপতি

BanglaBook.org

শিবেই সান্তারা।

দেবদত্ত এরপর বলল, 'আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে। মহারাজের কেন জানি ধারণা হয়েছে রত্নগিরির বৌদ্ধ শ্রমণরা মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারটা মনে হয় মন্ত্রী মহাবীরই মহারাজের মাথায় ঢুকিয়েছেন। ব্যাপারটা নিয়ে মহারাজ চিন্তিত।'

শিবেই বললেন, 'রত্নগিরির গুহাতে তো সামান্য কিছু শ্রমণ থাকেন। কী-বা ক্ষমতা তাদের। তাদের জন্য এত ভাবনা মহারাজের?'

দেবদত্ত বলল, 'শুনছি চন্দ্রভাগার তটেও নাকি বৌদ্ধদের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। মজুর শিল্পীদের মধ্যেও নাকি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লুকিয়ে আছে। মন্দির চত্বরে নাকি একটা বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছিল কিছুদিন আগে। কয়েকজন সেটা দেখে মহাবীর পট্টনায়েককে খবরটা দেয়। কিন্তু পরে দেখা যায় সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে! এ ব্যাপারটা কতটা সত্যি আমি জানি না। বিশু মহারানাকেও জেরা করা হচ্ছিল এ ব্যাপারে। সে অবশ্য বলল কিছু জানে না।'

শিবেই দেবদত্তর কথা শুনে কী যেন ভাবলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না।

দেবদত্ত এরপর শুধু বলল, 'আপনিও কিন্তু মহারাজের সন্দেহর তালিকায় আছেন। সাবধানে থাকবেন।

দরজা খুলে দেবদত্ত মিলিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে।

৫

কালো পাথরটাকে দড়ি বেঁধে টেনে ওপরে তোলা হচ্ছে। দুপো মজুর চিৎকার করছে হেঁইও-হেঁইও করে। মাথার ওপর চড়া রোদ। নেংটি পরা মানুষগুলোর কালো অঙ্গ ঘামে ভিজে চকচক করছে। যেন তারা সঞ্চরনশীল কালো পাথরের মূর্তি। বিশু নীচে দাঁড়িয়ে কাজের তদারকি করছে। চিৎকার করে মজুরদের কাজের নির্দেশ দিচ্ছে। তার দেহও ঘামে ভেজা। মজুরদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বিশুকে উঁচু মন্দিরে বেশ কয়েকবার ওঠা-নামা করতে হয়েছে। বিশু যেখানে দাঁড়িয়ে, তার কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমানের প্রধান

BanglaBook.org

স্থপতি মহাবীর। ছত্রধর ছাতা ধরে আছে। সঙ্গে দুজন রক্ষী।

দড়ির টানে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বড় পাথরটা মন্দির শীর্ষের ওপর দিকে উঠছে আর হৃৎস্পন্দন বাড়ছে সকলের। মহাবীরও তিক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মন্দিরশীর্ষের দিকে। তার মুখভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে না কী ভাবছে সে।

একটা থাক, দুটো থাক, তিনটে থাক, এভাবে এক সময় পাথরটা মন্দিরের প্রায় মাথায় পৌঁছে গেল। নিস্তব্ধ চারপাশ। উত্তেজনায় মজুররা পর্যন্ত হাকডাক বন্ধ করে দিয়েছে। পাথরের ঘসটানির শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। মন্দির শীর্ষে শূন্য স্থানটায় বেশ কয়েকটা নারকেল গাছের গুঁড়ি পাতা হয়েছে। ওগুলো পুলির কাজ করবে। শেষ পর্যন্ত সেই পুলির ওপর তুলে ফেলা হল পাথরের চাতালটাকে। এবার ওই কাঠের গুড়িগুলো পাথরের নীচ থেকে সরিয়ে নিলেই মন্দির শীর্ষে খাঁজে খাঁজে বাসে যাবে পাথরটা।

সে কাজও শুরু হল। একটা একটা করে পুলিগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঢালু কাঠের পাটাতন বেয়ে নীচে এসে পড়ছে সেই গুঁড়িগুলো। পাথরের চাতালটা ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে মন্দিরের মাথায়। এক-একটা গুঁড়ি নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠতে লাগল বিশু মহারানার ঠোঁটে। আর ক্রমশ শক্ত হতে লাগল মহাবীর পট্টনায়েকের চোয়াল।

শেষ পুলিটাও এক সময় পাটাতন বেয়ে নীচে নেমে এল। বিশু দেখতে পেল মন্দির শীর্ষে পাথর বসানোর কাজ যারা করছিল তাদের মধ্যে একদম ওপরে যে ছিল জয়ের আনন্দে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুক্তি! মুক্তি! কাজটা করতে পেরেছে তারা। দীর্ঘ বারো বছরের বন্দি জীবন থেকে এবার মুক্তি পাবে সবাই। মাথার ওপরেই ওই বিরাট আকাশের নীচে কোথাও আছে এদের ফেলে আসা ঘর। সেখানে ফিরে যেতে পারবে তারা। মুহূর্তের জন্য হয়তো তাদের চোখে ফুটে উঠল তাদের পরিজনদের মুখগুলো।

মন্দিরের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা বিশুও উল্লাসে এবার লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল মন্দিরের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো যেন একসঙ্গে কেঁপে উঠল, আর তার পরক্ষণেই একটা ঘরঘর শব্দ। দুটো লোক টাল খেয়ে ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান,

BanglaBook.org

প্রচণ্ড শব্দে মন্দির শীর্ষে সদ্য বসানো বিরাট চুম্বকটা ভেঙে খানখান হয়ে নীচে পড়তে শুরু করল। মাটি কেঁপে উঠল ধসে পড়া প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে লাগল সবাই। ধুলোর ঝড়ে মিশে যেতে লাগল মানুষের আর্তনাদ।

এক সময় সব শব্দ থেমে গেল। চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভাঙা পাথরের টুকরো। আর তার নীচে চাপা পড়া কিছু মানুষের রক্তস্নাত নিথর দেহ। চত্বরেরই একপাশে মাথা নীচু করে বসে আছে বিশু আর তার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের প্রধান স্থপতি মহাবীর পট্টানায়েক। পাগড়ির কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে আছেন তিনি। সেটা ধুলো থেকে বাঁচার জন্য নাকি উল্লাস গোপন করার জন্য তা একমাত্র তিনি জানেন। ভালো করে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে সঙ্গীদের মন্দির চত্বর ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন। এবারও যে পাথরটা বসানো গেল না এ খবরটা মহারাজ নরসিংহদেবকে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জানাতে হবে।

বিশুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুহূর্তের জন্য একবার থামলেন মহাবীর। বিশুর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'আর কিন্তু মাত্র পাঁচটা দিন মাঝে বাকি রইল। আমি এবার একেবারে মহারাজকে সঙ্গে নিয়েই আসব তিনদিন বাদে। সঙ্গে সম্ভবত জহ্লাদও আসবে।'

মহাবীর পট্টানায়েক এরপর রওনা হয়ে গেলেন শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে।

সূর্য মাথার ওপর থেকে এক সময় পাটে নেমে এল। দিন শেষের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে বিষণ্ণ মন্দির চত্বরে। পাথর কী কাঁদে? তা ঠিক জানা নেই কারও। তবে মন্দির থাকে দাঁড়িয়ে থাকা সদা হাস্যময়ী সুরাসুন্দরীর ঠোঁটেও আজ যেন বিষাদের ছাপ। নিশ্চুপ মজুরদের ছাউনিগুলো। তারা সবাই উপস্থিত হয়েছে চন্দ্রভাগার তীরে বালুতটে। সার সার চিতা সাজানো হয়েছে। নদীর ধারে। তাতে সযত্নে তোলা হয়েছে সেইসব শিল্পী মজুরদের— যারা মুহূর্তের জন্য মন্দির শীর্ষে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু-হাত প্রসারিত করে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেছিল। সত্যিই চির মুক্তি পেল তারা। চিতায় তোলার আগে চন্দ্রভাগার জলে স্নান করানো হয়েছে তাদের। পরানো হয়েছে নতুন পট্টবস্ত্র, কপালে এঁকে দেওয়া হয়েছে চন্দনের টিকা। কিন্তু এত বিষণ্ণতার মধ্যেও শেষ বিকালের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চিতায় শায়িত মানুষগুলোর মুখ। বিশুর মনে হল সে মানুষগুলো যেন বলছে, 'আমরা

BanglaBook.org

মরিনি। আমরা সেই ময়দানবের অনুচর, যারা বানিয়েছিলাম অলকাপুরী, আর বানালাম এই সূর্য-মন্দির। আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী। আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব সূর্য মন্দিরের প্রতিটা স্তম্ভ, খিলান, সোপান শ্রেণিতে আঁকা ওই মূর্তিগুলোতে।

দেহগুলো মুখাগ্নি করা হল। করল অন্য মজুররাই। যারা মুখে আগুন দিল তার কেউই ঘুমিয়ে থাকা মানুষদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু দীর্ঘ বারো বছর তারা হাসি-কান্নায়, সুখে-দুঃখে একসঙ্গে কাটিয়েছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিলতিল করে গড়ে তুলেছে এই অদ্ভুত মন্দির।

চিতা জ্বলে উঠল। চন্দ্রভাগার তীরে অন্ধকার নামল। চিতার লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে বিশুর মনে হল, শেষ পর্যন্ত যদি মন্দিরের মাথায় পাথরটা বসানো না যায় তা হলে কী হবে? বিরাট পাথর কেটে চারটে টুকরো বার করা হয়েছিল। তার আর একটা টুকরো মাত্র অবশিষ্ট আছে। ওটাই এখন একমাত্র সম্বল। হাতে মাত্র তিনটে দিন। মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যু পরোয়ানা। মৃত্যু মানুষের জীবনের অন্তিম সত্য ঠিকই, আজ হোক আর কাল, তাকে, এই কারিগর-শিল্পী-মজুরদের একদিন মরতে হবে। কিন্তু পাথরটা যদি বাসানো না যায় তবে মরেও শান্তি পাবে না কেউ। পাথর না বসালে বিগ্রহ স্থাপিত হবে না এ মন্দিরে। মহারাজের নির্দেশে হয়তো ধ্বংস করা হবে এ মন্দির, অথবা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হবে, তারপর একদিন জঙ্গল বা বালিরাশি মুছে দেবে এ মন্দিরকে। ব্যর্থ হবে এতগুলো মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম, স্বপ্ন সাধনা, আত্মবলিদান। চন্দ্রভাগার নির্জন তটে চাঁদের আলোয় অভিশপ্ত যক্ষের মতো একবুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ঘুরে বেড়াবে এই বারোশো মানুষের প্রেতাত্মা।

বিশু মহারানা এ মন্দিরের প্রধান কারিগর। সে নিজেও গ্রাম থেকে অনেককে সংগ্রহ করে এনেছিল তার সহকর্মী হিসাবে। তাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বৃদ্ধ পিতামাতাদের হাহাকার কি অভিসম্পাত হয়ে বর্ষাবে না বিশুর ওপর? শেষ চেষ্টা আর একবার অবশ্যই করবে বিশু। কিন্তু তা যদি ব্যর্থ হয়। তিন বারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর কারিগরদের মনোবল আজ এমনিতেই ভেঙে গেছে। কী হবে তাহলে?

চাঁদ ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে চন্দ্রভাগার আকাশে। জ্বলন্ত চিতা থেকে আতস বাজির মতো ফুলকি উঠছে, বাতাসে ছাই হয়ে মিশে যাচ্ছে

BanglaBook.org

দেহগুলো। ভাবতে ভাবতে বিশুর এবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক জনের কথা। শিবেই সান্তারা। এ মন্দিরের ভূতপূর্ব প্রধান স্থপতি। যে রচনা করেছিল এ মন্দিরের নকশা। এ মন্দিরের নব্বই শতাংশ তো তার হাতেই গড়া। মহাবীর পট্টানায়েক তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মন্দিরের উচ্চতা কিছুটা কমিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্য সবকিছু আগের নকশা অনুসারেই তৈরি। এই দুঃসময় শিবেই কী পারবেন কোনও উপায় বাতলাতে?

কিছুক্ষণ ভাবার পর বিশুর মনে হল, পারলে শিবেই হয়তো পারবেন কোনও পথ দেখাতে। কিন্তু তাহলে এখনই রওনা দিতে হবে তাকে। যাতে রাত শেষেই আবার ফিরে আসা যায় মন্দিরে। দুটো তেজি ঘোড়া আছে এখানে। এদের এ জায়গায় আনা হয়েছিল যাতে শিল্পীরা তাদের সামনে রেখে গড়ে তুলতে পারে মন্দিরের অশ্বমূর্তিগুলো। চাঁদের আলোতে নদীর চড়ায় চরে বেড়াচ্ছে তারা। বিশু আর সময় নষ্ট করল না। নদী পেরিয়ে ঘোড়ায় অনেকটা পথ যেতে হবে, আবার ফিরতেই হবে। একটা ঘোড়া আনিয়ে তাকে নৌকায় চাপিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করল। এপাড়ে তার সঙ্গীরা যখন চিতার ছাই ধোয়ার জন্য জল ঢালছে, তখন ওপাড়ে বিশু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল শিবেই সান্তারার খোঁজে।

৬

রোজকার মতো এদিন রাতেও বরাহবতারের মূর্তির সামনে পুঁথি খুলে বসেছিলেন শিবেই সান্তারা। কিন্তু মাঝরাত হয়ে গেলেও কিছুতেই যেন পুঁথিতে মন বসাতে পারছেন না তিনি। পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। আরও একটা দিন কেটে গেল। কিন্তু ছেলেটার সম্বন্ধে তার মুখ থেকে বিশেষ কিছু জানতে পারেননি শিবেই। ছেলেটা যেন কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে। তবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট, সে যেতে চায় চন্দ্রভাগার তটে, নির্মীয়মাণ সূর্যমন্দিরে। আজ ভোরেই সে ঘর ছাড়তে চাইছিল। বারবার জানতে চাইছিল এ জায়গা থেকে কীভাবে যেতে হয় সেখানে? শিবেই তাকে নিরস্ত করেছেন। মাঝে-মাঝেই নরসিংহদেবের সেনারা টহল দিয়ে আসে সেখানে। তা ছাড়া গুপ্তচরেরাও ঘুরে বেড়ায়। ওই নিষিদ্ধ তটে ছেলেটা যদি কোনওভাবে ধরা

BanglaBook.org

পড়ে, তবে তার সমূহ বিপদ। বালক বলে তাকে রেহাই দেবে না সেনারা। মহারাজা সেনাদের সে রকমই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শিবেই বুঝতে পারছেন না তাকে নিয়ে তিনি কী করবেন? আর ক'দিন পরই তো তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে চিরদিনের মতো এগ্রাম এরাজ্য ছেড়ে দূরে এক জায়গার উদ্দেশ্যে। যেখানে এক পিপুল গাছের নীচে হাজার বছর আগে কোনও একদিন, কোনও এক রাজপুত্র...।

ঘুমে জাগরণে আজকাল সে জায়গার আহ্বানই শুনতে পান শিবেই। জীবনের আর যে ক'টা দিন বাকি আছে তা সেই পিপুল গাছের পাদমূলেই কাটাবেন তিনি। পুঁথি পাঠ করতে বসে ছেলেটার কথাই বারবার ঘুরে ফিরে আসছে শিবেইয়ের মনে। কোনও গূঢ় রহস্যের টানে ছেলে যেতে চাইছে ওই নিষিদ্ধ তটে?

পুঁথিতে মনোসংযোগ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সেগুলো বেঁধেছেঁদে যথাস্থানে রেখে দিলেন তিনি। শিবেই এরপর তার শয়ন কক্ষের দিকে বিশ্রাম নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও রাত আর বেশি বাকি নেই। ভোর রাতেই তাকে সমুদ্র স্নানে যেতে হবে। হঠাৎ সদর দরজার দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ। আর তার পরই কে যেন মৃদু ঘা দিল দরজাতে! কে এল? দেবদত্ত? নাকি কোনও ছদ্মবেশী গুপ্তচর? যেমন আগেও একবার এসেছিল?

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ঠিক তখনই তিনি শুনতে পেলেন, ওপাশ থেকে একজন চাপাস্বরে ডাকছে, 'শিবেই সান্তারা আছেন? আমি বিশু মহারানা...।'

বিশুকে ঘরে নিয়ে এলেন শিবেই। ঘাম ঝরছে তার শরীর বেয়ে। মুখে উৎকণ্ঠার স্পষ্ট ছাপ। উড়নির কাপড়ে ঘাম মুছে করজোড়ে শিবেইকে প্রণাম জানিয়ে বিশু একটু ইতস্তত করে বলল, 'বড় বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।'

'কী বিপদ?'

'বিশু বলল, 'মন্দির শীর্ষে ওই চুম্বক পাথরটা বসাতে গিয়ে আজও ব্যর্থ হলাম। আপনি যদি এ ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন—'

শিবেই জবাব দিলেন, 'আমি সাহায্য করব কেন? আমিতো আর ওই মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে নেই। সব দায়িত্ব মহাবীর পট্টানায়েকের।' স্পষ্ট

BanglaBook.org

অভিমানের সুর ধরা দিল শিবেই সান্তারার গলায়।

বিশু বলল, 'তা ঠিক। তবে সবাই জানে আর আপনিও জানেন যে মহাবীর পট্টানায়েক মন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু স্থপতি হিসাবে খুব সাধারণ মানের। এ সমস্যার সমাধান করা তার কর্ম নয়।'

'তবুও তো মহারাজ নরসিংহদেব তাঁর ওপরই প্রধান স্থপতির দায়িত্ব সমর্পন করলেন!'

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মহারাজ নরসিংহদেবের নির্দেশ আগামী শুক্লা সপ্তমীর মধ্যেই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। নইলে প্রাণদণ্ড হবে সবার। হঠাৎ তিনি এভাবে কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন কেন বুঝতে পারছি না!

শিবেই বললেন, 'নরসিংহদেব চান না যে কারিগর শিল্পীর দল কেউ জীবিত থাকুক। যাতে এ মন্দিরের আদলে অন্য কোথাও কোনও মন্দির নির্মাণ না হয়। অননুকরনীয় হয়ে থাকবে এ মন্দির। নির্মাণ কার্য তো প্রায় নব্বই শতাংশ সম্পন্ন। শুধু মন্দির শীর্ষে ওই পাথর আর তার ওপর স্বর্ণ কলস বসানো বাকি। এ কাজ তিনি তারপর দ্রুত কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। সে জন্য তিনি সংক্ষিপ্ত সময় সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এটা গেল একটা দিক, এ ছাড়া নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করতে চাওয়ার পিছনে আরও কয়েকটা গুরত্বপূর্ণ কারণ আছে। এ মন্দিরে যত তাড়াতাড়ি তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ততই তাঁর মঙ্গল।'

'সেসব কারণ কী?'

শিবেই বললেন, 'প্রধান কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। আমাদের রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্র হল শ্রীক্ষেত্রের মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে জগন্নাথ দর্শনে। রাজকোষও পরিপুষ্ট হয় তাতে। কিন্তু ইদানীং ওই মন্দিরে নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোটাই চলে গেছে মোহন্ত ও পাণ্ডাদের হাতে। মন্দির সংক্রান্ত পাণ্ডারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও মাথা গলাতে শুরু করেছে। ক্ষমতার রাশ চলে যাচ্ছে তাদের হাতে। তাই মহারাজ নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র তৈরি করতে চাইছেন। সেখানে এই পাণ্ডারা থাকবেন না। নরসিংহদেবের সেই নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র হবে ওই সূর্যমন্দির। মন্দির-ধর্ম-রাজনীতি এ রাজ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ওই মন্দিরকে সামনে রেখে নিজের ক্ষমতা প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবেন মহারাজ। খর্ব করবেন পান্ডাদের কর্তৃত্ব।'

BanglaBook.org

বিশু একটু বিস্মিত ভাবেই বলে উঠল, 'সূর্যমন্দির শিল্প সুষমার দিক থেকে শ্রীক্ষেত্র মন্দিরের চেয়ে অনেক ভালো ঠিকই, কিন্তু মানুষ প্রধানত মন্দিরে আসে তার ধর্মীয় মাহাত্মের ওপর আস্থা রেখে, শিল্পের ব্যাপারটা পরে আসে। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে স্বয়ং বিষ্ণু অবস্থান করছেন। শতশত বছর ধরে সে মন্দিরের নাম লোকে জানে, সেখানে যাওয়া-আসা করে। চন্দ্রভাগার তটে আমরা যে মন্দির নির্মাণ করছি সে মন্দির কীভাবে তার স্থান নেবে?

শিবেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, নিতে পারে। যদি সে মন্দিরে অলৌকিক কোনও ব্যাপার ঘটে। এমন ব্যাপার যা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবে ভক্তবৃন্দ। তাহলে সে মন্দিরের দেব মাহাত্ম্য দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী ছুটে আসবে সেখানে। এমনকী তা হয়তো ম্লান করে দেবে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য।'

বিশু, শিবেই সান্তারার কথার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শিবেই ধীরে ধীরে বললেন, 'যে কালো পাথরটা বসানো নিয়ে এত সমস্যা, সে পাথর বহু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে সিংহল থেকে আনানো হয়েছে এক বিশেষ কারণে। তোমাকে একবার আমি বলেছিলাম যে ওই পাথরের সঙ্গে গর্ভগৃহে যে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে তার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। ব্যাপারটা আজ তোমাকে বলি। গর্ভগৃহে সূর্যমূর্তি শূন্য মার্গে অবস্থান করবে মাথার ওপরের ওই চুম্বক পাথরের আকর্ষণে। যে ঘটনা ভূ-ভারতে আগে কেউ কোনওদিন দেখেনি। পাথরের তৈরি মূর্তি বাতাসে ভাসবে এ ব্যাপারটা ভাবতে পারো! দেবতা যে জাগ্রত এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে। শ্রীক্ষেত্রের এক গোপন জায়গাতে সে মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। মূর্তির ভিতরে পোরা আছে লৌহপিণ্ড। তাই মূর্তি আকর্ষিত হবে মাথার ওপর চুম্বক পাথরের দ্বারা। আর সেই আকর্ষণে মূর্তিটা যাতে গর্ভগৃহর মাথায় না গিয়ে ঠেকে তাই ঝুলন্ত সূর্যমূর্তির বেদি একটা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকবে মাটির সঙ্গে। তবে তাতে কোনও যায় আসে না, মহারাজ সূর্যদেবকেও বেঁধে রাখতে পারেন এ খবর প্রচারিত হলে নরসিংহদেবের খ্যাতি-প্রতিপত্তিই বৃদ্ধি পাবে। তিনিও দেবতার মতোই ক্ষমতাবান বলে বিবেচিত হবেন।'

BanglaBook.org

ব্যাপারটা এবার বোধগম্য হল বিশুর। অবাক হয়ে সে জিগ্যেস করল, 'আপনি ওই মূর্তির ব্যাপারটা জানলেন কীভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শিবেই জবাব দিলেন, 'জানি, কারণ, নরসিংহদেবের নির্দেশে আমিই ওই সূর্যমূর্তি বানিয়ে ছিলাম।'

শিবেই এরপর বললেন, 'মন্দিরের কাজ দ্রুত শেষ করতে চাওয়ার পিছনে আরও কয়েকটা কারণও অবশ্য আছে। এই যেমন মহারাজের ধারণা যে বৌদ্ধরা নাকি তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই সূর্যমন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেলে এ রাজ্যে যতটুকু প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মের আছে সেটুকুও খর্ব হবে বলে নরসিংহদেবের ধারণা। তা ছাড়া মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি প্রজাদের ওপর যে কর ধার্য করেছেন তাতে প্রজাদের ক্ষোভ বাড়ছে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলে রাজকোষে আয় বাড়বে, করও প্রত্যাহার করে নেবেন মহারাজা। প্রজাদের ক্ষোভও প্রশমিত হবে। যত দ্রুত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায় ততই মঙ্গল নরসিংহদেবের।'

সব কথা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিশু বলল, 'সব বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি কী করব আপনি আমাকে বলুন? এতগুলো মানুষের জীবন আজ জড়িয়ে গেছে ওই কালোপাথরটার সঙ্গে!'

শিবেই আবার সক্ষোভে বলে উঠলেন, 'না, না, আমাকে আর এ ব্যাপারে জড়িও না। আমি আজ আর ওই মন্দিরের কেউ নই। আমার ডাক এসে গেছে। আর ক'দিনের মধ্যেই আমি চিরজীবনের মতো এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাব।'

বিশুর গলাতেও এবার অভিমান ফুটে উঠল। সে বলল, 'আমি আপনাকে চিরজীবন পিতার মতো শ্রদ্ধা করে এসেছি। তাহলে আমি, প্রধান শিল্পী পুণ্ডরীক, স্তম্ভকার বলরাম, মজুর সর্দার সঞ্জিক, স্থলভদ্র, সূত্রধর দ্বৈপায়ন, কর্মকার জীবক—এরা আপনার কেউ নয়? যারা আপনার নির্দেশে তাদের রক্ত কান্না ঘামের বিনিময়ে তিলতিল করে গড়ে তুলল সূর্য মন্দির তারা আপনার কেউ নয়?'

বিশুর কথার জবাব না দিয়ে শিবেই গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার ধারে। বাইরে চাঁদের আলোতে ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট গ্রামটা। আর তার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রর গর্জন। তার চোখে ভেসে উঠতে লাগল বিশুর বলে

BanglaBook.org

যাওয়া নামগুলোর মুখচ্ছবি। শিবেই প্রায় এক যুগ কাটিয়েছেন এই মানুষগুলোর সঙ্গে। চন্দ্রভাগার চাঁদের নীচে ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে কত সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই মুখগুলোর সঙ্গে। এমনকী বেশ কয়েকবার শিবেইকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল ওরাই।

দুটো ঘটনাতো শিবেইয়ের স্পষ্ট মনে আছে। তখন চন্দ্রভাগার জঙ্গলাকীর্ণ তটে জঙ্গল সাফ করে মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। কাজের তদারকি করছিলেন শিবেই। হঠাৎ শিবেইয়ের সামনে মাটি ফুঁড়ে লেজে ভর করে উঠে দাঁড়াল দশহাত লম্বা এক কালসর্প! মুহূর্তের জন্য সামনে থেকে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শিবেই। কিন্তু মৃত্যু নেমে আসার আগেই সঞ্জীবক লৌহমুষ্টিতে চেপে ধরেছিল সেই রাজসর্পের গলা। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিল সেই উদ্যত মৃত্যুকে। আর একবার ঝড়ের রাতে বজ্রপাতে একটা স্তম্ভ যখন মাথার ওপর ভেঙে পড়ছিল তখন শিবেইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সেই স্তম্ভের নীচে নিজেই চাপা পড়ল বলরাম। বেচারার একটা পা চির জীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেল পাথর চাপা পড়ে।

সূত্রধর দ্বৈপায়ন! অসম্ভব সুন্দর তার গানের গলা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন চাঁদ উঠত চন্দ্রভাগার মাথায় তখন সে চাঁদের আলোয় গান ধরত। অপূর্ব সেই সুর! সারা দিনের ক্লান্তি মুছে যেত সেই সুরে। জানলার বাইরে তাকিয়ে এরকম টুকরো টুকরো নানা স্মৃতি জেগে উঠতে লাগল শিবেই সান্তারার মনে।

শেষপ্রহরে শিয়াল ডাকল এক সময়। ব্যর্থ মনোরথে বিশু বলল, 'তাহলে আমি চলি? ভোর হয়ে আসছে।'

বিশু পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় জানলা থেকে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে শিবেই বললেন, 'ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব। আমাকে দুটো দিন সময় দাও।'

কথাটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিশুর মুখ। সে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয়ই পারবেন। আপনিই বাঁচাতে পারবেন এতগুলো মানুষকে।'

শিবেই বললেন, 'হ্যাঁ। চেষ্টা আমি অবশ্যই করব। তবে তার ফল কী হবে জানি না। দিনের আলোতে যদি একবার মন্দির চত্বরে যেতে পারতাম

BanglaBook.org

তবে ভালো হত। কিন্তু সে পথ বন্ধ। আমার কাছে মন্দিরের একটা নকশা আছে। দেখি যদি সেটা কোনও কাজে আসে।'

বিশুর মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন অনেকদিন ধরেই ছিল। এবার সে ফেরার আগে প্রশ্নটা করেই ফেলল শিবেইকে, 'সবইতো ঠিক চলছিল, তবে হঠাৎ কেন নরসিংহদেব মন্ত্রিত্ব থেকে, সূর্যমন্দিরের প্রধান স্থপতির দায়িত্ব থেকে অপসারিত করলেন আপনাকে? কেন তিনি মন্দির চত্বরে আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন?'

শিবেই জবাব দিলেন, 'মন্দির চত্বরে নাকি একটা বুদ্ধ মূর্তির দেখা মিলেছিল—এ কথা নিশ্চয়ই তুমিও শুনেছ। নরসিংহদেবের দৃঢ় বিশ্বাস ওই মূর্তিটার ব্যাপারটার সঙ্গে আমি কোনওভাবে জড়িত। এটা অবশ্য তার মাথায় ঢুকিয়েছেন মন্ত্রী মহাবীর পট্টনায়েক। তাই নরসিংহদেব আমাকে পদচ্যুত করলেন। এমনকী ওই বুদ্ধ মূর্তি আমার বাড়িতে আছে কিনা, আমি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কিনা তা বুঝতে এখানেও হানা দিয়েছিল মহাবীরের গুপ্তচরেরা।'

বিশু মৃদু হেসে বলল, 'তা ওরা এখানে এসে কী পেল? এই বরাহবতারের মূর্তিটা? শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে বৌদ্ধ ঠাওরালো!'

শিবেইয়ের ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুর বরাহরূপী মূর্তি। দাঁতে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন তিনি। প্রদীপের আলো এসে পড়েছে মূর্তিটার গায়। সেদিকে তাকিয়ে শিবেই প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ, এই মূর্তিটা দেখেই তারা ফিরে গেল। বুদ্ধ মূর্তি দেখতে পায়নি তারা।' এরপর অনেকটা স্বগোতক্তির সুরে শিবেই বললেন, 'তবে কোনও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিন্তু বুদ্ধরূপে এই বরাহবতার মূর্তিকেও পূজা করতে পারে। বরাহবতার আর বুদ্ধ—এরা দুজনেই তো বিষ্ণুর দশবতারের দুই রূপ। ঠিক যেমন মৎস, কূর্ম, নরসিংহ, বামন, রাম, বলরাম ইত্যাদি অবতারেরা বিষ্ণুরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।'

আলো ফুটব ফুটব করছে. বিশু আর দাঁড়াল না। তাদের দুজনের মধ্যে শেষ কথা হল—একরাত পর মধ্যরাতে তারা দুজন সাক্ষাত করবে চন্দ্রভাগার তটে এক গোপন জায়গাতে।

বিশু চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবেইও বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্র স্নানের জন্য।

BanglaBook.org

শিবেই যখন স্নান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তখন সকালের নরম আলো মাটি স্পর্শ করেছে, সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতেই শিবেই দেখলেন ঘর থেকে বেরিয়ে সেই কাপড়ের পুঁটলি বগলে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। শিবেইকে দেখে সে বলল, 'তুমি যদি পথ বাতলে দাও তবে আমি এখনই সেই মন্দিরের পথে রওনা হতে পারি। নইলে পথে নেমে পথ জেনে নিতে হবে। দুটো দিন তো এখানে কেটে গেল।'

শিবেই বললেন, 'পথ আমি এখনই বাতলে দিতে পারি, কিন্তু সে মন্দিরে তুমি যেতে পারবে না। সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে সৈন্যরা তোমাকে নিয়ে কারগারে পুরবে। তারপর বিচার হবে। তাতে প্রাণদণ্ডও হতে পারে।'

ছেলেটা শিশুসুলভ ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'তাহলে কী সেখানে যাওয়া হবে না আমার? কতদূর থেকে আমি সেই মন্দিরে যাওয়ার জন্য এসেছি। না, না, সেখানে আমি যাবই।'

শিবেই তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ঠিক আছে তুমি সেখানে যাবেখন। কিন্তু আজকের দিনটা এখানে থেকে যাও। দেখি কৃষ্ণ তোমাকে সেখানে পৌঁছবার কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। তেমন হলে আমিই তোমাকে পৌঁছে দেব সেখানে। ধর্মপদ বা শাম্ব নামে নয়, তাকে তিনি কৃষ্ণ নামেই ডাকতে শুরু করেছেন। ধর্মপদর গাত্রবর্ণ, অঙ্গ সৌষ্ঠব, মুখশ্রী, কেশদাম,—এ সবই যেন বালক কৃষ্ণকেই মনে করিয়ে দেয়। সে যেন তারই প্রতিরূপ। তাই শিবেই এই নামকরণ করেছেন।

শিবেইয়ের আশ্বাস শুনে মুহূর্তের মধ্যে যেন ধর্মপদর মনের মেঘ কেটে গেল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলল, 'তাহলে যাওয়া যাবে সেখানে! তুমি নিয়ে যাবে? তুমি কোনওদিন গেছ সেখানে? দেখেছ সেই মন্দির?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শিবেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আমি দেখেছি

BanglaBook.org

সেই মন্দির। অমন সুন্দর মন্দির শুধু কলিঙ্গ কেন, সারা দেশে কোথাও কেউ বানায়নি!'

শিবেইয়ের কথা শুনে হাঁ হয়ে গেল ধর্মপদর মুখ। আনন্দ উচ্ছল বড়বড় চোখে শিবেইয়ের দিকে তাকিয়ে কি একটা কথা যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। শিবেই আর এ প্রসঙ্গে কথা বাড়ালেন না। ঘরে ঢুকে একসঙ্গে ফলাহার সেরে শিবেই শয়নকক্ষের পালঙ্কের নীচ থেকে একটা ছোট তোরঙ্গ বার করলেন। তার ভিতর থেকে বেরোল লাল শালুতে মোড়া কিছু তালপাতা। সেগুলো নিয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে বরাহবতারের মূর্তির সামনে মাটিতে পাশাপাশি রাখতে শুরু করলেন। বাইরে থেকে আসা সূর্যালোকে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটির ওপর তালপাতার চাদরে ফুটে উঠল বিরাট এক নকশা-আঁকজোক। সূর্যমন্দিরের নকশা! শিবেইয়ের আঁকা নকশা। বিভোরভাবে সেই নকশায় ডুবে গেলেন শিবেই।

সময় এগিয়ে চলল। একবারের জন্যও সেই নকশা থেকে চোখ সরালেন না শিবেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কিনা? কেন এমন হচ্ছে? কেন মন্দিরের মাথায় বসানো যাচ্ছে না পাথরটা?'

সূর্য ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠল, তারপর নামারও পথ ধরল। নকশার প্রতিটা অংশ, ভিত্তিপ্রস্তর, স্তম্ভ, প্রাচীর, ছাদের অংশ বারবার দেখছেন, মনে মনে হিসাব করছেন। কিন্তু কোথাও কোনও গরমিল পাওয়া যাচ্ছে না! এক সময় তিনি একটু হতাশভাবে স্বগোতক্তি করে উঠলেন, 'ব্যাপারটা ধরতেই পারছি না! নকশায় তো কোনও ভুল নেই।'

তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, নকশা বা হিসাবে কোনও ভুল নেই।'

চমকে উঠে শিবেই পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলেন ছোট্ট ছেলেটা কখন যেন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তাকিয়ে আছে নকশাটার দিকে। জটিল নকশা এসব, ছেলেটার বোঝার বিষয় নয়। কিছুটা না বুঝেই কথাটা বলল ভেবে নিয়ে শিবেই হেসে বলল, 'এটা একটা জটিল নকশা। এটা কীসের আঁকজোঁক তুমি জানো?'

ছেলেটার মুখের কোনও ভাবান্তর হল না। শিবেইয়ের পাশে বসতে বসতে সে বলল, 'জটিল ঠিকই, কিন্তু আমিও অনেক্ষণ ধরে দেখছি নকশাটা। এটা একটা মন্দিরের নকশা। এরপর সে শিবেইয়ের পাশে বসে নকশাটার

BanglaBook.org

ওপর আঙুল চালিয়ে বলে যেতে লাগল নকশাটার খুঁটিনাটি। একদম নির্ভুলভাবে। তার কথা শুনে শিবেইয়ের মনে হতে লাগল, তিনি নন, এ নকশাটা যেন এঁকেছে এই ছেলেটাই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে নকশাটা নিয়ে কথা বলার শেষে ছেলেটা শিবেইয়ের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি যা বললাম তা ঠিক তো? ছেলেটার মুখে ফুটে উঠেছে কৌতুকের হাসি। শিবেইয়ের অবশ্য তখন কথা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। মন্দির নির্মাণের প্রারম্ভে, কাজ চলার সময় তার সহকারী স্থপতিদের, এমনকী রাজদরবারের বাস্তুকারদের এই নকশা বোঝাতে ঘাম ছুটে গেছিল শিবেইয়ের। তবু মন্দির মাথা তোলার আগে নকশা সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়নি তাদের। শিবেই ছাড়া এ নকশা বোঝে শুধু বিশু মহারানা। তবে গাণিতিক হিসাবটা সে তেমন ধরতে পারে না। কিন্তু এই ছোট্ট ছেলেটা!

শিবেই বলে উঠলেন, 'ঠিক, ঠিক একদম ঠিক! কিন্তু এ জটিল নকশা পড়তে শিখলে কীভাবে?'

ধর্মপদ তাঁর কথার জবাব না দিয়ে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে তার পুঁটলিটা এনে শিবেইয়ের হাতে তুলে দিল। শিবেই অবাক হয়ে গেলেন। পুঁটলিতে রাখা আছে বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা নকশা আর পুঁথি। ছেলেটা সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আমার বাবার আঁকা। তবে আমি এর চেয়ে ভালো নকশা এঁকেছি। আমার গ্রামের লোকে আমাকে ডাকে 'খুদে বিশ্বকর্মা' বলে।

শিবেই বললেন, 'সেগুলো কোথায়?'

ধর্মপদ বলল, 'ওসব আমি তোমাকে দেখাতে পারব না। সমুদ্রের জলে ধুয়ে গেছে সব। আমার মা মন্দিরে কাজ করেন। আমার কালি পাতা কেনার পয়সা নেই। আমি যে সব আঁকি সমুদ্রের পাড়ে বালিতে। তবে নকশা আঁকার থেকেও বেশি ভালো লাগে আঁক কষতে। কঠিন কঠিন সব আঁক আমি নিমেষেই করে দিতে পারি।'

ধর্মপদ ক্রমশই বিস্মিত করে তুলছে শিবেইকে। তার কথা শুনে শিবেই তাকে একটু পরীক্ষা করতে দোয়াত কলম আর পাতা এনে কয়েকটা শক্তশক্ত স্থাপত্যবিদ্যা সংক্রান্ত আঁক কষতে দিলেন। সত্যি অতি দ্রুত সেই আঁক নির্ভুলভাবে কষে দিল ধর্মপদ। শিবেই জড়িয়ে ধরলেন তাকে। এ যে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

BanglaBook.org

ধর্মপদ এবার তাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার নকশাটা কোন মন্দিরের? তুমি এঁকেছ এটা?'

বিহ্বল শিবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, আমারই আঁকা। এটা চন্দ্রভাগার সূর্য মন্দিরের নকশা। কিছু কাল আগে পর্যন্ত আমিই ছিলাম ওই মন্দিরের প্রধান স্থপতি ও উৎকল নরেশ নরসিংহদেবের মন্ত্রি। আমার নাম শিবেই সান্তারা।'

ধর্মপদও এবার চমকে উঠল। সে-ও বলে ফেলল, 'তুমি বিশু মহারানা বলে সেখানে কাউকে চেনো? আমি তাকেই খুঁজতে যাচ্ছি সেখানে?'

'বিশু মহারানা! কেন?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে ধর্মপদ জবাব দিল, 'তিনি আমার বাবা। যদিও আমরা কেউ কাউকে কোনওদিন চোখে দেখিনি। তিনি গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পর আমার জন্ম হয়। ফিরে আসবেন বলে তিনি আর ফিরে আসেননি। আমাদের খুব কষ্ট। আমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।' ধর্মপদর গলা ভেঙে এল কান্নাতে।

শিবেই হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর যেন তাঁর কাটতেই চায় না। বিশু মহারানার সন্তান! নির্বাকভাবে তিনি চেয়ে রইলেন ধর্মপদর অশ্রুসজল চোখের দিকে। শিবেইয়ের মনে হল তিনি ধর্মপদকে তখনই বলে দেন, 'হ্যাঁ আমি চিনি তাকে। আমি যে তার পরম সুহৃদ। কালই তো এসেছিল আমার বাড়িতে। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে পাশের ঘরে?' কিন্তু কথাগুলো তাকে বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে কথাগুলো জানাতে পারলেন না তিনি। তাঁর মাথায় এল, এই মুহূর্তে ছেলেটাকে ব্যাপারটা জানালে ছেলেটার বিপদ ঘটতে পারে। এমন হল বাপ-ছেলের এই সাক্ষাৎ তাদের কারও পক্ষেই শুভ হল না। মন্দিরের মাথায় পাথরটা বসানোর ওপর তার ও অন্য মজুরদের জীবন নির্ভর করছে। মৃত্যু তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে এখন ধর্মপদর সাক্ষাৎ করিয়ে দিলে কেউ কাউকে হয়তো কাছ ছাড়া করতে চাইবে না। রাজক্রোধ বিষধর সর্প বা বজ্রপাতের চেয়েও ভয়ংকর। বিশুরা ব্যর্থ হলে রাজা নরসিংহদেবের খড়্গ হয়তো এই নিস্পাপ শিশুর ওপরই নেমে আসবে। বিশু হয়তো অন্যদের কথা না ভেবে পালিয়ে গেল মন্দির ছেড়ে। কী হবে তাহলে?

এ চিন্তাগুলো মাথায় আসতেই সংযত হয়ে গেলেন শিবেই। লম্বা সাদা

BanglaBook.org

দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'নামটা শোনা শোনা লাগছে। বিশু নামের অনেকেই আছে সেখানে। তাদেরই কেউ হবে। খুঁজে বার করতে হবে তাকে। তবে মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ না হলে এই মুহূর্তে তাকে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় কেন?' জানতে চাইল ধর্মপদ।

শিবেই বললেন, 'একে তো সে জায়গাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার ওপর এখন তারা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে আছে। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ, শুধু তার মাথার ওপর একটা পাথর বসানো বাকি। যার ওপর বসবে মঙ্গল কলস। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও সে কাজে মজুররা ব্যর্থ হচ্ছে। ভেঙে পড়ছে পাথর। আর তিনদিন মাত্র সময় দিয়েছেন নরসিংহদেব। পাথরটা তার মধ্যে বসাতে না পারলে বারোশো মানুষের প্রাণদণ্ড দেবেন তিনি।'

তার কথা শুনে নীরব হয়ে গেল ছেলেটা।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ভাবে বসে রইল দুজনে। দিন ঢলে আসছে। আরও একটা দিনও কেটে গেল! শিবেই এক সময় বেশ অসহায় ভাবে বললেন, 'যদি সে জায়গাতে দিনের বেলায় যেতে পারতাম তাহলে হয়তো ত্রুটিটা ধরা পড়ত। কিন্তু সে উপায়তো নেই।'

ধর্মপদ এবার হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি যাব সেখানে। আমি ঠিক খুঁজে বার করব ব্যাপারটা।'

চমকে উঠলেন শিবেই সান্তারা।

ছেলেটা আবারও বলে উঠল, 'তুমি আমাকে রাস্তা বাতলে দাও। নইলে আমি নিজেই যাব। অতগুলো মানুষের জীবন! আমি ঠিক পারব। পারবই। তুমি দেখে নিও।' নিছক আবেগ নয়, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বরে, বার বার সে একই কথা বলতে লাগল। তাকে কী বলবেন তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না শিবেই। কিন্তু একটা জিনিস তিনি ইত্যিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন, এ বালক আর পাঁচজন বালকের মতো সাধারণ কেউ নয়। বাস্তুবিদ্যার ব্যাপারে এ বালকের বুৎপত্তি সংশয়াতীত। নইলে ওই কঠিন আঁক সে কিছুতেই কষতে পারত না।'

ছেলেটা বার বার অনুরোধ করে যেতে লাগল শিবেইকে। বারবার এক কথা শুনতে শুনতে শিবেইয়ের এক সময় মনে হল ছেলেটাকে দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? অবিশ্বাস্য ব্যাপারও তো কখনও-সখনও ঘটে।

BanglaBook.org

কিন্তু তিনি ছেলেটাকে কী ভাবে পাঠাবেন ওই মন্দির চত্বরে। ধরা পড়লে তো সমূহ বিপদ।

শিবেই ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ এ ব্যাপারে একটা বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। তিনি ধর্মপদকে বললেন 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি সেখানে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে বরাহদেবের মূর্তির পা ছুঁয়ে কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?' ধর্মপদ জানতে চাইল।

শিবেই বললেন, 'সেখানে গিয়ে তুমি আমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আত্মপরিচয় গোপন রাখবে। নাম বলবে কৃষ্ণ। কোনওভাবেই তোমার পিতাকে খোঁজার চেষ্টা করবে না। দৈবাত যদি তার সাথে সাক্ষাত ঘটে তাহলেও নিজের পরিচয় ব্যক্ত করবে না। শুধু তোমার বাবা নন, আরও বারোশো মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে ব্যাপারটার সাথে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বিশু মহারানার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হবে।'

ধর্মপদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন তাহলে বরাহদেবতার কাছে যাওয়া যাক।'

অন্ধকার নেমে আসছে। সে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দুজনে দাঁড়াল মূর্তির সামনে। ধর্মপদ আর শিবেই দুজনেরই কুলদেবতা তিনি। বহু যুগ আগে একবার দানব হীরণ্যায় পৃথিবীকে স্থানচ্যুত করে সমুদ্রে ডুবিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য ভগবান বিষ্ণু বরাহ রূপে আবির্ভূত হন। হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করে ভয়ংকর দানব হীরন্যায়কে পরাজিত করে বরাহদেবতা তার দাঁতদুটিতে পৃথিবীকে তুলে ধরে আবার স্বস্থানে স্থাপন করেন। রক্ষা পায় মানবকুল। বরাহদেবতার এই মূর্তিটির ঊর্ধ্বমুখ। দু-দাঁতে সে ধারণ করেছে পৃথিবীকে। ওপরের দুটো হাতে ধরা শঙ্খ-চক্র। অন্য দুটি হাতের একটিতে ধরা তরবারি, অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা। তাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর ধর্মপদ করজোড়ে বলল, 'হে দেবতা আমি যেন বাঁচাতে পারি আমার বাবাকে আর অন্যদের।'

শিবেইয়ের হঠাৎ মনে হল বাচ্চা ছেলেটার কথা শুনে পাথরের মূর্তির ঠোঁটের কোণে মুহূর্তের জন্য হাসি ফুটে উঠল। তিনিও ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ছেলেটা যেন সফল হয়ে ফিরে আসতে পারে। সকলকে তুমি রক্ষা করো।'

BanglaBook.org

শিবেই এরপর ধর্মপদকে বললেন, 'অন্ধকার আর একটু গাঢ় হলেই আমরা রওনা হব। তার আগে তোমাকে আমি সাজিয়ে দেব।'

৮

রৌদ্রকরোজ্জ্বল মন্দির-প্রাঙ্গণ। সূর্যের তেজ আজ প্রচণ্ড। চত্বরের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মজুর-কারিগরের দল। ওই পাথরটা মন্দির শীর্ষে বসানো ছাড়া অন্য কাজ আর বাকি নেই। কিন্তু প্রধান কারিগর বিশু মহারানা কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। চূড়ান্ত চেষ্টা করার আগে কাজটা যাতে সফল ভাবে করা যায় তা নিয়ে ভাবছে সে। নরসিংহদেব যা ঘোষণা করেছেন তা সবাইকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে বিশু। খবরটা শুনে শ্রমিক কারিগররা কেউ উত্তেজিত, কেউ বিমর্ষ। কারো কারো ধারণা পাথরটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিকই বসানো যাবে, এক যুগ পরে আবার ঘর ফিরতে পারবে তারা। যারা দেবতার জন্য এত সুন্দর মন্দির নির্মাণ করল, দেবতা কি তাদের ওপর রুষ্ট হতে পারেন? আবার আর একদলের ধারণা ওই পাথর এবারও বসানো যাবে না। তিনবার চেষ্টা করেও যখন তারা ব্যর্থ হয়েছে তখন মৃত্যুই ভবিতব্য।

আসলে এ এক অভিশপ্ত তট। যেখানে এলে কেউ ফেরে না। জঙ্গল সাফ করে যখন মাটি খুঁড়ে মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরগুলো স্থাপন করা হচ্ছিল, তখন মাটির নীচ থেকে প্রচুর মানুষের হাড়গোড় কঙ্কাল বেরিয়েছিল। সেগুলোকে কুষ্ঠরোগীদের কঙ্কাল বলা হলেও, আসলে নাকি ছিল বৌদ্ধদের কঙ্কাল। এক সময় নাকি রাজাদেশে বৌদ্ধ নিধন কালে ধৌলিপাহাড় থেকে শয়ে শয়ে বৌদ্ধ শ্রমণদের ধরে এনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল এই নির্জন তটে।

এ দুই দল ছাড়া আরও একটা দল অবশ্য আছে। সংখ্যায় অবশ্য তারা খুবই নগণ্য। নিস্পৃহ একদল মানুষ। তারা যেন কোনও ভিন গ্রহের জীব। তাদের আনন্দ নেই, দুঃখ নেই, খিদে নেই, তেষ্টা নেই, ঘর নেই, ঘরের ফেরার তাড়াও নেই। অবশ্যই তাদের এক সময় সব কিছু ছিল, নইলে তারা এল কোত্থেকে! বছরের পর বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম, বন্দিজীবন,

BanglaBook.org

প্রখর সূর্য আর তটের নোনা বাতাস তাদের সব কিছু কেড়ে নিয়েছে।

চত্বরের এক কোণে একটা স্তম্ভের আড়ালে বসে ছিল বিশু। মন্দিরের মাথার দিকে তাকিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছিল সে। আজ রাতে নদীর পাড়ে মন্দিরের পিছন দিকে আসার কথা শিবেই সান্তারার। তিনি কি পারবেন পথ দেখাতে? আর মাত্র দুটো দিন সময় আছে হাতে। এতগুলো মানুষের জীবন নির্ভর করছে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর।

একলা বসে ভাবছিল বিশু। হঠাৎ সে চোখ নামিয়ে নীচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল একটা বাচ্চা ছেলেকে। কে ও? এখানে তো কোনও ছেলের আসার কথা নয়! ছেলেটা যেন পা মেপে মেপে এগোচ্ছে যেদিকে মন্দিরে ওঠার সোপানশ্রেণি সে দিকে। বিশু দেখতে লাগল ছেলেটাকে। বিশু তাকে খেয়াল না করলেও আগেই অনেকে খেয়াল করেছে তাকে। কোথা থেকে যেন ভোরবেলাই হাজির হয়েছে মন্দির চত্বরে। কুষ্ঠরোগী। সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা। স্থানে স্থানে কাপড়ের পটি জড়ানো। নোংরা পোশাক। কুষ্ঠরোগীদের যেমন দেখতে হয়। তার কাছে ঘেসেনি কেউ। একবার তার দিকে তাকাবার পর আর গুরুত্বও দেয়নি। রোগমুক্তির জন্য মাঝে মাঝে কুষ্ঠরোগীরা চন্দ্রভাগার তটে স্নান করতে আসে। একমাত্র তাদেরই প্রবেশাধীকার দিয়েছেন নরসিংহদেব। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধর্মীয় বিশ্বাসকে রদ করার সাহস স্বয়ং রাজারও নেই। এ বাচ্চাটা সেরকমই কেউ হবে। চন্দ্রভাগার জলে স্নান করতে এসে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে নিশ্চয়ই।

বিশু অবশ্য দূর থেকে এতসব বুঝতে পারল না। ছেলেটা পায় পায় সোপান শ্রেণির স্তম্ভর আড়ালে অদৃশ্য হতেই কৌতূহলবশত সে-ও চত্বর পেরিয়ে এগোল সেদিকে।

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে মন্দিরের মাথার দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করছিল ছেলেটা। বিশু সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই পায়ের শব্দ পেয়ে একটু চমকে উঠে পিছনে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এসে বিশুর সামেন দাঁড়িয়ে অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার ঢঙে বলল, 'নদীতে স্নান করতে এসেছি, মন্দির দেখতে পেয়ে চলে এলাম।'

বিশু ভালো করে দেখল ছেলেটকে। কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ এক বালক। হাতে, পায়ে, আঙুলে কাপড় মোড়া। তার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘা। কিন্তু ছেলেটার মুখশ্রী খুব সুন্দর। গভীর কালো মায়াময় দুটো চোখ, টিকালো

BanglaBook.org

নাসা, পাতলা ঠোঁট। ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন বিচিত্র অনুভূতি হল বিশুর। যে অনুভূতি আগে তার কোনও দিন হয়নি। সে তাকে জিগ্যেস করল, 'তোমার নাম কী, কোথায় থাকো?'

ধর্মপদ জবাব দিল, 'আমার নাম কৃষ্ণ। শ্রীক্ষেত্র থেকে আসছি। আমি জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে ভিক্ষা করি।'

বিশু মনে মনে বলল, 'কৃষ্ণর মতোই মুখশ্রী।'

ছেলেটা এরপর প্রশস্ত সিঁড়ির প্রবেশ মুখের দুপাশে যে বিরাটকায় দুটো একইরকম মূর্তি বসানো আছে তাদের দেখিয়ে বলল, 'এগুলো তো বড় অদ্ভুত মূর্তি। মানুষ শুয়ে আছে, তার ওপর হাতি বসে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সিংহ! এর মানে কী?'

বিশু একটু হেসে বলল, 'এই মূর্তিগুলো দিয়ে একটা বিশেষ ব্যাপার বোঝানো হচ্ছে। শুয়ে থাকা মানুষটা হল জৈনধর্মের প্রতীক, তার ওপর হাঁটুভেঙে বসা হাতিটা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক, আর সবার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সিংহটা হল হিন্দুধর্মের প্রতীক। এ মূর্তির মধ্যে বোঝানো হচ্ছে সমাজে সবার ওপরে হিন্দুধর্মের স্থান। বৌদ্ধ ও জৈনরা হিন্দুদের পদানত।'

বিশুর কথা শুনে ছেলেটা মন্তব্য করল, 'মূর্তিগুলো দেখতে সুন্দর কিন্তু এভাবে কোনও ধর্মকে বড়, কোনও ধর্মকে ছোট দেখানো ঠিক নয়।'

তার কথা শুনে বিশু একটু চমকে উঠল। ঠিকইতো বলেছে ছেলেটা। প্রথম অবস্থায় এ মূর্তিগুলো এখানে ছিল না। মহাবীর পট্টানায়েক দায়িত্ব নেওয়ার পর তার নির্দেশেই মূর্তিগুলো বানিয়ে এখানে বসানো হয়। বিশু মনে মনে ভাবল, 'এই ছোট্ট ছেলেটা যা বোঝে তা যদি মহাবীর পট্টানায়েক বা মহারাজ নরসিংহদেব বুঝতেন তবে ভালো হত।'

কয়েকটা কথাতেই ছেলেটাকে বেশ ভালো লেগেছে বিশুর। সে তাকে বলল, 'চলো তোমাকে কিছু খাবার দিই।'

ছেলেটা সম্মতি প্রকাশ করে বিশুকে অনুসরণ করল। বিশু তাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ আগে যে স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। তিরিশ হাত উঁচু পাথরের স্তম্ভের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুর বাহন গড়ুর মূর্তি। ছেলেটা সেখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'খুব রোদ্দুর এখানে।'

মন্দির শীর্ষের একটা আবছা ছায়া, স্তম্ভের কিছুটা তফাতে এসে থেমে গেছে। ছেলেটা একবার তাকাল সেই ছায়ার দিকে, আর একবার স্তম্ভের

BanglaBook.org

দিক। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'নকশাতে স্তম্ভটা আছে।'

স্তম্ভের পিছনে ঝুড়িতে রুটি রাখা ছিল। কয়েকটা রুটি ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে বিশু বলল, 'তুমি কিছু বললে?'

সে জবাব দিল, 'না, কিছু না। আচ্ছা, এখন সময় কত?'

বিশু জবাব দিল, 'এক প্রহর। কেন?'

ধর্মপদ বলল, 'আমাকে ফিরতে হবে। কিন্তু তার আগে মন্দিরের ওপরে একবার উঠব?'

বিশু বলল, 'বিগ্রহ কিন্তু এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইচ্ছা হলে ওঠো। তবে সাবধানে ওঠো। তুমি তো ঠিক হাঁটতেও পারো না। দেখলে মনে হয় পা মেপে মেপে হাঁটছ। ধর্মপদ জবাব দিল, 'পায়ের আঙুল ক্ষয়ে গেছে তো তাই ওভাবে হাঁটি।'

বিশুর থেকে বিদায় নিয়ে ছেলেটা এরপর এগোল মন্দিরের দিকে, আর বিশুও এগোল অন্যত্র।

ধর্মপদ ওপরে উঠে মন্দিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। একবার সবার অলক্ষে মন্দিরের মাথায়ও উঠল। মেলাবার চেষ্টা করল মন্দিরের সঙ্গে নকশাটা। যে নকশাটা তার মাথায় আঁকা হয়ে আছে। তারপর মন্দির থেকে নীচে নেমে চত্বর ছেড়ে নদীর দিকে এগোল। সেখানে পৌঁছে কেউ তাকে অনুসরণ করছে নাকি দেখে নিয়ে নদীর পাড় ধরে মোহানার দিকে হাঁটতে লাগল ধর্মপদ। খুঁড়িয়ে বা পা মেপে নয়। অতি দ্রুত। ধর্মপদ যেখানে গিয়ে থামল সে জায়গাটা জঙ্গলাকীর্ণ। নদী আর কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিয়ে মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। জঙ্গলের জন্য সে জায়গা দেখা না গেলেও জলোচ্ছাসের শব্দ কানে আসছে। শিবেই ভোর রাতে এখানেই তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন, আবার মধ্য রাতে তাকে নিতে আসবেন। একটা গাছের কোটোর থেকে ধর্মপদ বার করল একটা বেশ বড় কাপড়ের থলি। তার মধ্যে রাখা আছে মন্দিরের সেই নকশাটা, দোয়াত-কলম, তালপাতা, আর অবশ্যই তার নিজের পুঁথির পুঁটলিটা। সেটা সে হাতছাড়া করতে চায়নি। নকশাটা সামনে বিছিয়ে দোয়াত-কলম আর পাতা নিয়ে বসল সে। তারপর আঁক কষতে শুরু করল। মাঝে মাঝে নদীতটের বালিতেও কাঠি দিয়ে নানা নকশা, গাণিতিক হিসাব করল সে। অনেকক্ষণ ধরে ধর্মপদর হিসেবনিকেশ চলল, যতক্ষণ না দিনের শেষে সূর্য ডুব দিল চন্দ্রভাগার জলে।

BanglaBook.org

ধর্মপদ এরপর সবকিছু গুটিয়ে গাছের কোটরে লুকিয়ে ফেলে গুড়িতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। মন্দিরটা সে পা মিলিয়ে মেপে দেখেছে, অনেকক্ষণ ধরে হিসাবও কষেছে। কিন্তু কিছুতেই ত্রুটিটা ধরতে পারছে না। কিন্তু ভুলতো কোথাও কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেন বসছে না পাথরটা। ধর্মপদ মন্দিরের মাথায় উঠে দেখে এসেছে জায়গাটা। আপাত দৃষ্টিতে তার চোখে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়েনি। তবে?

নদীতটের অন্ধাকারের দিকে তাকিয়ে ধর্মপদ ধাঁধার উত্তর খুঁজতে লাগল। এক সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মন্দিরে যে লোকটা তাকে রুটি দিল তার কথা। ধর্মপদর বেশ লেগেছে লোকটাকে। কেমন দয়ালু স্বভাবের। দেখতে কী সুন্দর! যেন পাথর কুঁদে তৈরি করা মূর্তি। আচ্ছা তার বাবাও কী ওই লোকটার মতো সুন্দর? ধর্মপদর সে সময় খুব ইচ্ছা হচ্ছিল সে লোকটা বিশু মহারানা নামের কাউকে চেনে কিনা তা জিগ্যেস করে। কিন্তু তাকে সে কথা জিগ্যেস করা হয়নি। ধর্মপদর মনে পড়ে গেছিল তার প্রতিজ্ঞার কথা। ধর্মপদ মনে মনে বলল, 'হে বরাহদেব, হে প্রভু জগন্নাথ, আমাকে পথ দেখাও।'

৯

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ধর্মপদ। ঘুমের মধ্যে তার চোখে ছেড়া ছেড়া স্বপ্ন মেঘের মতো এসে ভিড় করতে লাগল। সে কখনও দেখতে পেল তাদের পাতায় ছাওয়া ছোট্ট কুটীরে তার মা সুদত্তাকে, কখনও তার গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই আর সঙ্গীসাথীদের মুখ, কখনও-বা সে দেখল, নির্জন বালুতটে কাঠি দিয়ে আঁক কষছে, কখনও আবার তার চোখে ভেসে উঠল ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত উত্তাল সমুদ্র।

কিন্তু এরপর সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দির চত্বরে। তার সঙ্গে দেখা হল সেই লোকটার। সে লোকটা তাকে রুটি দেওয়ার জন্য স্তম্ভর কাছে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল সে লোকটা? হঠাৎ মাথার ওপর থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। ধর্মপদ ওপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, স্তম্ভর মাথায় যেখানে গড়ুরদেবের মূর্তি

BanglaBook.org

বসানো ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বরাহদেবতা। ধর্মপদ তাকাতেই তিনি বললেন, 'কিরে পাথরটা বসানোর কোনও উপায় পেলি?'

ধর্মপদ হাত জোড় করে বলল, 'না ঠাকুর, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

দেবতা বললেন, 'খুব সোজা ব্যাপার, এই যে আমি দাঁতের ওপর এতবড় পৃথিবীকে বসিয়ে রেখেছি তা কি পড়ছে? আর তোরা ওই ছোট্ট পাথরটা বসাতে পারছিস না? ভালো করে তাকা, সমাধান তোর চোখের সামনেই আছে।'

'সামনেই আছে! কোথায় তা?'

বরাহদেব হেসে বললেন, 'আছে। তুই খেয়াল করছিস না। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা তুই সূর্যদেবের পত্নীর নাম জানিস?'

নামটা যেন গুরুমশাইয়ের মুখে শুনেছিল ধর্মপদ। কিন্তু এ সময় কিছুতেই মনে এল না তার। বরাহদেবতা এবার নিজেই উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, 'সূর্যপত্নীর নাম হল, 'ছায়া দেবী।'

'ছায়া দেবী, ছায়া দেবী, ছায়া দেবী...। বলেই যেতে লাগলেন বরাহদেবতা।

আর তার দেখা দেখি ধর্মপদও বলতে লাগল,—ছায়া দেবী, ছায়া দেবী, ছায়া দেবী...।'

অদ্ভুত এক স্বপ্ন! আর এর পরই ঘুম ভেঙে গেল ধর্মপদর। চোখ মেলে সে দেখল চন্দ্রভাগার আকাশে চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় ঝিকমিক করছে নদী তট। কিন্তু তখনও তার কানে অনুরণিত হচ্ছে, ছায়া দেবী!

ধর্মপদ ভাবতে লাগল এ স্বপ্নের মানে কী? ভাবতে ভাবতেই কিছু সময় পর হঠাৎ একটা প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর তখনই সে দেখতে পেল মন্দিরের দিক থেকে নদীর পাড় ধরে এগিয়ে আসছে দুটো ছায়ামূর্তি! কারা ওরা? তারা কিছুটা এগিয়ে আসার পর প্রথমে একজনকে চিনতে পারল সে, তারপর অন্যজনকেও। শিবেই সান্তারা আর মন্দির চত্বরে দেখা সেই লোকটা! ধর্মপদ উঠে দাঁড়াল।

বিশু বেশ অবাক হয়ে গেল ধর্মপদকে দেখে। সে শিবেইকে বলল, 'এই তাহলে আপনার সেই স্থপতি?'

শিবেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ওর নাম কৃষ্ণ। তবে কুষ্ঠ রোগীর বেশটা ছদ্মবেশ।' তারপর তিনি ধর্মপদকে জিগ্যেস করলেন, 'পেলে কিছু?'

ধর্মপদ বলল, 'একটা ব্যাপার একটু খটকা লাগছে। নকশাটা এখনই

BanglaBook.org

একবার দেখতে হবে, আর একটা আঁক কষতে হবে।'

চকমকি পাথর দিয়ে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালানো হল। তার আলোতে নকশা মেলে ধরে আঁক কষতে বসল ধর্মপদ। বিশু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে বুঝতে পারছে না, এই এতটুকু ছেলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে। শিবেই সান্তারার মুখেও উত্তেজনার ছাপ। আঁক কষে চলল ধর্মপদ। এক সময় তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠতে লাগল হাসির রেখা। সে এবার অনুধাবন করল তার স্বপ্নের তাৎপর্য। কেন বরাহদেবতা বার বার বলছিলেন ছায়া দেবী-ছায়া দেবী! স্বপ্নে তিনি সমাধানের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন ধর্মপদকে। ঠাকুর তার প্রার্থনা শুনেছেন। আঁক কষতে কষতে দেবতার উদ্দেশ্যে সে প্রণাম জানাল। তারপর এক সময় শেষ হল তার হিসাব। শিবেই দেখলেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ধর্মপদর মুখ। ধর্মপদ এরপর নকশার একটা অংশ দেখিয়ে তাদের বলল, 'এই হল সেই গড়ুর স্তম্ভ। বেলা এক প্রহরে মন্দির চূড়ার ছায়ার এই স্তম্ভকে অতিক্রম করার কথা। কিন্তু আমি দেখেছি ছায়া স্তম্ভের কিছুটা তফাতে সে সময় আটকে ছিল। নিশ্চয়ই মন্দিরের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়ার ফলে ভর কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়েছে। যে কারণে মন্দির শীর্ষে পাথরটা বসাতে গেলেই ভেঙে যাচ্ছে। উচ্চতা কমানো হয়েছে কী?'

শিবেই ব্যাপারটা কিছুই জানেন না। তিনি তাকালেন বিশুর দিকে। বিশুর চোখেমুখে তখন প্রগাঢ় বিস্ময়। সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। মহাবীর পট্টানায়েক দায়িত্ব নেওয়ার পর তার নির্দেশেই মন্দিরের উচ্চতা তিন মানুষ কমিয়ে দেওয়া হয়। অত উঁচু মন্দির বলে নীচ থেকে দেখে ওই পার্থক্যটা ধরা যায় না।'

ধর্মপদ বলল, 'সামান্য পার্থক্য। কিন্তু ওই পার্থক্যই সব হিসাবের গণ্ডগোল করে দিয়েছে। ওই তিন মানুষ বেঁধে পাথরটা বসানো হলে ঠিক ওটা বসবে। বসবেই।'

শিবেই তার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। উচ্চতা বাড়ালে পাথরটা বসবে। এবার আমি ধরতে পেরেছি ব্যাপারটা। ধূর্ত মহাবীর ইচ্ছা করেই উচ্চতা কমাতে বলেছিল যাতে পাথরটা বসানো না যায়। পরে সে উচ্চতা বাড়িয়ে কালো পাথরটা বসিয়ে মহারাজার কাছে নিজের গৌরব বৃদ্ধি করত। লোকে বলত যে কাজ কেউ করতে পারেনি তা করে দেখালেন মহাবীর। ওর মতো স্থপতি আর উৎকল রাজ্যে কেউ নেই। ওই উচ্চতা

BanglaBook.org

গাঁথতে কত সময় লাগতে পারে?

বিশু বলল, 'সবাই মিলে কাজে নামলে দেড় দিন লাগবে ওই উচ্চতা গেঁথে তার পর ওই কালো পাথরটা বসাতে। পরশু সূর্যাস্তের আগেই সম্পন্ন হবে স্বর্ণকলস বসাবার কাজ। পরদিন শুক্লা সপ্তমীতে গর্ভগৃহে অর্কদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরের নামকরণ করবেন। প্রাণ রক্ষা পাবে বারোশো মানুষের। বারো বছরের বন্দি জীবন থেকে মুক্তি ঘটবে সবার। আমি ঘরে ফিরে যাব...। আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল বিশু মহারানার কণ্ঠ। আর তারপর সে গঙ্গাপদকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ আমি জানি না, তুমি দেবতা না দেবদূত তা আমার জানা নেই। তবে তোমার জন্যই রক্ষা পেতে চলেছে এতগুলো মানুষের জীবন। তুমি যে-ই হও না কেন আমার কাছে তুমি চন্দ্রভাগার চাঁদ! এই বলে বিশু চুমুতে ভরিয়ে তুলল ধর্মপদকে।

এই বারো বছরের ছোট্ট জীবনে ধর্মপদ কোনওদিন বাবার সাহচর্য পায়নি। মা ছাড়া কোনওদিন কেউ তাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেনি, আদর করেনি। নিতান্তই অবহেলায় অনাদরে বড় হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু আজ এই অপরিচিত লোকটার আলিঙ্গনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করল ধর্মপদ। তার যেন মনে হতে লাগল এ লোকটার সঙ্গে তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। এ লোকটা যেন তার স্বপ্নে দেখা বাবার মতো। আর বিশুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাড়ির কথা, সুদত্তার কথা। বিশু যখন বাড়ি ছাড়ে তখন সুদত্তা সন্তান সম্ভবা। যদি তার পুত্র সন্তান হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই সে এতদিনে এই ছেলেটার মতোই বড় হয়েছে। কিন্তু ধর্মপদ বা বিশু মহারানা কেউই তার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারল না অন্যের কাছে। চাঁদের আলোতে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় তারা দুজনে দাঁড়িয়ে রইল। আর শিবেই প্রত্যক্ষ করতে লাগল এই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য।

শিবেই তাদের দুজনকেই অন্যজনের কাছে পরিচয় গোপন রাখতে বলেছেন। শিবেই-এর একবার মনে হল সেই পরিচয় উন্মোচিত করে মিলন ঘটান দুজনের। কিন্তু তারপরই আবার ভাবলেন, শেষপর্যন্ত যতক্ষণ না মন্দিরের ওপর পাথরটা বসছে ততক্ষণ কেউই বিপদ মুক্ত নয়। যদি শেষ মুহূর্তে আবার কোন অঘটন ঘটে যায়? পাথরটা আগে বসানো হয়ে যাক তারপর সত্য উন্মোচন করবেন তিনি।

BanglaBook.org

শিবেই এরপর বিশুকে বলল, 'এবার আমাদের ফিরতে হবে। অনেকক্ষণ হল এসেছি। কেউ দেখে ফেলতে পারে। তবে পরশু রাতে আমি আসব। এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে চন্দ্রভাগার চাঁদের আলোতে শেষ একবার দেখব এই আশ্চর্য সুন্দর মন্দিরকে। আশা করি ততক্ষণে মন্দিরের মাথায় স্বর্ণকলস স্থাপিত হয়ে যাবে।'

বিশু শুনে বলল, 'তাহলে সত্যিই আপনি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

শিবেই বললেন, 'সেদিন মন্দিরে আসার পর এখান থেকে আমি আর ঘরে ফিরব না। এখান থেকেই আমি সে দেশের উদ্দেশে যাত্রা করব। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আর যে ক'টা দিন বাঁচব, সে ক'টা দিন পরম করুণাময়ের আশ্রয়ই কাটাতে চাই। তিনি আমাকে ডাকছেন তাঁর পূণ্য ভূমিতে। যেখানে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। যেখানে সামান্য কীট-পতঙ্গ থেকে মানুষ, সবাই তাঁর আশ্রিত।'

বিশু জানতে চাইল, 'কে সে করুণাময়? কোথায় সেই পূণ্যভূমি?

শিবেই মৃদু হাসলেন। কিন্তু বিশুর কথার জবাব দিলেন না।

বিশু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে। আপনি যদি কৃষ্ণকে আমার এখানে রেখে যান তবে ভালো হয়। যদি পাথর বসাতে আবার অন্য কোনও অসুবিধা হয় তবে ও আমাদের পথ দেখাতে পারবে। ও থাকলে ভরসা পাব আমি।'

বিশুর প্রস্তাব শুনে একটু ভাবলেন শিবেই। কথাটা বিশু ভুল বলেনি। শেষ মুহূর্তে আবার যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়...। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত তো বিশুর কাছেই সমর্পণ করতে হবে ছেলেটাকে। কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে শিবেই ধর্মপদকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কী ইচ্ছা?'

ধর্মপদ একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'আমি এখানেই থাকতে চাই।'

ধর্মপদর থাকতে চাওয়ার কারণটা অবশ্য অনুমান করতে পারলেন শিবেই। সে জানে সে তার বাবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখানেই কোথাও আছে সে। তাই সে থাকতে চাইছে। ধর্মপদর জবাব শুনে শিবেই বললেন,— 'ঠিক আছে ও তাহলে এখানে লুকিয়ে থাক। রাতে ওকে মন্দির চত্বরে কাজের তদারকির জন্য নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু ভোরের আলো ফুটলেই ওকে আবার এখানে লুকিয়ে ফেলবে। যাতে মহাবীর পট্টনায়েক হঠাৎ মন্দির চত্বরে কাউকে পাঠালে সে ওর নাগাল না পায়।'

BanglaBook.org

বিশু বলল, 'আচ্ছা, আপনার কথা মতোই কাজ হবে। কিন্তু কেউ যদি ওর পরিচয় জানতে চায় তবে কী বলব?'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে শিবেই সান্তারা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'বলবে ও কৃষ্ণ। আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ও সমুদ্রর জলে ভেসে এসেছে। আর ওর এ পরিচয় কিন্তু মিথ্যা নয়।'

১০

সমুদ্রের ভোর। শিবেই সদ্য স্নান সেরে উঠেছেন। তার গা থেকে তখন জল ঝরছে। তিনি তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছেন সমুদ্রের বুক থেকে। ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। সমুদ্র আজ শান্ত সমাহিত ধ্যানি বুদ্ধর মতো। ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে পায়ের কাছে। তটে কোনও লোকজন নেই। মাঝ সমুদ্র থেকে রাতে ফিরে এসে দু-একটা জেলে ডিঙি শুধু কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে কিছু দূরে। এ দেশের মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের নাড়ির টান। জন্ম থেকে মৃত্যু সঙ্গ দেয় এই মহাসমুদ্র। এই সমুদ্রতেই একদিন ভেসে এসেছিলেন শ্রীজগন্নাথ। নিম কাষ্ঠ রূপে। শিবেই সেই নাড়ির টান ছিন্ন করে আজ যাত্রা করবেন নতুন এক দেশে। সেখানে সমুদ্র নেই। তাই আজ শেষ বারের মতো তিনি বেশ অনেক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন অসীম জলরাশির উদ্দেশ্যে। তারপর এক সময় আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। লোকজনের আনাগোনা শুরু হবে এবার। শিবেই এরপর আর পিছনে না তাকিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। সারা রাত ঘুমাননি তিনি, ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন বরাহবতারের মূর্তির সামনে। শেষ রাতে উঠে সমুদ্রস্নানে বেরিয়েছিলেন।

ঘরে ফিরে গোছগাছ শুরু করলেন তিনি। তার ঘরে প্রচুর পুঁথি রাখা আছে। তার মধ্যে থেকে কিছু পুঁথি আলাদা করে রাখলেন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ পুঁথিগুলো অনেকদিন আগে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ধৌলিগুহার ভিক্ষু উপগুপ্ত। নিষিদ্ধ পুঁথি। অনেক যত্নে এ পুঁথিগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন শিবেই। আর একটা পুঁটলিতে নিলেন কিছু শুকনো খাবার, পরিচ্ছদ, দীর্ঘ যাত্রাপথে যেগুলো কাজে লাগতে পারে। তবে আরও একটা জিনিস তাঁকে সঙ্গে নিতে হবে, সেটা অবশ্য রাখা আছে অন্যত্র।

BanglaBook.org

সব কাজ শেষ হলে শিবেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার আগে দেহে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটু ঘুমিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। বিকাল বিকালই ঘর ছাড়বেন তিনি। প্রথমে তিনি যাবেন চন্দ্রভাগার তটে। সেখানে গিয়ে তিনি কৃষ্ণকে সমর্পণ করবেন বিশু মহারানার হাতে। চাঁদের আলোতে শেষ একবার দেখবেন তাঁর স্বপ্ন মন্দির। তারপর সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে পদব্রজে রওনা হবেন তাঁর গন্তব্যে।

শিবেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখছিলেন এক প্রাচীন বটবৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মাথার অনেকটা জায়গা নিয়ে চাঁদোয়া রচনা করেছে গাছের ডালপালা। মাথার ওপর থেকে স্তম্ভের মতো ঝুরি নেমে তার গুড়িটা আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু তার ফাঁক গলে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক উজ্জ্বল আলোক দ্যুতি। যেন কোনও আলোকবৃত্ত অবস্থান করছে সেখানে। জ্ঞানের আলো, নির্মল পবিত্র এক আলোক বৃত্ত। বাতাসে ভাসছে ধূপের মিষ্টি গন্ধ। সে গন্ধ শুচিতা আনে দেহ মনে, মুছে দেয় জাগতিক দীনতা, ক্লেশ। শিবেইয়ের চারপাশ বৃক্ষের পাদমূল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পীত বস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীরা। হাতে ধরা জ্বলন্ত ঘিয়ের প্রদীপ। শান্ত মৃদু স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে—

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি...

শিবেইও তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে চলেছেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...। পালকের মতো হালকা লাগছে শিবেইয়ের শরীর। যতবার তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করছেন ততবারই যেন আরও গভীরে প্রবেশ করছেন এক অনাস্বাদিত, অনাবিল শান্তির জগতে।

হঠাৎ কিসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নের রেশ কাটতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তাঁর। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। এই মাঝ দুপুরে আবার কে এল? শিবেই এরপর শুনলেন লোকটা বলছে, 'শ্রীশ্রী প্রভু জগন্নাথের চরণে সেবা লাগে, গৃহস্থের মঙ্গল হোক।'

'ও ভিখারি!' একটু আশস্ত হলেন শিবেই, ঘরে অনেক চাল আছে, যাওয়ার আগে লোকটাকে দেওয়া যাবে।' এই ভেবে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে

BanglaBook.org

সদর দরজা খুললেন। বাইরে রোদের মধ্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন। রোদের তাপ থেকে বাঁচতে মুখে কাপড় জড়িয়ে রেখেছে সে। শিবেই তাকে বললেন, 'ভিতরে এসো। অনেক চাল আছে।'

লোকটা ভিতরে ঢুকেই শিবেইকে বলল, 'দোর বন্ধ করুন। আমি দেবদত্ত। গুপ্তচরদের চোখ এড়াতে ছদ্মবেশে এসেছি।'

সদর দরজা বন্ধ করে শিবেই দেবদত্তকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে গেলেন। দেবদত্তর চোখেমুখে উত্তেজনার স্পষ্ট ছাপ। সে বলল, দরবারে খবর পৌঁছেছে আজ ভোরেই চন্দ্রভাগার মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সেই কালো পাথরটা অবশেষে বাসানো গেছে। নরসিংহদেব সেই মন্দিরের মাথায় বসানোর জন্য কীর্তিধ্বজ পাঠালেন সেখানে। আগামীকাল তিনি সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন। মন্দিরের নাম করণ করা হয়েছে 'কোনার্ক'। দরবার ভাঙতেই আমি আপনাকে খবরটা দিতে ছুটে এসেছি। কিন্তু...।'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই এ পর্যন্ত শুনে মন্দিরের প্রাক্তন প্রধান স্থপতি শিবেই আবেগে আপ্লুত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'অবশেষে আমার স্বপ্ন সফল হল। সব আশঙ্কা দূর হল। লোকগুলোর জীবন বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত। কত কষ্ট, কত পরিশ্রম সহ্য করে আমরা সকলে মিলে তিল তিল করে গড়ে তুলেছি ওই মন্দির, নিষ্প্রান পাথরের বুকে জাগিয়ে তুলেছি প্রাণের স্পন্দন। অক্ষয়, অমর হয়ে থাকবে এ সূর্য মন্দির...।'

কিন্তু দেবদত্ত এবার তাকে শেষ না করতে দিয়ে বলল, 'আমাকে মার্জনা করুন। আগে আমার সম্পূর্ণ কথাটা শুনুন। ভয়ঙ্কর একটা সংবাদ আছে। কাল মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার আগে সম্ভবত বিশু মহারানা সহ সেখানকার সমস্ত শিল্পী, কারিগর, মজুরদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে চলেছেন কলিঙ্গধীপ নরসিংহদেব।'

শিবেই, দেবদত্তর কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগল তাঁর। তারপর তিনি বললেন, 'মন্দির নির্মাণ তো সঠিক সময়ই সম্পন্ন হল। তবে মৃত্যুদণ্ড হবে কেন?'

দেবদত্ত বলল, 'ব্যাপারটার সত্য-মিথ্যা আমি সঠিক জানি না। তবে শোনা যাচ্ছে যে, যে কাজ বারোশো লোক করতে পারেনি তা করে দেখিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে। কীভাবে পাথরটা বসানো যাবে তার উপায় বাতলেছে

BanglaBook.org

ওই ছেলেটাই। আর যার ফলে প্রমাণিত হচ্ছে বিশু মহারানা ও অন্যদের অপদার্থতা অথবা কোনও গুঢ় চক্রান্ত। যে কাজ একজন বাচ্চা করতে পারে তা এতগুলো লোক করতে পারল না কেন? এমনটাই মহারাজের ভাবনা। অবশ্য এর পিছনে আসলে মহাবীর পট্টানায়েকের মস্তিষ্কই কাজ করছে। পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় বিশু মহারানাদের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে সে। তবে ছেলেটার উপস্থিতির ব্যাপারে মহারাজও কিন্তু এখনও নিশ্চিত নন। ওখানে ছোট ছেলে কীভাবে আসবে? আগে তো শোনা যায়নি তার কথা?

ইতিমধ্যে ছেলেটাকে নিয়ে আর একটা খবরও রটতে শুরু করেছে। দিনেরবেলায় তাকে দেখা যায় না। চন্দ্রভাগার চাঁদ উঠলে সে-ও উদয় হয়। আসলে সে নাকি ভগবান কৃষ্ণ। তিনি সমুদ্রর জলে ভেসে এসেছেন পরিত্রাতা হয়ে। মজুর-শ্রমিকদের প্রায় সবাইয়ের তাই বিশ্বাস। মহারাজ কাল মন্দিরে গিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করবেন। রক্তমাংসর কোনও ছেলের উপস্থিতি সেখানে প্রমাণিত হলে সবার প্রাণদণ্ড হবে, নইলে তিনি মুক্তি দেবেন সবাইকে। দরবারে আজ এ কথা ঘোষণা করেছেন মহারাজ।'—একটানা কথা বলে বলে হাঁপাতে লাগল দেবদত্ত।

সব শুনে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন শিবেই। তারপর হতাশভাবে বললেন, 'তার মানে মহারাজ ঠিকই করে ফেলেছেন লোকগুলোকে আর ঘরে ফিরতে দেবেন না!'

দেবদত্ত বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। তবে ছেলেটা যদি ওখানে উপস্থিত না থাকে সে ক্ষেত্রে অবশ্য তখন মহারাজ সবাইকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন।'

শিবেই বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'তখন হয়তো তিনি আর মহাবীর অন্য কোনও অছিলায় মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করবেন।'

দেবদত্ত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ছেলেটার উপস্থিতি প্রমাণিত না হলে এবার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এত সহজ হবে না। কারণ প্রথমত নরসিংহদেব দরবারে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে ছেলেটার উপস্থিতি প্রমাণিত না হলে তিনি মুক্তি দেবেন সবাইকে। আর দ্বিতীয় ব্যাপার হল মহারাজের এই ছেলেটার জন্য মজুরদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা, দরবারের অধিকাংশ লোকই ভালোভাবে নেয়নি। বিশেষত শ্রীক্ষেত্র মন্দিরের প্রভাবশালী মোহন্তদের বেশ কয়েকজন ব্যাপারটাতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নরসিংহদেব বা মহাবীর যদি

BanglaBook.org

কথার খেলাপ করে তবে তারা প্রকাশ্যে মহারাজা নরসিংহদেবের বিরোধিতা শুরু করতে পারে। নরসিংহদেব তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন। তাই ব্যাপারটা অত সহজ হবে না, আচ্ছা আপনার কী মনে হয়, ওই ছেলেটা সত্যি আছে না নেই?'

শিবেই সঠিক উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিলেন, 'হয়তো আছে, হয়তো বা নেই।'

দেবদত্ত বলল, 'কিন্তু ধরুন যদি থেকে থাকে? এমনকী কোনও উপায় নেই যাতে তার থাকাটা না থাকায় বদলে দেওয়া যায়?' আপনি কিছু করতে পারেন এ ব্যাপারে?'

শিবেই যেন তার কথা শুনে একটু চমকে উঠলেন। দেবদত্ত অবশ্য তা বুঝতে পারল না। শিবেই বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার আর কিছু করার নেই। তা ছাড়া আজই আমি পাড়ি দেব অন্য দেশে। সেখানে গিয়ে ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে বাকি জীবনটা কাটাব। মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ।'

দেবদত্ত বলল, 'কাজ শেষ ঠিকই। কিন্তু যে মানুষগুলো বারোটা বছর ধরে আপনারই নির্দেশে ওই অক্ষয় মন্দির গড়ে তুলল, তাদের প্রতিও তো আপনার দায়িত্ব আছে। তারা তাদের জীবন-যৌবন সবইতো সমর্পণ করেছিল আপনাকে। আপনি আজ তাদের ওভাবে ভাগ্যের হাতে ফেলে চলে যাবেন? আমাকে ক্ষমা করবেন, তবু একটা কথা বলি, ওদের এভাবে ফেলে গেলে যে দেবতার চরণে আপনি নিজেকে সমর্পণ করতে যাচ্ছেন তিনি আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করবেন তো? ওইসব হতভাগ্য কারিগর শ্রমিক মজুররা কি দেবতার অংশ নয়?'

দেবদত্তর কথা শুনে এবার স্পষ্টই চমকে উঠলেন শিবেই। তিনি তার কথার কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারলেন না।

দেবদত্ত এরপর ভূমিষ্ট হয়ে শিবেইকে প্রণাম জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি প্রাজ্ঞ। আপনার কাজের দিক নির্দেশ আমার সাজে না। তবু মনের মধ্যে প্রশ্নটা এল, বলে ফেললাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। পরমপ্রভু জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা, আপনার যাত্রা যেন শুভ হয়।'

আর কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দেবদত্ত।

একলা ঘরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন শিবেই। দেবদত্তর বলে যাওয়া

BanglaBook.org

কথাগুলো যেন ভেসে বেড়াতে লাগল ঘরের বাতাসে—'তিনি আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করবেন তো? করবেন তো...

ভাবতে লাগলেন শিবেই। দেবতার ডাক, নাকি এতগুলো মানুষের জীবন কোনটা বড়? এ লোকগুলোকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত সেই বটবৃক্ষর নীচে পৌঁছতে না পারেন তবে? এতদিনের গোপন সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে তাঁর? না, না, এ হতে দেওয়া যাবে না। চন্দ্রভাগার মন্দিরে তিনি যাবেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েই তিনি রওনা হয়ে যাবেন স্বপ্নে দেখা সেই দেশের উদ্দেশ্যে।

দূরে কোনও মন্দির থেকে যেন ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। চিন্তাজাল ছিন্ন হল শিবেইয়ের। বাইরে বেলা পড়ে আসছে, শিবেই এরপর চিরদিনের মতো এঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে শুরু করলেন।

১১

চন্দ্রভাগার চাঁদের আলোয় জেগে আছে নদীতট, মন্দির। তবে মন্দির চত্বরে কেউ নেই, দু-একটা মশাল জ্বলছে শুধু। আজ রাতে সব আলো গিয়ে যেন জড়ো হয়েছে চত্বরের বাইরে মজুর-কারিগরদের শনের কুটীরগুলোর কাছে। মশালের আলোয় আলোকিত সে জায়গা। আজ রাতে তারা কেউ ঘুমায়নি। কাল সূর্য উঠলে এত দিনের বন্দি জীবন থেকে মুক্তি পাবে তারা। চন্দ্রভাগার তটে আজই তাদের শেষ রাত। সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে। মাদলে চাঁটি পড়ছে। মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত মানুষগুলোর সম্মিলিত উল্লাসধ্বনি যেন আকাশের দিকে লাফিয়ে চাঁদকে ছুঁতে চাইছে। বিশু মহারানার মনেও আজ খুশির জোয়ার। সে নাচগানে যোগ না দিলেও নিজের কুটীরের সামনে বসে উপভোগ করছিল আনন্দদৃশ্য। আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল কিছু দূরে চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দিরের দিকে। ওখানেই তো আছে সেই ছোট্ট ছেলেটা। সে মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশু যখনই ছেলেটাকে দেখে তখনই কেন যেন এক অজানা অনুভূতি হয় তার মনে। অনাস্বাদিত এক আনন্দানুভূতি। ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলে বিশুর মনে হয় যে সে এমন কাউকে স্পর্শ করছে যার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। কেন

BanglaBook.org

এমন মনে হয় বিশু তা বুঝতে পারে না।

বিশু মহারানা ইতিমধ্যে ভেবে রেখেছে শিবেই সান্তারার কাছে থেকে পরিচয় জানার চেষ্টা করবেন এই বিস্ময় বালকের। ছেলেটা যদি অনাথ বা পরিজনহীন হয় হবে শিবেই অনুমতি দিলে বিশু নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটাকে। তাকে সে সন্তান স্নেহে প্রতিপালিত করবে। ওর জন্যই রক্ষা পেল এতগুলো মানুষের জীবন। মজুরদের অবশ্য ইতিমধ্যে ধারণা হয়েছে যে ছেলেটা মানুষ নয়, সে সত্যিই কৃষ্ণ। আলো উৎসব মুখরিত পর্ণ কুটীরগুলোর দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগল বিশু মহারানা।

আরও একজন অবশ্য চেয়েছিলেন সেদিকে। গাছের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আনন্দ উচ্ছ্বল মজুর-শ্রমিকরা তাকে খেয়াল করেনি। খেয়াল করেনি বিশুও। কালো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা তার। তিনি শিবেই সান্তারা। শিবেইয়ের পরিকল্পনা ছিল তিনি প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করে কাজ সারবেন। চলে যাওয়ার আগে তাকে এখান থেকে একটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। জিনিসটা সংগ্রহ করে বাচ্চা ছেলেটাকে তার পিতৃপরিচয় জানিয়ে নিঃশব্দে মন্দির চত্বর চিরদিনের মতো ত্যাগ করবেন তিনি। কিন্তু নদী থেকে পাড়ে নেমে তাঁর পুরোনো সঙ্গীসাথীদের শেষ একবার চোখের দেখা দেখার ইচ্ছা সামলাতে পারেননি শিবেই। মন্দিরে না ঢুকে শিবেই সোজা চলে এসেছেন এ জায়গাতে। ওই তো শিল্পী পুণ্ডরীক! স্তম্ভকার বলরাম! মজুর সর্দার সঞ্জীবক! কত চেনা মুখ! স্থূলভদ্র, জীবক, দৈপায়ন! শিবেই একটা যুগ কাটিয়েছেন এদের সঙ্গে।

শিবেই ভেবেছিলেন আড়াল থেকে তাদের একবার দেখেই ফিরে যাবেন, কিন্তু তাদের দেখেই বুকের মাঝে কেমন যেন তোলপাড় শুরু হল শিবেই সান্তারার। ভোরের প্রতীক্ষায় জেগে থাকা মুক্তির আশায় উদ্বেল এই মানুষগুলো জানেই না যে সূর্যের আলো তাদের জন্য বহন করে আনবে মৃত্যুর পরোয়ানা। মহারাজ নরসিংহদেব মন্দিরচত্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবেন বারোশো মানুষের মৃত্যুদণ্ড। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে এক সময় শিবেইয়ের হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই মানুষগুলোর জন্য তার কী কিছুই করার নেই? এদের নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে তার চলে যাওয়া কী ঠিক? এসব প্রশ্ন মাথায় আসতেই শিবেই নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার

BanglaBook.org

চেষ্টা করতে লাগলেন এই ভেবে যে আজ তাঁর এ দেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা পূর্বনির্ধারিত। তিনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন দেবতার কাজে নিজেকে সমর্পণ করতে। এ লোকগুলো যেমন তাঁর সুখেদুখে সাথী ছিল তেমনই তিনিও তো আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এ লোকগুলোর মঙ্গল কামনায়। কিন্তু মৃত্যু যদি নিয়তি হয়ে এ লোকগুলোর পিছু ধাওয়া করে, তবে তিনি তা রোধ করবেন কীভাবে? তিনি তো একজন সামান্য মানুষ, ঈশ্বর নন।

কিন্তু শিবেই নিজেকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন, প্রশ্নগুলো তাঁর ঘাড়ে চেপে বসতে লাগল। তাঁর কী কিছুই করার নেই? এদের ফেলে রেখে তিনি কী এভাবে চলে যাবেন? আর এর পরই তাঁর মনে পড়ে গেল দেবদত্তর কথাগুলো। অসহায় মানুষগুলোকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে গেলে ভগবান কি তার পূজা গ্রহণ করবেন?

সে জায়গা ছেড়ে মন্দির চত্বরে পা বাড়াবার চেষ্টা করলেন শিবেই, কিন্তু পারলেন না। কোনও এক অদৃশ্য মায়াজালে সেই গাছের তলায় যেন আটকে পড়েছেন তিনি। প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব না মিললে যেন তার মুক্তি নেই। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন তিনি। সময় এগোতে লাগল। তার সঙ্গে বেড়ে চলল মজুর-কারিগরদের উল্লাস। তারা জানে ভোর হলেই তাদের মুক্তি।

তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিবেইয়ের শেষ পর্যন্ত মনে হল, না, তাকে শেষ চেষ্টা একটা করতেই হবে। এতগুলো মানুষের জীবন সংকট। আচ্ছা ছেলেটাকে এখান থেকে নিয়ে পালিয়ে গেলে হয় না? যেমন ভাবে হঠাৎ ছেলেটা এসেছিল তেমন হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে সে। লোকে ভাববে সে সত্যিই কৃষ্ণ ছিল! কিন্তু পরক্ষণেই শিবেইয়ের মনে হল তাকে নিয়ে পালাতে গেলে পথে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবেন তিনি। নরসিংহদেব নিশ্চয়ই সত্য অনুসন্ধানের জন্য চারদিকে ছেলেটার খোঁজে লোক পাঠাবেন। তবে এই সংকট মোচনের উপায় কী? ভাবতে লাগলেন শিবেই।

সমাধান সূত্র মিলল এক সময়। চন্দ্রভাগার চাঁদ তখন মন্দিরের ঠিক মাথার ওপর। মন্দির শীর্ষের মঙ্গল কলসের মসৃণ গা বেয়ে, খিলানের যক্ষিণী মূর্তিগুলোকে ছুঁয়ে নীচে নামছে তার আলো। সবার অলক্ষে সেই কোলহল মুখর প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে কালো কাপড় আবৃত শিবেই সান্তারা

BanglaBook.org

সন্তর্পণে এগোলেন মন্দিরের দিকে।

'কৃষ্ণ—।'

ডাক শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল ধর্মপদ। মন্দিরের ওপরে গর্ভগৃহ প্রাঙ্গনে চাঁদের আলোতে খেলে বেড়াচ্ছিল সে। কখনও পাথরের থাক বেয়ে মন্দির শীর্ষে উঠে যাচ্ছিল সে, কখনও আবার নীচে নেমে আসছিল। তার মনে আজ খুব আনন্দ। মন্দির নির্মাণ শেষ হয়েছে। শিবেই আজ তার বাবাকে খুঁজে দেবেন। ধর্মপদ মনে মনে একটা কথা ভেবেছে, শিবেই যার হাতে এখানে তুলে দিয়ে গেছিল সে লোকটা যদি তার বাবা হন তবে বেশ হয়। লোকটা খুব ভালো। কতবার তাকে কোলে নিয়ে আদর করেছে সে। ধর্মপদ অবশ্য তার নাম জানতে পারেনি। কারণ, সবাই তাকে সর্দার বলে।

শিবেই সান্তারার কণ্ঠস্বর চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল ধর্মপদর। তারপর সে শিবেইয়ের কাছে ছুটে এসে বলল, 'তুমি এমন পোশাকে নিজেকে ঢেকে রেখেছ কেন? আমিতো তোমাকে চিনতেই পারিনি! পাথরটাতো বসানো হয়ে গেছে, এবার আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো।'

শিবেই বললেন, 'নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে চলো গর্ভগৃহটা একবার দেখে আসি।'

দুজনে প্রবেশ করল গর্ভমন্দিরের অন্ধকারে। ভিতরে ঢুকে চকমকি পাথর ঘসে শিবেই একটা প্রদীপ জ্বালালেন। প্রদীপের নরম আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। ঘরের দেওয়াল-স্তম্ভে আঁকা আশ্চর্য সব মূর্তি-অলঙ্করণ, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাথরের বেদি। যার ওপর শূন্যে অবস্থান করার কথা সূর্যদেবের। ধর্মপদ অবাক হয়ে দেখতে লাগল সে সব। ঘরের এক কোণে হঠাৎ একটা জিনিস দেখতে পেলেন শিবেই সান্তারা। কীর্তিধ্বজ! মন্দির শীর্ষে বসানোর মাঙ্গলিক পতাকাটা সেখানে বসাবে বলে মজুররা এঘরে এনে রেখেছে। পতাকাটা দেখা মাত্রই শিবেইয়ের মনে নতুন একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। শিবেই মনে মনে ঠিক করেছিলেন ছেলেটাকে সঙ্গে করে তিনি মন্দির শীর্ষে উঠবেন। আর তারপর...।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা তিনি করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে শিবেইয়ের মনের ভিতর একটু সংশয় ছিল। ঘরের কোণে রাখা কীর্তিধ্বজটা যেন শিবেই সান্তারার পরিকল্পনাকে অনেক সহজ করে দিল। তিনি ধর্মপদকে বললেন, 'তুমি এখানেই থাকো আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি। ফিরে

BanglaBook.org

এসে তোমার বাবাকে চিনিয়ে দেব আমি।'

প্রদীপটা মাটিতে নামিয়ে ধর্মপদকে সে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন শিবেই সান্তারা। তার প্রতীক্ষায় বসে রইল ধর্মপদ। সে যে ফিরে এসেই বাবার খবর দেবে! যাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমুদ্র তুফানকে হারিয়ে এত দূর ছুটে এসেছে ধর্মপদ। বাবা! বাবা!

কিছুক্ষণ পর আবার গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন শিবেই সান্তারা। হাঁফ ধরে গেছে তাঁর। তাঁকে দেখেই ধর্মপদ বলে উঠল, 'এবার আমায় বাবার কথা বলো। কে তিনি? কোথায় আছেন?'

শিবেই একটু দম নিয়ে বললেন, 'বলছি তার কথা। আমার একটা কাজ বাকি আছে। তোমারও একটা কাজ। তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে বিশু মহারানাকে চিনিয়ে দেওয়ার পর তুমি আমার কাজটা করে দিয়ে তারপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।'

ধর্মপদ বলল, 'ঠিক আছে প্রতিজ্ঞা করছি আগে তোমার কাজ করব।'

শিবেই সান্তারা এবার তার গায়ের আবরণ খসিয়ে ফেললেন। তাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল ধর্মপদ। কোথায় সেই সাদা দাঁড়িগোঁফওয়ালা শিবেই সান্তারা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুণ্ডিত মস্তক, শুভ্রবসন পরিহিত এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী! এ বেশে ধর্মপদ কেন কেউ কোনওদিন দেখেনি অর্ক মন্দিরে ভূতপূর্ব স্থপতি শিবেই সান্তারাকে। একটা বিপন্ন হাসির রেখা ফুটে আছে তার ঠোঁটের কোণে।

শিবেই ধর্মপদকে বললেন, 'তোমার বাবা কে জানো? যার কাছে আমি তোমাকে রেখে গেছিলাম, তিনি বিশু মহারানা।'

সেই লোকটা! বিস্ময়ে কেঁপে উঠল ধর্মপদ। আনন্দে বিহ্বল হয়ে প্রতিজ্ঞা ভুলে সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে যাওয়ার জন্য গর্ভগৃহ ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু শিবেই বলে উঠলেন, 'আমার কাজটা? তুমি কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

আসন্ন মিলনের আনন্দে অধৈর্য্য ধর্মপদ বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি বলো কী কাজ? আমার আর তর সইছে না। কাজটা করেই বাবার কাছে যাব। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!

শিবেই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে রইলেন ধর্মপদর দিকে। প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেটার মুখে। আনন্দে উদ্ভাসিত তার নিষ্পাপ মুখমণ্ডল। ডাগর চোখে সে তাকিয়ে আছে শিবেইয়ের দিকে। শিবেইয়ের

BanglaBook.org

মনে হল চন্দ্রভাগার চাঁদ যেন আকাশ থেকে নেমে এসে হাজির হয়েছে গর্ভগৃহে। তেমনই উজ্জ্বলস্নিগ্ধ লাবণ্য তার অঙ্গে। শিবেইকে চুপ করে থাকতে দেখে ছেলেটা আবার তাড়া দিল 'কই বলো কী কাজ?'

শিবেইয়ের কণ্ঠস্বর যেন মৃদু কেঁপে উঠল। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে তিনি ধীর গলায় বললেন, 'ছোট্ট একটা কাজ। গর্ভগৃহে রাখা ওই কীর্তিধ্বজটা নিয়ে মন্দির শীর্ষে স্বর্ণকলসে তোমাকে বসিয়ে আসতে হবে। ধর্মীয় নিয়ম মেনে সিংহদ্বারের দিক থেকে মন্দিরগাত্র বেয়ে ওপরে উঠবে তুমি, আর নামবে অশ্বদ্বারের দিক বেয়ে। পারবে তো?'

শিবেইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই 'পারব' বলে ধর্মপদ ঘরের কোণ থেকে উঠিয়ে নিল পতাকাটা। তারপর ছুটল গর্ভগৃহর বাইরে। কাজটা করে দিয়েই সে ছুটবে বাবার কাছে। শিবেই বাইরের দিকে ধাবমান ধর্মপদর ছোট্ট অবয়বের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'ওঠার সময় সিংহতোরণ, আর নামার সময় অশ্বতোরণের দিক দিয়ে, মনে থাকে যেন।'

বাইরে থেকে ধর্মপদর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আচ্ছা, মনে আছে।'

বাইরে হঠাৎই যেন চাঁদের আলো মৃয়মান হয়ে এল। একখণ্ড কালো মেঘ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে চাঁদের দিকে, পতাকা নিয়ে সিংহতোরণের দিক থেকে মন্দিরের থাকে পা রেখে ওপরে উঠতে লাগল ধর্মপদ। মাদল আরও জোরে জোরে বাজতে শুরু করেছে। মুক্তির আনন্দে আজ মাতোয়ারা সবাই। ধর্মপদ ওপরে উঠে যেতে লাগল, আরও ওপরে, আরও ওপরে।

ধর্মপদ বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শিবেই। তার দু-চোখ বেয়ে জলের ধারা নামতে শুরু করেছে। শিবেই এর পর নীচু হয়ে বিগ্রহবেদির এক জায়গায় ধাক্কা মারতেই পাথরটা সরে গিয়ে একটা গোপন গহ্বর বেরিয়ে এল। শিবেই সেই গহ্বরের ভিতর থেকে তুলে আনলেন এক তথাগত মূর্তি। হাত দুই লম্বা এই পাথরের মূর্তিটা শিবেই সাম্ভারার নিজের হাতে গড়া। এই মূর্তিরই সন্ধান চালাচ্ছিলেন নরসিংহদেব আর মহাবীর পট্টানায়েক। কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহে কেউ মূর্তিটাকে রাখার দুঃসাহস দেখাবে ধারণা করতে পারেনি তারা। পাথরটা আবার আগের জায়গাতে ফিরিয়ে এনে গহ্বরটা ঢেকে দিয়ে মূর্তিটাকে বেদির সামনে স্থাপন করে তার সামনে নতজানু হয়ে বসলেন শিবেই। বুদ্ধ আর বরাহদেব দুজনেই বিষ্ণুর অবতার। নিজের ধর্মচিন্তাকে গোপন রাখতে এতদিন তিনি,

BanglaBook.org

বরাহদেবতাকেই বুদ্ধ ভাবে পুজো করতেন। আজ এতদিন পর তিনি উপবিষ্ট হলেন তথাগত মূর্তির সামনে। আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি। করুণা বারি যেন ঝরে পড়ছে অর্ধনিমিলিত চোখ বেয়ে। তার উদ্দেশ্যে শিবেই বললেন, 'ভেবেছিলাম নিজে হাতে গড়া তোমার এই মূর্তি আমি স্থাপন করব সেই বটবৃক্ষের পাদমূলে। যেখানে বোধিসত্ত্ব লাভ করেছিলে তুমি। আমার আর পৌঁছোনো হল না সে জায়গাতে। হে করুণা সিন্ধু ছেলেটাকে আমি যে নির্দেশ দিলাম তার জন্য ক্ষমা কোরো আমাকে। এতগুলো লোকের প্রাণ বাঁচাতে অন্য কোনও উপায় ছিল না আমার। যে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে ভগবান কৃষ্ণ হয়ে। এই মুহূর্তে আমি নিজেকে তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম প্রভু। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

শিবেই এরপর করোজোড়ে অনুচ্চস্বরে বলতে লাগলেন—

'বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণম্ গচ্ছামি
সংঘং শরণম্ গচ্ছামি...'

ধপ! বাইরে থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল। থেমে গেল শিবেইয়ের মন্ত্রচ্চারণ। করজোড়ে তথাগতর উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানিয়ে মূর্তিটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবেই। ঠিক সেই সময় গর্ভগৃহে প্রদীপটাও হঠাৎ নিভে গেল। বুদ্ধি মূর্তি কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। গর্ভগৃহকে বেড় দিয়ে একটু এগোতেই শিবেই দেখতে পেলেন বিষণ্ণ চাঁদের আলোতে পাথুরে মেঝেতে পড়ে আছে ধর্মপদর ছোট্ট নিথর দেহটা।

শিবেইয়ের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। ধর্মপদকে গর্ভগৃহে রেখে শিবেই ওপরে উঠে যে পথে ধর্মপদর নামার কথা, সে পথে একটা পাথরের তাক আলগা করে এসেছিলেন, আর ধর্মপদ সে পাথরে পা রাখতেই...

শিবেই এগিয়ে গিয়ে ধর্মপদর ছোট্ট নিথর দেহটা কাঁধে তুলে নিলেন। মন্দির শীর্ষে উড়ছে মহারাজ নরসিংহদেবের কীর্তিধ্বজ, মাদল বাজছে, হাজার মানুষের উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ওখানেই কোনও এক শনের কুটীরের সামনে বসে ধর্মপদর কথা ভাবছে বিশু মহারানা। শিবেই একবার সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, তারপর নীচে নামতে শুরু করলেন।

শিবেই পৌঁছে গেলেন নদীতটে, মাথার ওপর জেগে বিষণ্ণ চন্দ্রভাগার

BanglaBook.org

চাঁদ। মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে তাকে। মাদলের শব্দ আর উল্লাসধ্বনি এ জায়গাতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। নোনা বাতাস বয়ে আনছে সমুদ্রর গর্জন, তার আহ্বান। শিবেই চড়ে বসলেন তার ছোট্ট নৌকোতে। তারপর সেই বুদ্ধমূর্তি আর ধর্মপদর দেহটাকে রশি দিয়ে নিজের দেহের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে মোহনার দিকে দাঁড় বাইতে লাগলেন। ক্রমেই তীব্র হতে লাগল সমুদ্র গর্জন। এক সময় শিবেই তার দাঁড়টাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন জলে। ও দুটোকে আর প্রয়োজন নেই। ওই তো দেখা যাচ্ছে মোহনা। শিবেই সান্তারা তার বুকে বাঁধা বুদ্ধমূতি আর ধর্মপদকে ভালো করে জাপটে ধরলেন। ঠিক সেই সময় এক খণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিল মাথার ওপরে চন্দ্রভাগার চাঁদকে। সমুদ্রর আহ্বানে উল্কা গতিতে শিবেই সান্তারা আর ধর্মপদকে নিয়ে মোহনার দিকে ছুটে চলল নৌকো। সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার জন্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চাঁদবরের শেষ শ্লোক

মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে দশহাজার অশ্বারোহীর বিরাট বড় এক কাফেলা। কয়েক ক্রোশ লম্বা হবে দৈর্ঘ্যে। আকাশ থেকে পাখির চোখে দেখলে মনে হবে কেউ যেন একটা দীর্ঘ কালো রেখা এঁকে দিয়েছে মাটির বুকে। পাখি অবশ্য এ আকাশে খুব একটা ওড়ে না। আকাশ বা মাটি, এখানকার কোনও জায়গাই প্রাণীর পক্ষে তেমন বাসযোগ্য নয়। পায়ের নীচে তপ্ত বালি আর মাথার ওপর আফগানিস্থানের প্রখর সূর্য। সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও।

কাফেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল দিল্লি থেকে। খাইবার গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তারা প্রবেশ করেছে মরু রাজ্যে। তারপর কাবুল। সে শহরকেও পিছনে ফেলে এসেছে বেশ কয়েকদিন আগে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা। গন্তব্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। হয়তো আজই সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে সেখানে। কিন্তু শেষের পথটুকু যেন কিছুতেই ফুরাচ্ছে না। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। চারপাশে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। অমন তেজি আফগান ঘোড়াগুলো, যারা পাঁচ-মন ওজন নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে জ্যা-মুক্ত তিরের আগে ছুটে যায়, তারাও চলতে চলতে ধুঁকছে। আর তাদের পিঠে বসা লোকগুলো পাগড়ির কাপড় দিয়ে আস্টেপৃষ্টে মুখ ঢেকে কোনওক্রমে বসে আছে।

তিন ভাগে বিভক্ত কাফেলা। প্রথমে বিজয়ী মইজুদ্দিন মুহম্মদ বিন-সাম চলেছেন তাঁর সেনাপতি, ওমরাহ ও এক হাজার দেহরক্ষী নিয়ে। মাঝে চলেছে সবচেয়ে বড় দলটা। অশ্বারোহী সেনা ছাড়াও পাচক, খিদমদগার, বণিক, নর্তকী, নানা শ্রেণির মানুষ রয়েছে সে দলে। আর সব শেষে ছোট্ট একটা দল। পঞ্চাশজন অশ্বারোহী একটা হাতিকে নিয়ে চলেছে। এত বড় কাফেলার এই একটা মাত্র হাতি। আসলে হাতিটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশেষ কারণে। প্রথমত হাতির পিঠে যে আছে, তাঁর যা অবস্থা তাতে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এই দুর্গম পথে বয়ে আনা সম্ভব হত না। আর দ্বিতীয়ত, 'হাতি' নামের এই অদ্ভুত প্রাণীটার সঙ্গে

BanglaBook.org

এই কাফেলার অর্ধেক মানুষেরই পরিচয় ছিল না এই সেদিন পর্যন্ত। তরারীর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের প্রথম পরিচয় এই পাহাড় প্রমাণ বিচিত্র দানোর সঙ্গে। তারা যে মুলুকে থাকে সেখানে হাতি পাওয়া যায় না। তাই সেখানে হাতি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার মালিকের মতো তাকেও লোকজনকে দেখাবার জন্য। আরও একটা রটনা অবশ্য আছে, মইজুদ্দিন নাকি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এই অদ্ভুত প্রাণীর পিঠে সওয়ার হওয়ার।

যারা হাতিটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে, তারা প্রাণীটার থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখেই চলেছে। প্রথমবার তরারীর যুদ্ধে তো এই প্রাণীগুলোই নিকেশ করে দিয়েছিল তাদের অতবড় সেনাদলটাকে। দ্বিতীয়বারও তাই হত যদি না সুলতান সন্ধ্যার অন্ধকারে অসতর্ক মুহূর্তে পুনঃআক্রমণ হানতেন। ভয়ংকর প্রাণী এই হাতি। আর হাতির পিঠে যে আছে সে-ও কম ভয়ংকর ছিল না এই সেদিনও। স্বয়ং মইজুদ্দিনকেও পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল তার হাত থেকে। তার তির যে কতজন ছুটন্ত ঘোড়া সওয়ারকে ধরাশায়ী করেছে, তার কোনও হিসাব নেই। যুদ্ধ আর ক'দিন চললে এ লোকটাই কাফেলাকে আয়তনে অর্ধেক করে দিত। কিন্তু এখন অবশ্য...।

হাতির পিঠে লোহার শিকল বাঁধা অবস্থায় চলেছে লোকটা। বলা ভালো, শিকল বাঁধা সংজ্ঞাহীন একটা দেহ ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। তার পরনে ছিন্ন পোশাক। দেহের উন্মুক্ত জায়গাগুলোতে দগদগে ঘা। প্রচণ্ড সূর্যের তাপে আগুন হয়ে ওঠা লোহার শিকলগুলো ওই পোড়া ঘা সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া যুদ্ধর ক্ষতচিহ্ন তো আছেই।

অসাড় লোকটার ছিন্ন কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে একটা শূন্য কোষ। সূর্যের আলোতে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে সোনার তৈরি লম্বা কোষটা। ওটাই প্রমাণ করছে হাতির পিঠে শৃঙ্খলিত বন্দি সাধারণ কোনও লোক নয়। সারা কাফেলার দুজনের কাছে মাত্র এত মুল্যবান কোষ আছে। তার একজন কালো ঘোড়ার পিঠে কাফেলার সবার আগে চলেছে কোষবদ্ধ তুর্কি তলোয়ার হাতে। আর অন্যজন চলেছে হাতির পিঠে শূন্য কোষ নিয়ে। তার রাজপুত তলোয়ার হারিয়ে গেছে তরারী নগরের উপকণ্ঠে, কাজল নদীর প্রান্তরে।

বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় চলেছে হাতির পিঠের লোকটা। তাঁর চোখে

BanglaBook.org

শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে যেন এক অদ্ভুত জগতে বিচরণ করছে সে। এক অনন্ত অন্ধকারময় পথ লোকটা যেন পাড়ি দিচ্ছে। সেই অন্ধকার পথে জমাট বাঁধা কুয়াশার মধ্যে কখনও তার মনে জেগে উঠছে কাজল নদীর তীরে তরারীর সেই যুদ্ধক্ষেত্র, কখনও দিল্লি বা আজমীরের পথ-ঘাট, কখনও বা তাঁর অভিন্ন হৃদয় সহচর চিতোর রাজ সমর সিংহ অথবা প্রিয়তমার মুখ। এ সবই দেখা অবশ্য ঘোরের মধ্যে। অনেকটা স্বপ্নের মতো। পরাজিত নিঃসঙ্গ এক রাজা চলেছে তার নিয়তির টানে। আপনার জন বলতে তাঁর সঙ্গে কেউ আর নেই এই হাতিটা ছাড়া।

হাতিটার নাম গজরাজ। দিল্লির রাজপথই হোক বা তরারীর যুদ্ধক্ষেত্র। দীর্ঘদিন ধরে প্রভুকে পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছে সে। এই অন্তিম যাত্রাপথেও প্রভুর সঙ্গী গজরাজ। হাতিটা সম্ভবত অনুমান করতে পারছে তার নিঃসঙ্গ প্রভুর অবস্থা। মাঝে মাঝে গজরাজ মাথা পিছনে ফিরিয়ে পরম মমতায় শুঁড় বোলাচ্ছে তার পিঠের ওপর শিকল বাঁধা মানুষটার গায়ে।

যে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী গজরাজকে ঘিরে চলেছে তাদের ব্যূহকে ছিন্নভিন্ন করে প্রভুকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার শক্তি গজরাজের আছে। প্রশিক্ষিত হাতি-ঘোড়ারা এভাবে অনেক সময় শত্রুর হাত থেকে তার আরোহীর জীবন বাঁচিয়ে দেয়। কাজটা হয়তো করতও গজরাজ। কিন্তু শক্তি থাকলেও সে পথ তার রুদ্ধ। গজরাজের পায়েও লোহার ভারী শিকল বাঁধা। এমন ভাবে বাঁধা যে হাঁটতে পারলেও ছোটার সাধ্য তার নেই। চলতে গিয়ে ঠংঠং শব্দ হচ্ছে পায়ের লোহার শিকল থেকে।

অশ্বারোহী প্রহরীরা চলতে চলতে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে বন্দির দিকে। এক এক সময় তাদের সন্দেহ হচ্ছে হাতিটা শব বহন করে চলছে না তো? কিন্তু কাফেলা কোথাও না থামলে ব্যাপারটা বোঝার উপায় তাদের নেই। একদিন একজন রাজপুত হাতিটার কাছে গিয়ে তার গায়ে বল্লমের খোঁচা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে গেছিল। কিন্তু বল্লম ছোঁয়াবার আগেই গজরাজ শুড়ের আঘাতে ঘোড়াসমেত লোকটাকে দশহাত দুরে ছিটকে ফেলেছিল। খুব বাঁচা বেঁচে গেছিল লোকটা। তার পর থেকে ও চেষ্টা আর কেউ করে না।

গজরাজ শুধু এ কাফেলার একজন লোককেই তার প্রভুর কাছে

BanglaBook.org

ঘেঁষতে দেয়। সে লোকটা গজরাজের চেনা। প্রভুর সঙ্গে গজরাজের পিঠে বহুবার চেপেছে সে। বিশেষত প্রভু যখন তার পিঠে চেপে দিল্লি নগরী পরিদর্শনে বেরোত, তখন প্রভুর সঙ্গী হত এই লোকটা। এখন অবশ্য লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নিরীহ গোছের একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে। অশ্বারোহীদের ভিড়েও এ লোকটাকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। কারণ, একমাত্র এ লোকটারই সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, দাড়িও নেই গালে। পাগড়িটাও অন্যদের থেকে আলাদা। রাজপুত পাগড়ি। তার নীচ থেকে বেরিয়ে আছে কানে গোঁজা হাঁসের পালকের কলম। লোকটা জাতিতে রাজপুত। নাম, চাঁদ বরদই।

এক সময় এ লোকটা ছিল বন্দি রাজার সভাকবি। শুধু সভাকবি বললে, ভুল হবে। রাজার বাল্য সহচর, যৌবনের সাথী। আর এখন বিজয়ী মইজুদ্দিনের আজ্ঞাবহ। মইজুদ্দিন তাকে নিজ দেশে নিয়ে চলেছেন তার ওমরাহদের রাজস্থানী আর হিন্দি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য। বহু ভাষিক চাঁদ তার দরবারে থাকলে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সুবিধা হবে যদিও গজনীবিদ সাম্রাজ্যের সুলতান 'গিয়াসউদ্দিন', কিন্তু গজনীবিদ সাম্রাজ্যের নব গঠিত অঞ্চলের দায়িত্ব ভার কাঁধে নিতে হবে গজনী প্রদেশের শাসক মইজুদ্দিনকেই। তাঁর হাত ধরেই তো গজনীবিদের অন্তর্ভূক্ত হল মুলতান লাহোর-আজমীর-দিল্লি সহ উত্তর পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কাজেই ভারতীয় কয়েকটা ভাষা শিখে নেওয়া প্রয়োজন মইজুদ্দিনের।

বন্দির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চাঁদ চলেছেন ঘোড়ার পিঠে। মনে মনে ভাবছেন। ভগবান একলিঙ্গদেব আর কত কষ্ট দেবেন হতভাগ্য এই রাজপুত কে? সেই তরারীর প্রান্তর, তারপর দীর্ঘ কারাবাস, তারপর সেই ভয়ংকরতম ঘটনা। যেদিন মইজুদ্দিনের নির্দেশে জহ্লাদ...

সে ঘটনার সাক্ষী ছিলেন চাঁদও। সে দৃশ্যের কথা ভেবে শিউরে উঠলেন চাঁদ। এর চেয়ে তরারীর প্রান্তরে কাজল নদীর ধারে তাঁর চিতা সাজলেই ভালো ছিল। যেমন সাজানো হয়েছিল, চিতোর রাজ সমর সিংহ, সেনাপতি খাণ্ডেরাও-এর বেলায়। তবে সেই ভয়ঙ্কর দিনে মইজুদ্দিনের সামনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলিত রাজপুত রাজার শেষ কথাগুলো আজও তার কানে বাজে—'মৃত্যু না হলে রাজপুত চোখ নামায় না।' সেই কথার পর আজ পর্যন্ত একটা শব্দও বেরোয়নি তাঁর কণ্ঠ থেকে। হতভাগ্য রাজার

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে তাঁরই শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করে বেশ কয়েকবার আউড়ালেন চাঁদ।

কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছেন না চাঁদ। এই জীবন্মৃত মানুষটাকে মইজুদ্দিন নিজ মুলুকে নিয়ে চলেছেন কেন? পথ চলতে চলতে এক তুর্কি ক্রীতদাস পরিহাস করে বলছিল যে বাঘ-সিংহকে যেমন খাঁচায় পুরে অশ্ব শকটে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়, ঠিক তেমনই এই রাজপুত বাঘকেও খাঁচাবন্দি অবস্থায় সারা নগরীতে ঘোরানো হবে; পারসিক সিংহর প্রতাপ বিঘোষিত হবে এ কাজের মাধ্যমে।

এক এক সময় চাঁদের মনে হয়, রাজাকে জল খাওয়াবার সময় জলে বিষ মিশিয়ে দেবেন তিনি। তাতে অন্তত অপমানের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবেন রাজা। কিন্তু যে হাতে রাজার বীর গাথা রচনা করেছেন চাঁদ, সে হাতে কীভাবে তাকে বিষ খাওয়াবেন তিনি? রাজার জীবনপঞ্জী ধরা আছে চাঁদের এই হাতে রচিত প্রায় দেড় হাজার শ্লোকে। রচনা প্রায় সম্পূর্ণ। অন্তিম কিছু শ্লোক রচনা শুধু বাকি। কী হবে সেই শ্লোকগুলো? এ কথা ভাবতে ভাবতে তপ্ত মরু অতিক্রম করে কাফেলার সঙ্গে অজানার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললেন চাঁদ।

সব পথেরই একটা শেষ থাকে। দুপুর গড়িয়ে এক সময় বিকাল হল। রোদের তাপও কমে এল। মরু রাজ্যের এই এক নিয়ম, বালি যত দ্রুত গরম হয় তত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়। তারপর বালিয়াড়িতে যখন সূর্যাস্ত হয় সে এক অপূর্ব দৃশ্য। শুধু একজনই বঞ্চিত প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যর থেকে। শৃঙ্খলিত রাজার চোখে শুধুই জমাট বাঁধা অন্ধকার।

দিন শেষের বিকালটা সত্যিই বড় মনোরম হয়। ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করে। পথশ্রমের ক্লান্তি জুড়িয়ে দেয়। কাফেলার কোথা থেকে হয়তো ভেসে আসে সুফি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত।

এদিন বিকালবেলা দূর দিগন্তে একটা কালো রেখা দেখা গেল। পাহাড় শ্রেণি। চাঁদ খেয়াল করলেন তা দেখে কেমন একটা চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে অশ্বারোহীদের চোখেমুখে। হয়তো সামনে কোনও মরুদ্যান আছে। জায়গাটাতে পৌঁছে রাজাকে জল খাওয়াতে হবে। মনে মনে ভেবে নিলেন চাঁদ। রাজা বাহ্যজ্ঞানরহিত। খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। পাখি যেমন তার

BanglaBook.org

ছানাকে খাওয়ায় ঠিক তেমনই চাঁদ তাঁর মুখে ঢেলে দেন ফোঁটা ফোঁটা জল, কখনও রুটির গুড়ো। তবু এখনও বেঁচে আছেন রাজা! আশ্চর্য তাঁর জীবনী শক্তি!

ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল গিরিশ্রেণি। রুক্ষ বালুকাময় ভূমিতেও জেগে উঠতে শুরু করল শ্যামলিমা। পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডোবার ঠিক আগের মুহূর্তে অগ্রবর্তী বাহিনীর একটা লোকের মুখ থেকে একটা উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। সেই চিৎকার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আন্দোলিত তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা কাফেলায়। দেখা গেছে, দেখা গেছে! গজনীর মিনার দেখা গেছে! দীর্ঘ যাত্রা শেষে কাফেলা পৌঁছে গেছে গজনীতে! চাঁদ তাকালেন হাতির পিঠে বাঁধা মানুষটার দিকে। চাঁদের মনে হল, হঠাৎ যেন একবার নড়ে উঠলেন রাজা! কিন্তু সেটা তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম কিনা তা ঠিক বুঝতে পারলেন না চাঁদ। তবে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ দেখতে পেলেন দিগন্তে আস্তাচলগামী সূর্যের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা গজনীর মিনার। কয়েক ক্রোশ মাত্র দুরত্ব হবে তার।

২

গজনী। পাহাড় আর মরুভূমি ঘেরা এক শহর। আয়তনে বেশি বড় নয়। পাথুরে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শাসকের প্রাসাদ, প্রধান মসজিদ, মিনার আর কয়েকটা খেজুর কুঞ্জ ছাড়া এ নগরীতে দ্রষ্টব্য তেমন কিছু নেই। এ তিন দিন ঘুরে ঘুরে তার সব কিছুই প্রায় দেখে নিয়েছেন চাঁদ। বাড়ি-ঘরগুলো দ্বিতল-ত্রিতল হলেও ছিরিছাঁদ হীন। কোনও রঙের প্রলেপ নেই তাতে। কাঠের ছাদ। কপাট হীন বড়বড় জানলাগুলো হাঁ করে আছে। বাড়িগুলোকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন পাথরের তৈরি বিরাট বিরাট বাক্স ইচ্ছামতো এখানে ওখানে বসিয়ে রেখেছে। দিল্লি নগরীর মতো দৃষ্টিনন্দন হর্ম্যপ্রাসাদ, কারুকার্যমণ্ডিত তোরণ-মন্দির, শ্বেতপাথরের ফোয়ারা শোভিত শীতল কুঞ্জ বা প্রশস্ত-মসৃণ রাজপথ। কোনওটাই এখানে নেই। কোনও তুলনাই হয় না এ দুই নগরীর মধ্যে।

BanglaBook.org

চাঁদের চোখকে সবচেয়ে বেশি যা পীড়া দিচ্ছে তা হল এ শহরের রুক্ষতা। ঘর-বাড়ি-দোকান-বাজার, লোকজনের পোশাক-আশাক সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে কেমন যেন একটা রুক্ষ অবিন্যস্তভাব। কিছুটা অপরিচ্ছন্নও বটে।

রাস্তাগুলোও ঘিঞ্জি। সেরকমই একটা রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন চাঁদ। গন্তব্য সুলতানের প্রাসাদ। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে মইজুদ্দিনকেও নগরীর সবাই সুলতান বলেই সম্বোধন করে। মইজুদ্দিন নামটা পারসিক। আরও বেশ কয়েকটা নাম আছে সুলতানের। 'শাহবুদ্দিন মহম্মদ' ইত্যাদি বেশ বড়-বড় সব নাম। তবে দেশের লোকে সংক্ষেপে তাকে ডাকে—'বিন-সাম' বলে। সুলতান বিন-সাম। সকালবেলা বিন-সামের এক ক্রীতদাস অনুচর এসে খবর দিয়ে গেছে সুলতান তাঁর প্রাসাদে হাজিরা দিতে বলেছেন চাঁদকে। সুলতানের এক হাজার ক্রীতদাস আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ উচ্চপদে আসীন। দিল্লির শাসনভারও তো সুলতান ছেড়ে দিয়ে এসেছেন তাঁর এক ক্রীতদাস অনুচরের হাতেই। সুলতান তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁদের মাধ্যমেই।

হাঁটছিলেন চাঁদ। নানা জাতের নানা মানুষে ছেয়ে আছে রাস্তাটা। পারসিক-তুর্কি, আফগানিরা তো আছেই তার সঙ্গে মিশে আছে নানা মরু উপজাতীয় লোক। প্রায় সকলের পরনেই আলখাল্লা বা ঢিলা জোব্বা, মাথায় পাগড়ি। মাঝে মাঝে ঘোড়া বা উটে টানা গাড়ি চলছে। পাথুরে রাস্তায় তাদের কাঠের চাকার ঘর্ষণে ঘরঘর শব্দ আর লোকজনের চিৎকারে জায়গাটা সরগরম। রাস্তার পাশে তাঁবুর ছাউনি দেওয়া সার সার দোকান। কোথাও বিক্রি হচ্ছে বিরাট বিরাট মাটির জল রাখার পাত্র, কোথাও আবার তুর্কি তলোয়ার। আর আছে অনেক তরমুজের দোকান। মাছি ভনভন করছে দোকানগুলোর চারপাশে। কেউ কেউ আবার দাঁড়িয়ে আছে হাতে শিকারে বাজ নিয়ে খদ্দেরের আশায়। হিংস্র পাখিগুলোর চোখে চামড়ার ঠুলি। তারা মাঝে মাঝে কর্কশ চিৎকার করছে। সূর্য এখনও মাথার কাছে পৌঁছোয়নি। কিন্তু রোদের তাপ প্রচণ্ড। বাতাসে উট-গাধা-ঘোড়ার মলের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য পাগড়ির কাপড়ের শেষ অংশ দিয়ে মুখ ঢেকে চাঁদ এগোচ্ছিলেন।

হঠাৎ একটা গলার স্বর তাঁর কানে এল,—'এই যে রাজকবি চললে

BanglaBook.org

কোথায়? 'রাজকবি' শব্দটা পারসি ভাষায় নেই। শব্দটা হিন্দুস্থানি। কাজেই শব্দটা যে তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে তা অনুমান করে এক ঝলক তাকিয়ে লোকটাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পা চালাবার চেষ্টা করলেন তিনি। চাঁদ লোকটাকে চেনেন। সুলতানের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। খুব বেশি বকবক করেন। একবার কাউকে ধরলে আর ছাড়তে চান না। লোকটার নাম, বক্তিয়ার খলজি। চাঁদকে দ্রুত হাজির হতে হবে সুলতানের প্রাসাদে, তাই তাঁকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু বক্তিয়ার এসে পথ আটকে দাঁড়ালেন।

চাঁদ দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হেসে বললেন,—ও আপনি!

বক্তিয়ার বললেন,—আমাকে নজর-আন্দাজ করছ না যে বড়। কী ভেবেছ মুখে পাগড়ি চাপালে আমি তোমাকে চিনতে পারব না? আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। সুলতান বিন-সাম কী বলেন জানো? বলেন বক্তিয়ারের চোখ হল বাজপাখির চোখ। কোনও কিছুই এড়াবার জো নেই ওর চোখ থেকে। এজন্যই তো তিনি আমার ওপর ভরসা রাখেন।

এরপর তিনি বললেন,—তোমার মুখের ওপর কাপড় চাপা কেন?

চাঁদ একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন,—আসলে পথে এত আবর্জনা তাই।

বক্তিয়ার বললেন,—ও, এ শহর তোমার পছন্দ হচ্ছে না বুঝি। তা কোন জগতে থাকতে চাও তুমি? নসীব ভালো যে এখনও গর্দানটা আছে। তাও আছে এই বক্তিয়ারের জন্যই। দিল্লির চকে তুমি যেদিন ধরা পড়লে সেদিন তাজউদ্দিন তো তোমাকে কোতলই করতে যাচ্ছিল। আমিই তখন সুলতাকে বুঝিয়ে বলি যে লোকটা শায়ের, গর্দান না নিয়ে বরং সঙ্গে রাখুন। তাই সুলতান তোমার জান দিয়েছিল। কিন্তু গজনীকে তুমি নফরত করছ শুনলে তিনি তোমাকে নির্ঘাত কোতল করবেন।

কথাটা একটু বেফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে চাঁদ তাঁকে বললেন, —গোস্তাকি মাফ করবেন উজির সাহেব। আপনি যে আমার মতো নগন্য মানুষের সামনে এসে দাঁড়াবেন তা ভাবতেই পারিনি। তাই ঘাবড়ে গিয়ে কী বলতে কী বলে ফেলেছি!

BanglaBook.org

'উজির' শব্দটা শুনে বেশ খুশি হলেন বক্তিয়ার। ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন,—আমীর তো আমি বটেই। সুলতান বিন-সাম তো আমার হাতেই দিল্লির শাসনভার তুলে দিচ্ছিলেন। কমবক্ত তাজউদ্দিন সেটা হতে দিল না।

তাজউদ্দিন হলেন নবাবের প্রধান পার্শ্বচর। নবাবের পর তারই হুকুম চলে গজনীতে। বক্তিয়ারের চেয়ে তিনি ক্ষমতাবান ব্যক্তি। বক্তিয়ার নিজে এবার বেফাঁস বলে ফেলেছেন বুঝতে পেরে বললেন,—এ কথাটা তুমি আবার পাঁচকান কোরো না। তুমি গজনীতে নতুন মানুষ। দরবারের হালহকিকৎ জানো না। তাজউদ্দিন তোমাকে ভালো নজরে দেখে না। এ মুলুকে কথায় কথায় লোকের গর্দান যায়। তার ওপর তুমি তো আবার কাফের। তাজউদ্দিনের থেকে সাবধানে থেকো।

বক্তিয়ারের কথা শুনে মনে মনে হাসলেন চাঁদ। তার মানে এখানেও দরবারি কাজিয়া আছে। মুখে তিনি বললেন,—উজির সাহেবের নেক নজরে যখন আমি আছি তখন আমার ভয় কী?'

এ কথাটা শুনেও বেশ খুশি হলেন বক্তিয়ার। তিনি হেসে বললেন,—তা বটে। সুলতান বিন-সামের কাছে এ বান্দারও গুরুত্ব কম নয়।

এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন,—তুমি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছ কোথায়? সেই রাজার কাছে? তাকে তো শুনছি গরম তেলে সিদ্ধ করা হবে। কিন্তু কয়েদখানার রাস্তা তো এদিকে নয়। তা হলে?

চাঁদ চমকে উঠলেন। এখানে আনার পর রাজাকে পাঠানো হয়েছে কারাগারে। সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই চাঁদের। সুলতানের পাঞ্জার ছাপ লাগে সেখানে ঢুকতে। তিনদিন রাজাকে দ্যাখেননি চাঁদ। দিন-রাত শুধু তাঁর কথা ভেবে চলেছেন। তা হলে কী সুলতান ফরমান জারি করে দিয়েছেন? সুলতান পারসি-তুর্কি ছাড়া হিন্দুস্থানি ভাষা জানেন না। তা হলে কী তার মাধ্যমেই রাজপুত রাজাকে সংবাদটা জানাবার জন্যই সুলতান তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন? বুক কেঁপে উঠল চাঁদ বরদইয়ের। রাজগাথার অন্তিম শ্লোকগুলো কী তাহলে এত তাড়াতাড়ি তাঁকে রচনা করতে হবে!

—কী, আমার কথার জবাব দিলে না যে? বক্তিয়ারের কথায় সম্বিত ফিরল চাঁদের। মনের ভাব গোপন করে চাঁদ শুধু বললেন,—সুলতান

BanglaBook.org

ডাক পাঠিয়েছেন দরবারে যাচ্ছি।

ভ্রু কুঁচকে গেল বক্তিয়ারের।—সুলতান ডাক পাঠিয়েছেন! কেন?

—ঠিক জানি না। ইসকান্দার নামের একজন এসে খবর দিয়ে গেল, সুলতান ডেকেছেন।

—ইসকান্দার। সে তো আবার ওমরাহ্ তাজউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ! ব্যাপারটা কী? কৌতূহলী বক্তিয়ার কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন,—তোমার সঙ্গে তো কেউ নেই। দ্বাররক্ষীরা তোমাকে চেনে না। তার ওপর তোমার পাগড়ি-সাজ-পোশাক কাফেরদের মতো। তারা প্রাসাদে তোমাকে ঢুকতে দেবে না। চলো আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। দরবারে আমার কিছু কাজও আছে।

সত্যি দরবারে যেতে একটু ভয় ভয় লাগছিল চাঁদের। এখানকার নিয়মকানুন আদব-কায়দা কিছুই জানা নেই চাঁদের। সুলতান বিন-সামের নৃশংতার প্রমাণ ইতিপূর্বে পেয়েছেন চাঁদ। যখন রাজাকে হাজির করা হয়েছিল বিন-সামের সামনে। মৃত্যুকে অবশ্য তেমন ভয় পান না চাঁদ। ভয় শুধু একটাই। তাঁকে যদি রাজার মতো অবস্থা করে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তা মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর! বক্তিয়ার লোকটা বেশি কথা বললেও দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। নৃশংসতা এদের সবার মধ্যে থাকলেও বক্তিয়ার কিছুটা সরলমনা। লোকটা থাকলে চাঁদের সুবিধাই হবে। কাজেই তাঁর কথা শুনে চাঁদ বললেন,—উজির সাহেবের মেহেরবানি।

বক্তিয়ারের ঘোড়াটা কিছু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে এনে তাতে চড়ে বসলেন তিনি। তার পাশে পাশে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগলেন চাঁদ।

যেতে যেতে বক্তিয়ার বললেন,—বুঝলে কবি, তুমি তো আমাকে নিয়েও শায়েরি লিখতে পারো। আমার বহুদিনের ইচ্ছা আমাকে নিয়ে কেউ কিছু লেখে। আমার জীবনে কত রোমাঞ্চকর ঘটনা আছে তা বলে শেষ করা যাবে না!

লোকটাকে খুশি করার জন্য চাঁদ বললেন,—আমি তো সে কথাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম, কিন্তু আপনি যদি গুস্তাকি নেন সেই ভয়ে বলতে পারিনি। রাজা-সুলতানদের নিয়ে শ্লোক-শায়েরি লিখতে মোটেও আমার ইচ্ছা করে না। যুদ্ধ করে অন্যরা আর রাজার নামে শ্লোক লিখতে

BanglaBook.org

হয়। নেহাত ঘাড়ের ওপর একটাই মাথা তাই লিখি। আপনার মতো কোনও প্রকৃত বীরকেই আমি এতদিন ধরে খুঁজছিলাম।

তাঁর কথা শুনে বক্তিয়ার বললেন,—তা বীর তো আমি বটেই। কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান আবার হিন্দুস্থান যাবেন। দিল্লি পৌঁছে তার নির্দেশে দোয়াব-বাংলা অভিযান হবে। সে অভিযানের দায়িত্ব সুলতান আমাকেই দেবেন বলেছেন। অভিযান সফল হলে আমিই হব বাংলার শাসনকর্তা। তুমি যদি আমাকে নিয়ে লেখো তবে তোমাকেই আমার রাজকবি বানাব আমি।

চাঁদ শুনে বলে ফেললেন,—বাংলার আর আমার—দুজনেরই নসিবে কী দুর্ভোগ আছে কে জানে!

—অ্যাঁ, কিছু বললে তুমি?

ভাগ্যিস কথাটা ভালো করে শুনতে পাননি বক্তিয়ার। চাঁদ সঙ্গে সঙ্গে কথাটা পালটে ফেলে বললেন—বলছিলাম, আমার নসিবে কী সেই সৌভাগ্য লেখা আছে!

বক্তিয়ার বললেন,—আছে। আমার কথামতো চললে অবশ্যই আছে। জানো আমার ক্ষমতা কত? এরপর বক্তিয়ার শুরু করলেন নিজের গুণকীর্তন। সেসব শুনতে শুনতে একসময় সুলতানের প্রাসাদের দরজায় পৌঁছে গেলেন চাঁদ।

সুলতানের প্রাসাদ নগরীর একটু বাইরের দিকে। গম্বুজঅলা বিরাট প্রাসাদ। তবে দিল্লির প্রাসাদগুলোয় যেমন শ্বেতপাথরের জাফরি বা কারুকাজ করা ঝুল বারান্দা থাকে, এ প্রাসাদ তেমন নয়। নিরেট রুক্ষ কালচে পাথরে তৈরি। প্রাসাদের প্রবেশ তোরণের দুপাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে দুজন ক্রীতদাস। দানবাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চেহারা। মুণ্ডিত মস্তক। পরনে ঢিলা ডোরাকাটা পাজামা। সূর্যালোকে ঝিলিক দিচ্ছে অনেকটা খড়গর মতো চওড়া দেখতে খোলা তলোয়ার।

আরও একজনকে অবশ্য এখানে এসে দেখতে পেলেন চাঁদ। সে গজরাজ। প্রবেশ তোরণের বাইরের কিছু দূরে একটা গোটা গাছের গুড়ির সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা অবস্থায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে অসহায় প্রাণীটা। তার হাওদাহীন পিঠ দেখে যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা মোঁচড় দিয়ে উঠল চাঁদের।

BanglaBook.org

প্রাসাদের ভিতরে ঢোকার আগে চাঁদকে কয়েকটা দরবারি কেতা শিখিয়ে দিলেন বক্তিয়ার—সুলতানকে প্রথমে তিনবার কুর্নিশ করবে, তার চোখের দিকে তাকাবে না। সম্বোধন করবে 'দুনিয়ার মালিক' বলে। 'হাঁ' আর 'না' ছাড়া বেশি কথা নিজে থেকে বলবে না।

সুলতানের উপস্থিতিতে অন্য কাউকে কুর্নিশ করবে না। আর দরবার ছেড়ে বেরোবার সময় কখনই পৃষ্ঠদেশ তাঁর দিকে প্রদর্শন করবে না। কুর্নিশ করতে করতে পিছু হেঁটে বাইরে বেরিয়ে যাবে।

বাইরে ঘোড়া ছেড়ে কোমরবন্ধ ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বক্তিয়ার চাঁদকে নিয়ে এগোলেন প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করার জন্য। দ্বাররক্ষী চাঁদকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ঠিকই, কিন্তু বক্তিয়ার সঙ্গে আছেন দেখে পথ ছেড়ে দিল। দিল্লির প্রাসাদগুলোতে সাধারণত দুটো দরবার থাকে। তার একটাতেই বসে শাসক সাধারণ মানুষের প্রার্থনা শোনেন।

অন্যটাতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সভাসদদের নিয়ে বসেন। এখানে তেমন কিছু নেই। একটাই দরবার।

৩

সুলতান বিন-সামের দরবার। গজনীর শাসক তিনি। ভবিষ্যতে গজনীবিদ সাম্রাজ্যের শাসক। দরবারে ঝাঁ-চকচকে তেমন কিছু নেই। যা আছে, তা হল একটা হিমশীতল থমথমে ভাব। পা রাখলেই বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে! সাজপোশাক বা দরবারে খুব একটা জৌলুস পছন্দ করেন না বিন-সাম। বিশাল ঘরটার শেষপ্রান্তে একটা উঁচু বাঁশের তাকিয়া। তার ওপর লাল মখমলের গদিতে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন সাদা পাগড়ি আর জোব্বা পরা বিন-সাম। তাঁর দুপাশে দুজন ক্রীতদাসী। তাদের পরনে ধাতব চাকতির ঝালর দেওয়া খাটো পোশাক। চেহারা দেখে মনে হয় তারা অন্য কোনও মুলুকের হবে। তাদের একজন সুলতানকে পাখার বাতাস করছে, অন্যজন একটা রেকাবি হাতে দাঁড়িয়ে। তাতে সোনার পানপাত্র। ওমরাহ, সেনাপতি আর ক্রীতদাসের দল দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। আরও একজন সে-ঘরে আছে। ভীষণদর্শন ভীমদেহী এক জহ্লাদ।

BanglaBook.org

এ ছাড়া রক্ষীরা তো আছেই।

দরবারে ঢুকে প্রথামতো সুলতানকে কুর্নিশ করল তারা দুজন। এরপর বক্তিয়ার গিয়ে দাঁড়ালেন রইস আদমি, ওমরাহ, সেনাপতিদের সারিতে। আর চাঁদ সংকুচিতভাবে মাথা নীচু করে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে। আধশোয়া বিন-সাম যেন দেখেও দেখলেন না তাঁদের।

চাঁদরা যখন দরবারে ঢুকলেন তখন একটা বিচার শেষ সুলতানের। এক রমণীকে দড়ি বেঁধে আনা হয়েছে সুলতানের দরবারে। নগরের কী একটা ভয়ংকর আইন সে লঙ্ঘন করেছে। বিচার শেষে এবার রায় দেবেন সুলতান। দরবারের সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায়। নিঃশব্দ সভাকক্ষ। বেশ কিছু সময় পর মুহূর্তের জন্য একবার সোজা হয়ে বসলেন সুলতান। তারপর অনুচ্চস্বরে বললেন,—দশ ঘা কড়া। তারপর কোতল।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল রমণী। বাজপাখি যেমন মুরগির ছানা ধরে ঠিক তেমনভাবে জহ্লাদ এসে সেই ক্রন্দনরত রমণীকে দরবার থেকে বের করে নিয়ে গেল। এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরবারের বাইরে কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে স্পষ্ট ভেসে আসতে লাগল রমণীর তীব্র আর্তনাদ। চাঁদ একবার আড়চোখে তাকালেন সুলতানের দিকে। সুলতানের মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন আধশোয়া অবস্থায় উপভোগ করছেন সেই চিৎকার। যেন কোনও মধুর সঙ্গীত শুনছেন তিনি।

এরপর হঠাৎই সেই চিৎকার থেমে গেল। সবাই বুঝতে পারল সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন সেই হতভাগিনী। সারা ঘরে আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। চোখ মুদে আছেন সুলতান। মাঝে মাঝে তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো খেলা করছে পাশে শোয়ানো তলোয়ারের ওপর। যে তলোয়ার দিয়ে তিনি জয় করে এসেছেন দিল্লি। স্বপ্ন দেখছেন দোয়াব-বাংলাসহ তামাম হিন্দুস্থান গজনীবিদের পদানত করার।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার সোজা হয়ে বসলেন সুলতান। চোখ খুলতেই তাঁর নজর গিয়ে পড়ল সোজাসুজি চাঁদের ওপর। বেশ অসন্তুষ্ট ভাবে বিন-সাম বলে উঠলেন,—এই কাফেরদের মতো পোশাক পরা লোকটা কে?

চাঁদ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন বলে তাঁর মুখটা ঠিক চিনতে

BanglaBook.org

পারেননি বিন-সাম। নইলে কারও মুখ, কোনও কথা তিনি ভোলেন না।

প্রশ্ন শুনে সুলতানের কাছাকাছি সারিটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, তার প্রথম লোকটা, বিন-সামের প্রধান পার্শ্বচর তাজউদ্দিন বললেন,—মালিক, ও হল চাঁদ। কবি চাঁদ। কাফের রাজাটাকে কাফেলায় যে দেখভাল করেছে। ওকে আপনি তলব করেছেন মালিক।

বিন-সাম ভুরু কুঁচকে বললেন,—ও একটু আগে বক্তিয়ারের সঙ্গে দরবারে ঢুকল না?

ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি সুলতানের। তিনি তাকালেন বক্তিয়ারের দিকে।

বক্তিয়ার নিজেকে একটু বাঁচিয়ে বললেন,—ওর কাছে ফরমান ছিল না। দেউড়িতে আটকে যাচ্ছিল, আমি দরবারে আসছিলাম, ও আমার পিছন পিছন এল। শুনলাম মালিক হুকুম দিয়েছে তাই আনলাম। গুস্তাকি হলে মাফ করবেন।

বিন-সাম এরপর চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—তা তুমি তো শায়ের, এ মুলুক তোমার কেমন লাগছে? তোমার কাফের রাজাটার তো আর সে সৌভাগ্য হল না! বিদ্রুপ পূর্ণ হাসি ফুটে উঠল সুলতানের ঠোঁটের কোণে।

চাঁদ মাথা নীচু করে বলে উঠলেন,—জন্নত। দুনিয়ার মালিক।

হাসলেন বিন-সাম।

চাঁদ অনুমান করলেন, বিন-সাম খুশি হলেন তাঁর জবাবে।

সুলতান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন,—গর্দানটা নিয়ে যাতে এই জন্নতে ঘুরে বেড়াতে পারো তার জন্য কয়েকটা কাজ করতে হবে তোমাকে। পারবে তো?

—জি দুনিয়ার মালিক। চাঁদ জবাব দিলেন।

সুলতান বললেন,—ওই কাফের রাজটাকে আরও কিছু সবক শেখাব আমি। তার জন্য ওকে সুস্থ করে তোলা প্রয়োজন। বেতামিজটা তো খানাপিনা বন্ধ করে দিয়েছে। এত সহজে ও আমার থেকে পালাতে পারবে না। ওকে তো আমি এখনই কোতলের হুকুম দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। ওকে আমি জিন্দা লাশ বানিয়ে রাখব। ওকে সুস্থ করতে হবে তোমাকে। তোমাকে পাঞ্জা দেওয়া হবে। সেটা নিয়ে তুমি গারদ

BanglaBook.org

ঘরে যাবে। কী পারবে তো?

কথাটা শুনে হরষে-বিষাদ অনুভব করলেন চাঁদ। এক দিকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তোলার সুযোগ, তাঁকে সেবার সুযোগ, আবার একাজের মাধ্যমে ভবিষ্যতে হতভাগ্য রাজাকে আরও ভয়ংকর কোনও যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেওয়া!

চাঁদকে চুপ করে থাকতে দেখে সুলতান ধমকে উঠলেন,—কী চুপ করে আছ কেন?

চাঁদ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন,—দুনিয়ার মালিক হুকুম দিলে সব কাজই করতে পারি আমি।

বিন-সাম, এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,—তুমি তো শুনেছি, দুনিয়ার নানা আজব ভাষা বলতে পারো! শুনেছি বাংলা বলে একটা ভাষা আছে। তা তুমি জানো?

বন্দি রাজপুত রাজার মাতামহ ছিলেন বাংলার শাসক। সেই উপলক্ষে বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলেন পরাজিত দিল্লিশ্বর। তাঁর দিল্লির দরবারেও বেশ কিছু বঙ্গভাষী সভাসদ ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ভাষাটা শিখেছিলেন চাঁদ। লিখতে না পারলেও দোয়াব-বাংলার ভাষাটা বলতে পারেন তিনি। চাঁদ বিন-সামের কথায় জবাব দিলেন,—জানি, দুনিয়ার মালিক।

সুলতান বললেন,—তাহলে এই বাংলা ভাষাটা তোমাকে এই বক্তিয়ারকে তালিম দিতে হবে। শীঘ্রই আমি ওকে দোয়াব-বাংলা অভিযানে পাঠাব ভাবছি। ভাষাটা ওর শিখে নেওয়া জরুরি। শেখাতেও হবে। এটা তোমার দ্বিতীয় কাজ।

চাঁদ এবারও সম্মতিসূচক বাক্য প্রয়োগ করলেন সুলতানের কথায়।

বক্তিয়ার বলে উঠলেন,—দুনিয়ার মালিক সত্যিই আমার মতো বান্দার প্রতি মেহেরবান! এই বলে তিনি কুর্নিশ করলেন সুলতানকে।

কিন্তু এ সময় তাজউদ্দিন বেশ সন্দিগ্ধভাবে বলে উঠলেন,—বান্দার গুস্তাকি মাফ করবেন হুজুরে মালিক। কিন্তু এই কাফেরটা কী এত কাজ করতে পারবে?

বিন-সাম তাঁর কথায় খুব একটা কর্ণপাত করলেন বলে মনে হল না। তিনি ছুঁচলো চিবুকে হাত বুলিয়ে, মাথার তাজ ঠিক করে নিয়ে

BanglaBook.org

বললেন,—কিন্তু তৃতীয় কাজটাই তো সবচেয়ে শক্ত কাজ। সেটা তো এখনও ওকে বলাই হয়নি।

কিন্তু তৃতীয় কাজটা কী? সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সুলতান কী নির্দেশ দেন তা শোনার জন্য। কিন্তু সুলতান নিশ্চুপ। দুরদুর করতে লাগল চাঁদের বুক। সুলতান কী ফরমান দেন কে জানে! হয়তো চাঁদের শ্লোক লেখা আর শেষ হবে না। ধীরে ধীরে যেন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল সুলতানের ঠোঁটের কোণে। বড় কুটিল সেই হাসি। বিন-সাম চাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন,—তুমি তো 'কবি'। মানে, 'শায়ের'। আমাকে নিয়ে শায়েরি লিখতে হবে তোমায়। আমার যেদিন ইচ্ছা হবে সেদিন, সেই মুহূর্তে শুনতে চাইব। না পারলে গর্দান যাবে।

এই বলে হাসতে শুরু করলেন বিন-সাম।

সভার অন্য সভাসদদের মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। শায়েরের শায়েরি লেখাই তো কাজ। তার কাছে এটাই তো সবচেয়ে সহজ ব্যাপার। সুলতান এমন ভাবে কথাটা বললেন যে, না জানি কী ভীষণ কাজ দিচ্ছেন তাকে! হাসির তুফান উঠল সারা দরবারে। সবার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল সুলতান বিন-সামের হাসি।

চাঁদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে 'জি মালিক' বললেও, তিনি হাসিতে যোগদান করলেন না। তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারলেন তিনটে কাজের মধ্যে এ কাজটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। অসম্ভবও বলা যেতে পারে। বিন-সাম কী সব ব্যাপারটা অনুমান করেই তাঁকে এ কাজ করতে বললেন! যে হাতে তিনি এতকাল অগ্নিবংশীয় রাজপুত রাজার বীরগাথা রচনা করলেন, সে হাতে তিনি সুলতানের জয়গাথা লিখবেন কীভাবে? চাঁদ তাঁর সারা জীবন ধরে একটার পর একটা শ্লোক সাজিয়ে রচনা করেছেন সেই বীরগাথা। নিজের কবি প্রতিভা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন সেইসব শ্লোক রচনায়। কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। অন্তিম কিছু শ্লোক রচনা শুধু বাকি। শ্লোকগুলোর মধ্যে যে শুধু রাজার বীরগাথাই ধরা আছে তাই নয়, ধরা আছে দিল্লি-রাজপুতানা-হিন্দুস্থানের ইতিহাসের দুর্লভ মুহূর্তও। কত ছোট-বড় ঘটনা, কত মানুষের কথা! এ সব তিনি শ্লোকের মাধ্যমে তিলতিল করে সাজিয়ে রেখে যাচ্ছেন ভবিষ্যতের জন্য। এখন যদি

BanglaBook.org

সুলতানকে নিয়ে তাঁকে শ্লোক রচনা করতে হয় তবে তাঁকে মুছে ফেলতে হবে তাঁর সারা জীবনের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ সাধনা। মুছে ফেলতে হবে ইতিহাসকে। পরস্পর বিরোধী শ্লোক তিনি রচনা করবেন কীভাবে? সত্যি এ বড় কঠিন কাজ! চাঁদ মাথা নীচু করে চিন্তা করতে লাগলেন এ কথাগুলো।

হঠাৎ সুলতান হাসি থামিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—খামোশ!

ওমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘর। শুধু জহ্লাদটা সুলতানের অলক্ষে দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

সুলতান এরপর তার একজন অনুচরকে ইশারা করতে সে এসে চাঁদের হাতে ধরিয়ে দিল পশুচর্মের ওপর আঁকা সুলতানের পাঞ্জার ছাপ। রাজার কাছে যাওয়ার হুকুমনামা।

সুলতান তারপর চাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন,—এবার তুমি যাও। কিন্তু ফের যদি এই কাফেরের পোশাকে দেখতে পাই তবে চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব। আর কাজগুলো বিশেষত ওই শায়েরির ব্যাপারটা খেয়াল থাকে যেন।

এই বলে আবার তিনি হাসতে শুরু করলেন। এবার অবশ্য অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগদানের সাহস দেখাল না।

চাঁদ এরপর বক্তিয়ারের শেখানো দরবারি কায়দায় সুলতান বিন-সামকে কুর্নিশ জানিয়ে দরবার ছেড়ে বেরোলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কিছু দূরে শিকল বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে গজরাজ। তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সুলতান বিন-সামের পাঞ্জা হাতে চাঁদ ছুটলেন কারাগারের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

৪

গজনী কারাগার। পোশাকি নাম 'ঘউর ফাটক'। সুউচ্চ পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এক জায়গা। কেউ কেউ আড়ালে তাকে ডাকে 'জাহান্নুম' বলে। একবার যে এখানে ঢোকে সে জ্যান্ত বাইরে বেরোয় না। সুলতান বিন-সামের অনুমতি ছাড়া মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।

সেখানেই বন্দি আছে এক কাফের—গুজর ক্ষত্রিয় বংশীয় পরাজিত এক রাজা।

চাঁদ যখন জাহান্নুমের দরজায় পৌঁছোলেন তখন সঙ্গে সুলতান বিন-সামের পরোয়ানা থাকলেও কারা প্রধান সহজে ঢুকতে দিল না তাঁকে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ-তল্লাশির পর, পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা নজরানা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলেন তিনি।

এ যেন এক মৃত্যুপুরী। পাথুরে ঘরগুলো অন্ধকার মৃত্যুকূপ। হিংস্র চেহারার হাবসী ক্রীতদাসরা তলোয়ার আর চাবুক হাতে পাহারা দিচ্ছে সর্বত্র। চাঁদের দিকে তারা সন্দিগ্ধভাবে তাকাচ্ছে। সম্ভবত তাঁর পোশাক আর পাগড়ির জন্যই। এখান থেকে ফিরে অবশ্যই পোশাকটা পালটে ফেলবেন মনে মনে ভেবে নিলেন চাঁদ।

অন্ধকার গোলক ধাঁধায় বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একজন হাবসী তাঁকে এনে দাঁড়া করাল এক কক্ষের সামনে। ঘরঘর শব্দে খুলে গেল কক্ষের লোহার আগল। চাঁদ ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রায় অন্ধকার ঘর। শুধু মাথার ওপরের ঘুলঘুলি দিয়ে একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মি প্রবেশ করছে ঘরে। বাইরের পৃথিবীর চিহ্ন বলতে শুধু ওই আলোক রেখাটাই। চাঁদ দেখতে পেলেন রাজাকে। ঘরের এককোণে শিকল বন্দি অবস্থায় রুক্ষ মাটিতে পড়ে আছেন রাজা। জীবনের যেন কোনও লক্ষণ নেই তাঁর দেহে। ঘরের মধ্যে মৃৎপাত্রে রাখা জল নিয়ে রাজার মাথার কাছে নতজানু হয়ে চাঁদ বসলেন। পাত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঢেলে দিতে লাগলেন রাজার ওষ্ঠাধারে।

হঠাৎ চাঁদকে চমকে দিয়ে রাজা চিৎকার করে উঠলেন,—শয়তান তুর্কি, তোর হাতে জলপানের চেয়ে মৃত্যুও ভালো। কিন্তু তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

আর এর পর মুহূর্তেই রাজা চেপে ধরলেন চাঁদের কণ্ঠদেশ। জলভরতি মৃৎপাত্র চাঁদের হাত থেকে মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে গেল। রাজার আঙুল চেপে বসছে চাঁদের গলায়, দমবন্ধ হয়ে আসছে তার। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সেই নিষ্পেশন শিথিল হয়ে গেল। রাজার অশক্ত হাত খসে পড়ল চাঁদের গলা থেকে। তাঁর দেহে আর শক্তি নেই। রাজার ঠোঁট দুটো শুধু মৃদুমৃদু কাঁপতে লাগল। বিড়বিড় করে কী যেন বলতে

BanglaBook.org

লাগলেন তিনি।

ঘটনার আকস্মিকতায় চাঁদ বিস্মিত হলেও তার পরই আশার একটা রূপোলি রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল চাঁদের মনে। তার মানে, আছে! জীবনের স্পন্দন। তাঁর চিন্তা, জাত্যাভিমান এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি! দীর্ঘপথপরিক্রমা, তপ্তবালুকাময় প্রান্তরের মরুসূর্য সম্পূর্ণ শুষে নিতে পারেনি তার জীবনী শক্তি। যে ভাবেই হোক রাজাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। কিন্তু কীভাবে?

হঠাৎ চাঁদের মনে পড়ে গেল একটা আরকের কথা। মৃতসঞ্জীবণী আরক। চাঁদ বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী। সরস্বতী বন্দনার পাশাপাশি ভেষজ বিদ্যা, জ্যোতিষ বিদ্যা এ সব বিষয়েও তিনি চর্চা করেছেন। তিনি জন্মে ছিলেন লাহোরে। সেখানেই এক বৈদ্য ব্রাহ্মণের কাছে চাঁদ শিখেছিলেন সেই আরক তৈরির কৌশল। বহু বছর আগের ঘটনা। চাঁদ তখনও পা রাখেননি দিল্লি-আজমীরের দরবারে। স্মৃতিধর চাঁদের সে কৌশল আজও মনে আছে। কিন্তু আরক তৈরির উপকরণ তিনি এ দেশে জোগাড় করবেন কীভাবে? তিনি চান না সেই আরক তৈরির পদ্ধতি জেনে যাক তুর্কিরা। মহামূল্যবান সেই আরকের গুণে মৃতদেহেও প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

এই মুমূর্ষু মানুষটাকে কীভাবে সুস্থ করা যায় ভাবতে লাগলেন চাঁদ।

রাজার ঠোঁট কাঁপছে। অনুচ্চস্বরে কী যেন বলছেন তিনি। চাঁদ কান পাতলেন তাঁর মুখের ওপর। অসংলগ্ন টুকরো টুকরো সংলাপ ঘোরের মধ্যে বলে চলেছেন রাজা। কখনও বলছেন, 'খাণ্ডেরাও ওই যে তুর্কিটা পালাচ্ছে! ওকে পালাতে দিও না।' কখনও বলছেন, 'চিতোর রাজ সমর সিংহ, তোমার শুলধারী সেনারা কোথায়?' কখনও আবার বলছেন, রাজকুমারী, শক্ত করে ঘোড়ার কেশর চেপে ধরো। তোমায় মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছি...।' অচেতন অবস্থায় রাজার জীবনের নানা কাহিনি অস্পষ্ট প্রলাপ হয়ে বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ রাজার একটা কথায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো চাঁদ চমকে উঠলেন। রাজা বললেন,—চাঁদবরও শেষে তুর্কিদের দলে ভিড়ল। ছিঃ-ছিঃ, এ কী শুনছি আমি! যে চাঁদকে আমি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে ভাবতাম, যাকে আমি ভ্রাতৃস্নেহে প্রতিপালিত করেছি, সেই চাঁদবরও বিশ্বাসঘাতক!

চাঁদ চমকে উঠে ভালো করে তাকালেন রাজার মুখের দিকে। না,

BanglaBook.org

সচেতন ভাবে নয়, ঘোরের মধ্যেই কথাগুলো বলে উঠলেন রাজা। আর এরপরই দ্বাররক্ষী এসে তলোয়ারের হাতল দিয়ে ঠংঠং শব্দে ঘা দিল দরজায়। চাঁদকে এবার যেতে হবে ঘর ছেড়ে। অচেতন রাজার কপালে পরম মমতায় একবার হাত বুলিয়ে চাঁদ উঠে দাঁড়ালেন। রাজা তখন বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, 'আমৃত্যু রাজপুত রাজা কখনও চোখ নামায় না। আমি চোখ নামাব না...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাঁদ।

জাহান্নুমের বাইরে এসে একটু অবাক হয়ে গেলেন চাঁদ। বক্তিয়ার দাঁড়িয়ে আছেন। চাঁদকে দেখে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এসে তিনি বললেন,—চলো।'

চাঁদ বললেন,—কোথায়?

তিনি বললেন,—আমার আস্তানাটা তোমাকে চিনে আসতে হবে তো। কাল থেকেই শিক্ষাদান শুরু করতে হবে। বেশি সময় নেই, কিছুদিনের মধ্যেই আবার হিন্দুস্থানের দিকে যাত্রা শুরু করব আমরা। প্রথমে যাব কনৌজে তারপর দোয়াব-বাংলা।

বক্তিয়ারের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ঘোড়ার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন চাঁদ। যেতে যেতে বক্তিয়ার জিগ্যেস করলেন,—তা দরবার কেমন দেখলে?

চাঁদ বললেন,—ভালো। তবে সুলতানের সামনে বেশ ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি।

দোয়াব-বাংলা অভিযানের দায়িত্ব লাভের ব্যাপারটা সুলতানের কাছ থেকে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় তাঁর কাছে বেশ কৃতজ্ঞ বক্তিয়ার। তিনি তাই বললেন,—সুলতান বিন-সাম ভয়ংকর মানুষ ঠিকই, কিন্তু তাঁর চরিত্রে বেশ কিছু ভালো গুণও আছে।

—কীরকম? জানতে চাইলেন চাঁদ।

বক্তিয়ার বললেন,—এই যেমন কোন নেশা করেন না বিন-সাম। পরিশ্রমী, আমাদের সব অনুশাসন নিজেও কঠোরভাবে পালন করেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর জেদ আর একগুঁয়ে মনোভাব। নইলে দিল্লি দখল তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

চাঁদ মন্তব্য করলেন,—তা ঠিক উজির সাহেব। প্রথমবার পরাজয়ের

BanglaBook.org

পর তিনি যে ফিরে আসবেন তা আমরা ভাবিনি।

বক্তিয়ার সাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—দ্বিতীয়বারের অভিযানের পিছনে যে গল্পটা আছে সেটা তোমায় সংক্ষেপে বলি—

তোমাদের কাফের রাজাটা তো প্রথমবার আমাদের পুরোবাহিনীকেই নিকেশ করে দিল। সেটা অবশ্য কখনই হত না যদি না আমাদের ঘোড়াগুলো তোমাদের হাতি নামক অদ্ভুত জীবটাকে দেখে ভয় পেয়ে যেত। আসলে হাতিগুলো না থাকলে কাফের রাজাটা দাঁড়াতেই পারত না আমাদের সামনে। যেমন এবার হল। চাঁদ সে যুদ্ধে নিজেও রাজার সঙ্গে হস্তিপৃষ্ঠে ছিলেন।

হাতির ব্যাপারটা বিন-সামের পরাজয়ের একটা কারণ হতে পারে ঠিকই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ রাজপুতদের বীরত্ব। একলিঙ্গদেবের উপাসক খড়গধারী যোদ্ধাদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তুর্কি তলোয়ার। বিন-সাম কোনওক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। আর দ্বিতীয়বারের যুদ্ধেও রাজা পরাজিত হতেন না, যদি না বিন-সাম যুদ্ধের রীতি লঙ্ঘন করতেন।

রাজপুতরা সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত যুদ্ধ করেন না। এটা সনাতন রীতি তাঁদের। সারাদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত উভয়পক্ষের সৈন্যদের অন্তিম সংস্কার করার জন্য, মৃত বীরের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য এই নিয়ম। আর এ সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিলেন ধূর্ত বিন-সাম। অতর্কিতে আক্রমণ হেনে ছিলেন অন্ধকারে। পরাজিত হয়েছিল রাজপুত বাহিনি।

এ কথা চাঁদ বলতে পারতেন বক্তিয়ারকে। কিন্তু এ লোকটা চটে গেলে চাঁদের সমূহ বিপদ। তাই বক্তিয়ারের বকবক তিনি শুনে যেতে লাগলেন—সে যুদ্ধে তো হারলাম আমরা। তারপর যাত্রা শুরু করলাম এ মুলুকের দিকে। সেদিন আমরা তাঁবু ফেলেছি খাইবার পথের ঢালে এক জঙ্গলে। সুলতানের সঙ্গী বলতে আমি, কুতুবুদ্দিন, তাজউদ্দিন আর মাত্র কয়েকজন সৈন্য। মাঝরাতে হঠাৎ বাঘের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বিন-সাম তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরোলেন, তাঁর পিছনে আমরা। কিছু দূরে গিয়ে চাঁদের আলোতে দেখি এক অদ্ভুত দৃশ্য। জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় গাছের গুড়ির চারপাশে চক্কর কাটছে একটা বিরাট বাঘ! অদ্ভুত ব্যাপার! গুড়ি ঘিরে সে চক্কর দিচ্ছে কেন? আমরা আড়াল থেকে

BanglaBook.org

ব্যাপারটার কারণ খুঁজতে লাগলাম। আর এরপরই একটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ কানে এল গুড়ির ভিতর থেকে। ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হল। বন্য বরাহর ডাক! বাঘের তাড়া খেয়ে প্রাণীটা আশ্রয় নিয়েছে গাছের ফোকরে। তাকে ধরার জন্যই ঘুরছে বাঘ। এবার আর তার মুক্তি নেই।

বাঘ কীভাবে শিকারটাকে ধরে তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। গুড়িটাকে বেড় দিয়ে ঘুরেই চলেছে বাঘ। আর এর পরই এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। বাঘটা মনে হয় মুহূর্তের জন্য অসর্তক হয়ে গেছিল। আর সেই সুযোগে বরাহটা গুঁড়ি থেকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে তার কিরিচের মতো দাঁত দুটো বিধিয়ে দিল বাঘের পেটে। মুহূর্তের মধ্যে শিকারি পরিণত হল শিকারে। আর এই ঘটনাই চোখ খুলে দিল বিন-সামের। অতর্কিতে আক্রমণ হেনে পরাস্ত করতে হবে কাফেরদের। গজনী ফিরে এসেই আবার দ্রুত অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। তোমাদের কাফের রাজা দাঁড়াতেই পারল না তুর্কি তলোয়ারের সামনে। হ্যাঁ তাঁর খবর কী? কেমন দেখলে তাঁকে?

কথা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন বক্তিয়ার।

চাঁদ জবাব দিলেন,—বিশেষ ভালো নয়, দেখা যাক কী করতে পারি।

বক্তিয়ার বললেন,—তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলো কাফেরটাকে। যুদ্ধ জয়ের উপলক্ষ্যে ক'দিনের মধ্যেই বিন-সাম নিশানাবাজির আয়োজন করবেন। তোমাদের কাফের রাজাটাও তো নাকি ভালো তির চালাতে পারে। সুলতান আজ দরবারে বলছিলেন তার তিরন্দাজি দেখবেন তিনি। এই বলে হাসতে লাগলেন বক্তিয়ার।

তাঁর অলক্ষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন চাঁদ। আর কত পরিহাস করা হবে রাজাকে নিয়ে। তার চেয়ে এসব ঘটনা ঘটার আগেই রাজার মুখে বিষ তুলে দিয়ে তাঁর অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন তিনি।

এ কথাটা ভাবার পরক্ষণেই চাঁদের মনে হল, ছিঃ-ছিঃ, এসব কী ভাবছি আমি! রাজার মৃত্যু কামনা করছি! যে গাথা আমি সারা জীবন ধরে রচনা করে গেলাম, তার শেষ পংক্তিতে কী লিখব আমি? লিখব, আমিই রাজার হত্যাকারী! তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো। না, না, যে ভাবেই হোক রাজাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। তার পর যা হয় হবে।

BanglaBook.org

আর এরপরই একটা বুদ্ধি এল চাঁদের মাথায়। তিনি হঠাৎ বক্তিয়ারকে বললেন,—তাহলে কী দোয়াব অভিযানের ব্যাপারটা সত্যিই আপনার ওপর ন্যাস্ত করলেন সুলতান। ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল?

ঘোড়া চালাতে চালাতে বক্তিয়ার বললেন,—ব্যাপারটা তুমি তো দরবারে নিজের কানেই শুনলে। আবার উজবুকের মতো প্রশ্ন করছ কেন?

চাঁদ বললেন,—না, মানে ইয়ে, উজির সাহেব অনুগ্রহ করে আমার দিকে একটু তাকাবেন?

চাঁদের কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে বক্তিয়ার তাকালেন তাঁর দিকে।

মুহূর্তখানেক বক্তিয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে চাঁদ বলে উঠলেন, —সর্বনাশ। একলিঙ্গদেব আপনার মঙ্গল করুন।

বক্তিয়ার অবাক হয়ে বললেন,—কী পাগলের মতো বকছ তুমি?

চাঁদ মাথা নীচু করে বললেন,—গুনহা নেবেন না উজির সাহেব। কবিতা লেখার পাশাপাশি চিকিৎসা শাস্ত্রটাও আমার জানা আছে। আপনার চোখ দেখে আমার নিশ্চিত ধারণা হচ্ছে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হতে চলেছেন আপনি। ব্যাপারটা আপনাকে দেখার পরই মনে হচ্ছিল, কিন্তু কবুল করতে পারিনি।

বক্তিয়ার আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন,—তার মানে? সেটা আবার কী রোগ?'

চাঁদ জবাব দিলেন,—সে ভয়ংকর রোগ! মানুষ পাথর হয়ে যায় হাত-পা নাড়াতে পারে না। জিন্দা লাশ বনে যায়। ঠিক যেমন এখন রাজার অবস্থা। তিনি হয়তো ঠিক হলেও হতে পারেন, কিন্তু একবার কারও সন্ন্যাস রোগ হলে সে রোগ সারে না। আপনার শরীর কি একটু দুর্বল লাগছে?

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে চাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বক্তব্যের সত্যতা নিরুপনের চেষ্টা করতে লাগলেন বক্তিয়ার। ক'দিন ধরে বক্তিয়ারের শরীরটা একটু দুর্বল মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে তো দীর্ঘ পথপরিক্রমার পরিশ্রমজনিত কারণে বলেই ভেবেছিলেন বক্তিয়ার। তাহলে এই দুর্বল ভাবের আসল কারণ কী...

চাঁদ এরপর হতাশ সুরে বললেন,—আসলে আমার নসীবটাই মন্দ।

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম উজির সাহেব বরাত ফিরিয়ে দেবেন এই কাফেরের। উজির সাহেব দোয়াবের সিংহাসনে বসবেন, আর আমি হব আপনার সভা কবি! সে আর নসীবে নেই।

বক্তিয়ার ধন্দে পড়ে গিয়ে বললেন,—তুমি কি সত্যি বলছ? বেতামিজি করলে গর্দান নেব।

চাঁদ বিষণ্ণভাবে বললেন,—হুজুরের মর্জি হলে এখনই নিন। হুজুরই যদি না থাকেন তবে এ মুলুকে তো যে-কোনও দিন আমার কোতলের ফরমান হবে। তবে আমি এক বর্ণ মিথ্যা বলছি না। উজির সাহেব সন্ন্যাস রোগে পড়বেন।

চাঁদের কথা বলার ধরন দেখে বক্তিয়ার এবার আর ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। তিনি বললেন,—তাহলে কী করা যায়?

চাঁদ বললেন,—আপনি দরবারি হেকিম সাহেবকে ব্যাপারটা জানান।

বক্তিয়ার প্রথমে বললেন, 'ঠিক আছে তাই করি।' কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন এ ব্যাপারটা যদি বিন-সামের কানে চলে যায় তবে তিনি হয়তো দোয়াব অভিযানের দায়িত্ব অন্য কারও হাতে তুলে দেবেন। বিশেষত যখন ওই তাজউদ্দিন আছে, তখন ব্যাপারটা ঘটতে কতক্ষণ! এ ব্যাপারটা চট করে মাথায় আসতেই বক্তিয়ার চাঁদকে বললেন,—আচ্ছা তুমি কিছু করতে পারো না?

চাঁদ একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—পারি। ভেষজ বিদ্যা আমারও জানা আছে। কিন্তু উজির সাহেব কী এই নবাবের ওপর বিশ্বাস রাখবেন? তবে কিছু জিনিস জোগাড় করে দিতে হবে আমাকে। কিছু লতা-পাতা-শিকড়-ধাতু ইত্যাদি। উজির সাহেবকে যদি সুস্থ না করতে পারি তবে গর্দান জামিন রইল।

বক্তিয়ার বললেন,—সেই ভালো। নিজের ব্যাপারে আমি দরবারি হেকিমকে জড়াতে চাই না। আমার চেনা অন্য এক বুড়ো হেকিম আছে। তার থেকে জিনিসগুলো জোগাড় করব আমি। তুমি বলো কী কী লাগবে? তবে সাবধান, এ ব্যাপার যেন কাক-পক্ষী টের না পায়।

চাঁদ জবাব দিলেন,—আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন উজির সাহেব। তবে যত শীঘ্র সম্ভব জিনিসগুলো জোগাড় করে দিন।

কিছু সময় পর চাঁদ পৌঁছে গেলেন বক্তিয়ারের বাড়িতে। ওষুধ তৈরির

BanglaBook.org

জন্য যা যা উপকরণ লাগবে তা লিখে দিলেন বক্তিয়ারকে। সেই ফর্দে কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের কথাও লিখলেন চাঁদ। যাতে সেই হেকিম বা বক্তিয়ার আসল ব্যাপারটা ধরতে না পারেন।

৫

মাঝে বেশ ক'টা দিন কেটে গেছে। অন্যদিনের মতো সেদিনও সূর্য মাথার ওপর ওঠার আগেই চাঁদ রওনা হলেন জাহান্নুমের উদ্দেশ্যে। ক'দিন ধরে রোজ সকালে তিনি উপস্থিত হন ঘউর ফাটকে। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সেখানে সময় কাটিয়ে বিকালে যান বক্তিয়ারের আস্তানায় তাঁকে বাংলাপাঠ দানের জন্য। আর রাতে নিজের আস্তানায় ফিরে আরক তৈরির কাজে মন দেন। কিছুটা হলেও চাঁদের মন উৎফুল্ল। কারণ তাঁর আরক কাজ দিতে শুধু করেছে। রাজার শরীরের ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে, হাত-পা নাড়ছেন তিনি, মাঝে একবার নিজে থেকে উঠে বসারও চেষ্টা করেছিলেন, প্রলাপও আর বকছেন না। তবে এখনও তিনি কোনও কথা বলেননি। সুস্থতার সব লক্ষণ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হচ্ছে তাঁর শরীরে।

ভাগ্যিস বক্তিয়ার আরক তৈরির জিনিসগুলো জোগাড় করে এনে দিয়েছিলেন। তাকেও আরক প্রস্তুক করে প্রত্যহ দিয়ে আসছেন চাঁদ। তা পান করে বক্তিয়ারও বেশ চনমনে হয়ে উঠছেন, মেজাজটাও খোশ হয়ে উঠছে। একই আরক। সেটাও বলবর্ধক, কিন্তু তা মৃতসঞ্জীবনী আরক নয়। আরক প্রস্তুত করার পর চাঁদ বক্তিয়ারের জন্য একটা অংশ আলাদা করে রেখে বাকি অংশে রক্ত মিশিয়ে সেই আরককে পরিণত করেন মৃতসঞ্জীবনীতে। যা সুস্থ করে তুলছে রাজাকে। নিজেরই রক্ত আরকে মেশাচ্ছেন চাঁদ। যে রক্তে মিশে আছে রাজার ঋণ। সে ঋণ শোধ করার চেষ্টা করছেন চাঁদ।

মনটা একটু ভালো বলে চাঁদ ভাবছিলেন, রাতে সময়-সুযোগ করে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসবেন। বহুদিন লেখায় সুযোগ পাননি তিনি। লিখতে না পারার কারণে চাঁদের বুকের ভিতর একটা চাপা যন্ত্রণা কাজ করছে। কারণ লেখাটাই তো তাঁর আসল কাজ। সে কাজ থেকে বঞ্চিত

BanglaBook.org

হয়ে আছেন তিনি। বহু যুগ আগে চাঁদের নাম ছিল, 'চাঁদভট্ট,' নিতান্ত অখ্যাত লাহোরের এক ভট্ট-কবি—'চাঁদভট্ট।' তারপর এক রাতে স্বপ্নে দেবী সরস্বতী চাঁদকে বরদান করলেন। চাঁদভট্ট তার নির্দেশে শ্লোক লেখা শুরু করলেন। দেবীর বর লাভ করে চাঁদভট্ট থেকে তিনি পরিচিত হলেন চাঁদবর-চাঁদবরদই নামে। তারপর থেকে কত সহস্র শ্লোক রচনা করেছেন চাঁদ। তাঁর কলম থেমে থাকলে যন্ত্রণা তো হবেই। কী লিখবেন সে ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে চাঁদ এক সময় পৌঁছে গেলেন ঘউর ফাটকে।

চাঁদ এখন এখানে নিয়মিত আসাযাওয়া করছেন বলে রক্ষীরা তাঁর মুখ চিনে গেছে। কিন্তু তা বলে তাদের যে ভাবের পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। তাদের সেই একই হিংস্র চাহনি, একইরকম কঠিন মুখভঙ্গি। শুধু একটা ব্যাপার এই যে চাঁদকে তারা আর তেমন জিজ্ঞাসাবাদ করে না। চাঁদ ফাটকের সামনে উপস্থিত হলে তারা বাক্যব্যয় না করে লোহার দরজা খুলে দেয়। এর পিছনে অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। চাঁদ তাঁর কাফের পোশাক পালটে ফেলেছেন। তিনি এখন লম্বা ঝুলের আফগানি জোব্বা পরা শুরু করেছেন। মাথায় পারসিক কায়দায় পাগড়ি বাঁধছেন গজনীর লোকদের মতো।

সর্পিল সুড়ঙ্গ আকৃতির অলিন্দ, দুপাশে সারবদ্ধ অন্ধকূপ। সেসব পার হয়ে চাঁদ গিয়ে দাঁড়ালেন সেই পাথুরে ঘরের সামনে। প্রহরী দরজা খুলে দিল। চাঁদ পা রাখলেন আঁধো-অন্ধকার ঘরে। পিছনে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মাথার ওপর ফোকর গলে আসা মৃদু আলোতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন চাঁদ। রাজা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে উঠে বসেছেন।

সম্ভবত দরজা খোলা-বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনেই তিনি বুঝতে পেরেছেন ঘরে কেউ ঢুকেছে। চাঁদকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন,—আমি কোথায়?

একটু ইতস্তত করে চাঁদ জবাব দিলেন,—গজনীতে। এটা গজনী মুলুক।

—গজনী মুলুক! বিড়বিড় করে কথাটা বারকয়েক বললেন রাজা।

চাঁদ তাঁর জোব্বার মধ্যে লুকিয়ে রাখা আরকের পাত্রটা বার করে রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু তার লঘু পদশব্দও টের পেলেন রাজা। তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি কে?

থমকে গেলেন চাঁদ। তার বুক এবার কাঁপতে শুরু করেছে। নিশ্চুপ

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

জবাব না পেয়ে রাজা বলে উঠলেন,—জবাব দিচ্ছ না কেন? তুমি জানো কে আমি? আমি রাজা। শাকম্বর রাজ্যের রাজা। দিল্লি-আজমীর আমার রাজধানী। হতে পারে আমি তরারীর যুদ্ধে পরাজিত, তোমাদের সুলতান আমাকে শিকলবন্দি করে রেখেছে। কিন্তু রাজা রাজাই থাকে। তোমাদের সুলতানও স্বয়ং আমার মাথা তাঁর সামনে ঝোঁকাতে পারেননি, আর তুমি সামান্য প্রতিহার আমার কথার জবাব দিচ্ছ না!

চাঁদ এবার অনুচ্চ স্বরে ভয়ে ভয়ে বললেন,—আমি চাঁদ-চাঁদবর...

চাঁদবর!! মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল রাজার ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলে। ঠিক এই ভয়টাই করছিলেন চাঁদ। এরপর ধীরে ধীরে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল রাজার ঠোঁটের কোণে। তিনি বললেন,—সুলতানের দরবারি হয়ে কেমন লাগছে চাঁদবর? আমি তো তোমায় তেমন কিছু দিতে পারিনি। মইজুদ্দিন নিশ্চয়ই দিচ্ছে। কত মোহর পাচ্ছ বলো? তা তোমাকে কি এখনও চাঁদবরই বলব, না কি নাম বদলে এখন তুমি চাঁদউদ্দিন হয়েছ?

চাঁদ জবাব দিলেন,—আমি এখনও চাঁদবরই আছি।

রাজা আবার ব্যঙ্গ করে বললেন,—ও এখনও চাঁদবরই আছ!

আর এর পরই রাজা স্বক্ষোভে বলে উঠলেন,—ছিঃ-ছিঃ চাঁদবর, তুমি একবার ভাবলে না রাজার কথা। দেশের মাটির কথা। তরারী প্রান্তরে যে এক লক্ষ রাজপুত বীর শহিদ হল তাঁদের কথা? তুমি কি দেখোনি সেনাপতি খণ্ডেরাওকে, দ্যাখোনি চিতোর রাজ সমর সিংহকে? দেখোনি যুদ্ধক্ষেত্রে চোদ্দো বছরের বালক কল্যাণ সিংহর আত্মবলিদান? চোখ থাকতেও আমার আগেই কি তুমি অন্ধ-বধির হয়ে গেছিলে? নইলে কেন তুমি দেখতে পেলে না সেসব আত্মবলিদান! শুনতে পেলে না অসহায় রাজপুত রমণীদের ক্রন্দন! ছিঃ চাঁদবর ছিঃ! কথাগুলো বলার পর ঘৃণায়—ক্রোধে কেঁপে উঠল রাজার শরীর। তাঁর গায়ের লোহার শিকলগুলো ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল।

চাঁদ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তিনি কী জবাব দেবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

একটু থামার পর রাজা আবার স্বক্ষোভে বললেন,—মইজুদ্দিনের চোখে

BanglaBook.org

চোখ রেখে তার সামনে মাথা না ঝুঁকিয়ে কথা বলায় তার অনুচরেরা যখন তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে আমার দু-চোখ অন্ধ করে দিল, তখনও আমার তেমন যন্ত্রণা হয়নি। আঘাত-ক্ষত তো রাজপুতরাজার ভূষণ। যুদ্ধক্ষেত্রেও তা হতে পারত। কিন্তু যখন আমাকে শিকল বেঁধে মইজুদ্দিনের সামনে হাজির করা হল, তখন যেই ভিড়ের মাঝে এক ঝলক তোমাকে দেখে যে যন্ত্রণা পেয়েছিলাম, তার তুলনায় লৌহ শলাকার যন্ত্রণা কিছুই নয়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেলে। তারপর তোমাকে আমি দেখতে পেলাম মইজুদ্দিনের দরবারে। এ দেখার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল!

চাঁদ আর চুপ করে না থাকতে পেরে বললেন,—মইজুদ্দিনের তাঁবুতে তুমি আমাকে সেদিন দেখেছিলে ঠিকই। কিন্তু আমি ওদের দলে গিয়ে যোগ দেইনি। দিল্লির চক থেকে ওরা আমাকে ধরে ফেলে। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরছিলাম আমার দশ ছেলেকে নিয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য। আমি তো কোনও কাজে আসতাম না। তারা তোমার কাজে আসবে এই ভেবে। পথের মাঝে ধরা পড়ে গেলাম। হাজির হলাম মইজুদ্দিনের শিবিরে। জহ্লাদ যখন তোমার চোখ দুটো গেলে দিল, তখন তুমি কোনও শব্দ করোনি। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে যে আর্তনাদটা শোনা গেছিল, সেটা আমারই। মনে হচ্ছিল সে যেন আমার চোখেই শলাকা ঢুকিয়ে দিল।

রাজা চিৎকার করে উঠলেন,—মিথ্যা কথা! কেন, তুমি সে সময় পারতে না, কারও কোষ থেকে একটা তলোয়ার টেনে নিয়ে মইজুদ্দিনের দিকে ছুটে যেতে? কেন পারলে না! কীসের লোভে! নারীরত্ন না কি স্বর্ণমুদ্রা? নাকি মৃত্যু ভয়ে?

চাঁদ বললেন,—বহু যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমার সঙ্গে থেকেছি ঠিকই, কিন্তু তখনও আমার হাতে কলমই থাকত। অস্ত্র বলো, শস্ত্রো বলো—সবই আমার কলম। আমি তো তলোয়ার ধরতে শিখিনি কোনওদিন। কীভাবে আমি ছুটে যেতাম মইজুদ্দিনের দিকে? আর নারী বা অর্থের লোভ কোনওটাই আমার নেই। মনে আছে, একবার যখন তুমি নাগোর রাজ্যে এক ভাঙা দেউলের নীচ থেকে পাঁচকোটি স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করলে, তখন তুমি আমাকে তার অর্ধেক প্রদান করতে চেয়েছিলে? আমিই

BanglaBook.org

তোমার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলেছিলাম।

—তা হলে কী কারণ?

একটু চুপ করে থেকে চাঁদ বললেন,—মৃত্যুভয় কিছুটা বলতে পারো।

—রাজপুতের মৃত্যুভয়! তুমি কী দ্যাখোনি কল্যাণ সিংহকে। কীভাবে অতটুকু বালক হাসতে হাসতে তরারীর প্রান্তরে প্রাণ দিল? কোথা থেকে সে ওই সাহস সঞ্চয় করল? সে সাহস তাকে যুগিয়েছে তার ধমনীতে প্রবাহিত রাজপুত রক্ত। সে রক্ত কী নেই তোমার শরীরে?

চাঁদ জবাব দিলেন,—আছে। তবে মৃত্যুভয়ও আছে। কিন্তু সে ভয় নিজের জন্য নয়। তুমি তো জানো, তোমার জীবন গাথা লিখছি আমি। তোমার শৌর্য-বীর্য-সংগ্রাম-আত্মত্যাগ আমি শ্লোকের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য। যা পাঠ করে ভবিষ্যতে রাজপুতরা উদ্বুদ্ধ হবে মাতৃভূমি রক্ষার্থে সংগ্রামে আত্মবলিদানে। সে কাজ এখনও সামান্য কিছুটা বাকি আছে। তা ছাড়া সুলতানের দলে মিশে গিয়ে আরও একটা সম্ভাবনাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি আমি...।

—কীসের সম্ভাবনা? এবার কিছুটা যেন নরম শোনাল রাজার গলা।

চাঁদ বললেন,—তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনা। দিল্লি থেকে এই গজনী, এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দিনরাত সবসময় তোমার পাশে পাশে কাটিয়েছি আমি। অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন এক মানুষের পাশে। তোমার পরিচর্যার সুযোগ পেয়েছি আমি। প্রবেশ করতে পেরেছি এই অন্ধ কুঠুরিতে। মইজুদ্দিনের শিবিরে মিশে না গেলে এ সুযোগ পাওয়া যেত না।

—কিন্তু, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? একটা অন্ধ-পঙ্গু মানুষ আমি। রাজ্য নেই, ধনুক নেই, সৈন্য নেই, কেউ নেই! তরারীর অভিশপ্ত প্রান্তরে সব হারিয়ে গেছে আমার। মইজুদ্দিনের দয়ার ওপর নির্ভর করে আমি বেঁচে আছি একথা ভাবতেই ঘৃণায় শিউরে উঠছে সর্বাঙ্গ। চাঁদবর, যদি সত্যিই আমার প্রতি তোমার সামান্যতম ভালোবাসা থাকে, তবে তুমি আমাকে বিষপাত্র এনে দাও। আমাকে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে তুমি মুক্তি দাও। আমার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবেন তোমাকে।

চাঁদ প্রত্যুত্তর দিলেন,—তুমিই তো একদিন বলতে আমৃত্যু রাজপুতদের

BanglaBook.org

সংগ্রাম শেষ হয় না। এখনও তোমার সবকিছু হারিয়ে যায়নি। তোমার জাত্যাভিমান, তোমার ক্ষত্রিয় রক্ত, তোমার তেজ। তা ছাড়া এ মুলুকে দুজন তোমার সঙ্গে আছি। চাঁদবর আর গজরাজ।

—গজরাজ!! তার নামটা শুনে এত কষ্টের মধ্যেও রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

চাঁদ বললেন,—হ্যাঁ, সে-ও আছে এখানে। তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করে সেই তোমাকে এখানে বয়ে এনেছে। সারাটা পথ আমাকে ছাড়া কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তোমার অচৈতন্য শরীরে পরম মমতায় শুঁড় বুলিয়েছে সারাটা পথ। অবিরত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে তাঁর দু-চোখ বেয়ে। গজরাজ কথা বলতে পারে না। কিন্তু তোমার প্রতি ওর কী অসীম ভালোবাসা! ঠিক যেন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক!

গজরাজের কথা শুনে রাজা বেশ উৎফুল্ল ভাবে বললেন,—ওকে তো আমি পুত্রস্নেহেই মানুষ করেছি। সেই কতযুগ আগে সুদুর সিংহল থেকে ওকে ছোট্ট অবস্থায় আনা হয়েছিল। তারপর থেকে তো ও আমার কাছেই মানুষ। তোমার মনে আছে চাঁদবর, ছোটবেলায় ও তোমাকে দেখলেই ওর ছোট শুঁড় দিয়ে তোমাকে কেমন উত্যক্ত করত! মনে আছে, ওর পিঠে চেপে আমরা দুজন নগর পরিদর্শনে বেরোতাম?

চাঁদ বললেন,—জানো ওরা প্রচার করেছে তুমি আর জীবিত নেই। লাহোরে হত্যা করা হয়েছে তোমাকে। তোমার পোশাক পরিয়ে একটা মুন্ডহীন দেহ ওরা টাঙিয়ে রেখেছিল লাহোরের রাজপথে। লাহোর থেকে গজনী আসার পথে সুযোগ পেলেই আমি কাগজের টুকরো ফেলতে ফেলতে এসেছি। তাতে লিখেছি তোমার জীবিত থাকার খবর।

—কী হবে ওতে?

—যদি রাজপুতরা জানতে পারে তোমার জীবিত থাকার সংবাদ। যদি সে সংবাদ পেয়ে জোটবেঁধে মুক্ত করতে পারে দিল্লি, যদি তুমি কোনওদিন ফিরে গিয়ে পুনরুদ্ধার করতে পারো তোমার রাজ্য...

চাঁদ এরপর আরকের পাত্রটা রাজার হাতে দিয়ে বলল,—এটা এবার পান করো, মৃতসঞ্জীবনী আরক। দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে হবে তোমাকে।

পাত্রটা হাতে নিয়ে চাঁদের কথা শুনে রাজা চমকে উঠে বললেন,—

BanglaBook.org

মৃতসঞ্জীবনী আরক! তুমি না আমাকে একবার বলেছিলে এ আরকে রক্ত মেশানো থাকে? এ কার রক্ত পান করার জন্য আমার হাতে আরক তুলে দিচ্ছ তুমি?

চাঁদ মৃদু হেসে বললেন,—তুমি নিশ্চিন্তে পান করো। এ রক্ত গজনী মুলুকের কারও নয়, চাঁদবরের রক্ত।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে পান করে নিলেন আরক। আর এরপরই দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। চাঁদের কক্ষ ত্যাগের সময় হয়ে গেছে। আরকের পাত্রটা চাঁদ তাড়াতাড়ি পোশাকের ভিতর লুকিয়ে ফেললেন।

৬

রাজা এখন অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। হাঁটা-চলা-কথাবার্তা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তাঁর। চাঁদের অনুমান আর দিন তিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন রাজা। কিন্তু তারপর? মাঝে মাঝেই একটা অশুভ আশঙ্কা চাঁদের মনে কাজ করে। রাজার সঙ্গে তার সেই প্রথম কথোপকথনের পর আরও বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। নানা কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে। কখনও ফেলে আসা সোনালি অতীতের গল্প, কখনও বা রাজা জিগ্যেস করেন গজনীর খবরাখবর। চাঁদ সাধ্যমতো তার প্রশ্নের জবাব দেন। কথাবার্তার সময় কখনও কখনও রাজা বাচ্চাছেলেদের মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, কখনও আবার প্রচণ্ড ঘৃণায়-ক্রোধে ফুঁসে ওঠেন অসহায় রাজা। অভিসম্পাত দেন নিজের ভাগ্যকে। একটা কথা তিনি প্রায়সই জিগ্যেস করেন,—এই গজনী নগরী কী আমার দিল্লির চেয়ে বেশি সুন্দর?

চাঁদ জবাব দেন,—না রাজা। দিল্লি নগরীর মতো এ দেশে প্রাণের উচ্ছলতা, মহার্ঘ প্রাসাদের জৌলুস কিছুই নেই। এ নেহাতই প্রাণহীন রুক্ষ এক মরু শহর। দিল্লির মতো রাজাও এখানে নেই, বৈভবও নেই, বিন-সামের দরবার তো যে-কোনও রাজপুত ভূস্বামীর কক্ষের চেয়েও নগণ্য। আর দিল্লির দরবারের সঙ্গে তার কোনও তুলনাই চলে না।

BanglaBook.org

চাঁদের কথা শুনে খুশি হন রাজা। স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি চলে যান অতীতে। তাঁর শূন্য অক্ষিকোটরে ধরা দেয় ফেলে আসা দিল্লির দরবার প্রাসাদের জৌলুস, আজমীর হ্রদের শ্বেতমর্মর সোপানশ্রেণি, আলোক প্রদীপ মালায় ঝলমল করা রাতে দিল্লির চক বাজার। যেখানে তিনি অতিবাহিত করেছেন তাঁর সোনালি জীবন-যৌবন।

চাঁদ আবার লিখতে শুরু করেছেন। রাজার গজনীর বন্দিজীবন তিনি শ্লোকের মাধ্যমে ধরে রাখছেন ভবিষ্যতের জন্য। লিখছেন তাঁর দেখা এই মরু শহরের কথা। চাঁদের বুকের ভার কিছুটা লাঘব হচ্ছে এতে। কিন্তু ইদানীং চাঁদের দেহ বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আরক তৈরির জন্য রোজ বেশ কিছুটা করে রক্ত ক্ষরণ হয়, তার ওপর সারা রাতই প্রায় জেগে কাটান। দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত আরক প্রস্তুত করে তিনি লিখতে বসেন। যখন শুতে যান তখন শুকতারা ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গজনী মিনার থেকে ছড়িয়ে পড়ে আজানের সুর। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন চাঁদ। নিজের গৃহস্থলীর কাজ সাঙ্গ করে তিনি ছোটেন জাহান্নুমের দরজায়। দ্বিপ্রহরে ক'দিন ধরে আবার যেতে হচ্ছে গজরাজের কাছে। তারপর সেখান থেকে বক্তিয়ারের বাড়ি। বিশ্রামহীন চাঁদের শরীর দুর্বল তো হবেই।

এর মাঝে ক'দিন আগে আর একবার সুলতানের দরবারে ডাক পড়েছিল চাঁদের। বক্তিয়ারের সঙ্গেই চাঁদ সেখানে গেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিন-সাম হয়তো তাঁর ন্যাস্ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন। চাঁদ দরবারে হাজির হয়ে দেখলেন ব্যাপারটা অন্য। বিন-সাম সেসব প্রসঙ্গ তুললেনই না। ঘটনাটা হল বিন-সাম গজরাজের পিঠে সওয়ার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি খেয়াল করেছেন ঘোড়ার থেকে হাতি অনেক বেশি নিরাপদ। শত্রুর অস্ত্রের আঘাত সব সময় হাতির পিঠ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। যা পৌঁছায় তা হল তির। তার থেকেও রক্ষা পাওয়ার জন্য গজরাজের পিঠে বিন-সাম সওয়ার হওয়ার আগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বানানো হয়েছে ইস্পাতের জালের তৈরি এক খাঁচা। তাতে ঢুকে বসলে তার ভিতর থেকে তির ছোড়া যাবে, কিন্তু বাইরের কোনও আঘাতই স্পর্শ করতে পারবে না বিন-সামকে। হাওদার ওপর দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো হবে জায়গাটা।

BanglaBook.org

কিন্তু খাঁচাটা বানানো হলেও সেটা গজরাজ তার পিঠে কিছুতেই তুলতে দিচ্ছিল না। কেউ তার কাছে গেলেই ক্রুদ্ধ চিৎকারের সঙ্গে মুগুরের মতো শুঁড় আন্দোলিত করছিল, ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিল পায়ের বেড়ি।

হাতি নামের প্রাণীটাকে এমনিতেই এ মুলুকের লোকে বিস্ময়ের চোখে দেখে। তার ওপর গজরাজের ওই মূর্তি দেখে তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছিল না কেউ। আর সেজন্যই ডাক পড়েছিল চাঁদের। তাঁর নিজস্ব একটা হাতি ছিল দিল্লিতে। তার নাম গণপতি। রাজাই চাঁদকে দান করেছিলেন হাতিটা। হাতির স্বভাব সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান চাঁদের আছে, তা ছাড়া চাঁদকেই গজরাজ তার কাছে যেতে দেয়, পছন্দও করে।

বিন-সামের নির্দেশে গজরাজকে শান্ত করে তার পিঠে খাঁচাটা তুলিয়ে এসেছেন চাঁদ। সুলতানই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন রোজ একবার গজরাজের কাছে গিয়ে তার অবস্থা লক্ষ করার জন্য। পিঠের সেই ইস্পাতের খাঁচাসমেত গজরাজকে এখন এনে রাখা হয়েছে নগরীর প্রধান আস্তাবলের পাশে এক জায়গাতে। চাঁদ রোজ একবার দেখে আসছেন তাকে। প্রাণীটার কাছে চাঁদ উপস্থিত হলেই অদ্ভুত শান্ত হয়ে যায় সে। শুঁড় দিয়ে চাঁদের গা থেকে কার যেন গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে। হায়তো পায় কোনও গন্ধ। জাহান্নুম থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা চাঁদের গায়ে হয়তো মিশে থাকে তাঁর গন্ধ। গজরাজ যাকে খুঁজছে। শোঁকা শেষ হলে গজরাজ নিজের কপালে শুঁড় ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম জানায়।

জাহান্নুম থেকে বেরিয়ে গজরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চাঁদ যখন বক্তিয়ারের বাড়িতে গেলেন তখন বাড়ির পিছনের ফাকা জমিতে ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ অনুশীলন করছিলেন বক্তিয়ার। চাঁদ সেখানে উপস্থিত হতেই তিনি এগিয়ে এসে বললেন,—আজ আর পাঠ নেব না বুঝলে চাঁদ। তিনদিন পরইতো নিশানাবাজি। আমাকেও যোগ দিতে হবে। তাই অনুশীলন করতে হবে। বলা যায় না, বিন-সামকে খুশি না করতে পারলে হয়তো তিনি দোয়াব অভিযানের দায়িত্বটাই অন্য কারও হাতে তুলে দেবেন।

এরপর তিনি চাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমাকে ক'দিন ধরে কেমন ফ্যাকাসে লাগে কেন? যেন খুন নেই শরীরে!

BanglaBook.org

চাঁদ আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে শুধু বললেন,—ও কিছু নয়, আসলে একটু ছোটাছুটি করতে হচ্ছে তাই এরকম লাগছে।

বক্তিয়ার বললেন,—আজই তোমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল দরবারে। সুলতান তোমার কাজকর্মের ব্যাপারে খবর নিয়ে খুশি। আমিই অবশ্য সেসব কথা তাঁর কানে পৌঁছে দিয়েছি। আরও একটা কাজের দায়িত্ব বাড়ল তোমার। নিশানাবাজির দিন তুমি হাতিটাকে শহরের বাইরে যে মাঠে খেলা হবে সেখানে নিয়ে যাবে। খেলা শেষে ওর পিঠে চেপেই প্রাসাদে ফিরবেন বিন-সাম। তুমিই তাঁকে নিয়ে আসবে। কোনও তকলিফ হলে কিন্তু গর্দান যাবে তোমার। হতিটার নাম বদলে বিন-সাম তার নতুন নামকরণ করেছেন,—'শাহবাজ'। এবার থেকে ওই নামেই ডাকা হবে প্রাণীটাকে।

চাঁদ বললেন, তার মানে মাহুতের কাজটাও করতে হবে আমাকে।

বক্তিয়ার বললেন,—তবে একটা কাজের দায়িত্ব বোধহয় কমে যাচ্ছে তোমার। তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

চাঁদ জানতে চাইলেন,—কী কাজ?

ধনুকের ছিলা ঠিক করতে করতে বক্তিয়ার বললেন,—তোমাকে আর বেশিদিন ঘউর ফাটকে যেতে হবে না।

চাঁদের বুকের ভিতর রক্ত ছলকে উঠল। মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে তিনি বললেন,—উজির সাহেবের কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বক্তিয়ার হেসে বললেন,—তোমার রাজার এতেকাল এসে গেছে। নিশানাবাজির দিন তাকেও ময়দানে নিয়ে যাওয়া হবে। খেলা শেষে জহ্লাদ তাঁর গর্দান নেবে। কাফেরকে তো আর নগরের ভিতর দফন করা যাবে না। সেখানেই বালি চাপা দেওয়া হবে।

চাঁদ বলে উঠলেন,—কিন্তু সুলতান তো তাকে সুস্থ করে তুলতে বলেছিলেন! তাহলে হঠাৎ...।

বক্তিয়ার জবাব দিলেন,—বিন-সাম বলেছিলেন বটে। তাঁর ইচ্ছা ছিল কাফেরটাকে সুস্থ করে তুলে তাঁকে নিয়ে তামাশা করার। ঠিক যেমন বাঘ-সিংহকে খাঁচায় পুরে লোহার শিক দিয়ে খুঁচিয়ে তামাশা দেখানো হয়। কিন্তু তা আর করা গেল না। বিশেষ একটা কারণে মত বদলেছেন বিন-সাম।

BanglaBook.org

—কী কারণ উজির সাহেব?

বক্তিয়ার বললেন,—দিল্লি থেকে গুপ্তচর খবর এনেছে কাফের রাজাটার বেঁচে থাকার খবরটা কী ভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। সামন্ত রাজারা খবর পেয়েছে কাফেরটাকে গজনী মুলুকে নিয়ে এসেছেন বিন-সাম। তাই তারা জোট বেঁধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। এ জন্য বিন-সাম আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান না। কাফেরের কাটা মুন্ডু দিল্লির চকে টাঙিয়ে রাখার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যাতে আর কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস না পায়।

চাঁদ বুঝতে পারলেন, যাত্রা পথে ফেলে আসা তার কাগজগুলোই রাজার সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে। কিন্তু তার ফলে যে হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে আসবে তা তিনি ধারণা করেননি। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন চাঁদ।

বক্তিয়ার তাঁকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন,—কী ভাবছ? কাফেরটার ব্যাপার নিয়ে কষ্ট আমারও হচ্ছে। তামাশাটাই তো মাঠে মারা গেল। ভেবেছিলাম বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে যাব বাঘের খেলা দেখাতে। ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য ছোট ছোট বল্লম পর্যন্ত বানিয়ে ফেলেছিল ছেলেরা!

এরপরই বক্তিয়ার বললেন,—ও আর একটা কথা তো তোমায় বলাই হয়নি। নিশানাবাজির মাঠে কিন্তু তোমার শ্লোক শুনবেন বিন-সাম। লেখা শুরু করেছ তো। ভালো ভালো কথা যেন লেখা থাকে তাতে। খুশি হলে বিন-সাম হয়তো তোমাকে একটা খুবসুরত বাঁদিই বকশিশ দিয়ে দেবেন।

চাঁদ মুখে বললেন,—শ্লোক লেখা শুরু করেছি উজির সাহেব। মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই কী ধূর্ত-নৃশংস বিন-সাম! রাজাকে হত্যা করার আগে শায়েরি শুনে দিল খুশ করবেন তিনি! তাও আবার সে শ্লোক পাঠ করবেন চাঁদ! যিনি সারা জীবন ধরে রচনা করেছেন রাজারহ গাথা।

বক্তিয়ার বললেন,—তাহলে এবার তুমি যাও। আমাকে এখন নিশানাবাজি অভ্যাস করতে হবে।

তারপরই হঠাৎ বললেন,—আচ্ছা তোমাদের মুলুকে সবচেয়ে ভালো নিশানাবাজ কে?

BanglaBook.org

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে চাঁদ জবাব দিলেন,—তিনি ঘউর ফাটকে বন্দি। তার মতো নিশানাবাজ তামাম হিন্দুস্থানে কেউ নেই। আর এ মুলুকেও নেই।

বক্তিয়ার ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন—তাই নাকি! কিন্তু তার নিশানাবাজি দেখার সৌভাগ্য তো আর হবে না। কাফেরটার চোখ দুটোই তো আর নেই। নইলে হয়তো গজনী মিনারের মাথায় বসা কবুতরকে সে নিশানা লাগাত!

আর এরপরই বক্তিয়ারের চোখ হঠাৎ ঝিলিক দিল। একটা আবছা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে। তিনি বলে উঠলেন—আরে এ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি! অন্ধের নিশানাবাজিকে দেখা যেতে পারে! সেটা একটা বড় তামাশা হবে! ব্যাপারটা বিন-সামের কানে তুলতে হবে।

চাঁদ এরপর আর দাঁড়ালেন না। বক্তিয়ারকে কুর্নিশ করে ফেরার পথ ধরলেন। কিছুটা এগোবারই পরই চাঁদের হঠাৎ কেন জানি মনে হল তাঁর পিছন পিছন কেউ একজন আসছে। চাঁদ ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলেন একজনকে। পরনে মহিমদের মতো পোশাক, হাতে ছপটি। তবে তার মুখ পাগড়ির কাপড়ে ঢাকা। চাঁদ ফিরে তাকাতেই সে অন্য একটা রাস্তায় অদৃশ্য গেল। চাঁদ ব্যাপারটায় গুরুত্ব না দিয়ে আবার নিজের গন্তব্যে এগোলেন।

BanglaBook.org

৭

—কে? চাঁদবর এলে? দরজা খোলার শব্দ পেয়ে উঠে বসে বললেন রাজা।

চাঁদ তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমি চাঁদ। তোমার শরীর কেমন?

রাজা জবাব দিলেন,—ভালো। শুধু চোখ দুটোর জন্যই যা কষ্ট। দিন, রাত সব কিছুই অন্ধকার। তা কাল তুমি এলে না কেন?

বক্তিয়ারের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর একটা দিন ঘর ছেড়ে

বেরোননি চাঁদ। দু-রাত-একটা দিন ধরে শুধু ভেবেছেন, আর কি কোনও উপায় নেই রাজার জীবন রক্ষার? এর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত চাঁদ। কিন্তু কোনও উপায় খুঁজে বার করতে পারেননি তিনি। তাই এক কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মৃতসঞ্জীবনী আরকের পাত্রে বিষ মিশিয়ে এনেছেন। সে পাত্র তিনি তুলে দেবেন রাজার হাতে। তারপর শেষ শ্লোক রচনা করে নিজেও অনুসরণ করবেন রাজার পথ। হয়তো রাজার হাতে বিষভাণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য স্বর্গ থেকে তাঁর পূর্বপুরুষরা অভিশাপ দেবেন তাঁকে, কিন্তু তা হোক, মৃত্যুর আগে নিশানাবাজির মাঠে অপমানের হাত থেকে অন্তত মুক্তি পাবেন রাজা।

রাজার প্রশ্নর জবাবে চাঁদ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন,—দরবারের একটা কাজে আটকে গেছিলাম, তাই আসতে পারিনি।

রাজা আর এ প্রসঙ্গে না গিয়ে বেশ উৎফুল্লভাবে বললেন,—জানো চাঁদবর, কয়েকদিন ধরে আমি খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছি। দেখছি আমি আবার দিল্লিতে ফিরে গেছি। আমার সৈন্য-হাতি-ঘোড়া যা তরারী মাঠে হারিয়ে গেছিল, তা যেন আবার ফিরে এসেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই আমার সিংহাসন, দেখতে পাই আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সেনাপতি খণ্ডেরাও, পুত্র কল্যাণকে সঙ্গে নিয়ে চিতোর রাজ সমর সিংহ, সামন্তরাজা গোবিন্দ, আরও কত রাজা। স্বপ্নেও আমি স্পষ্ট শুনতে পাই তাঁরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে আমার নামে।

এরপর একটু থেমে রাজা বললেন,—আচ্ছা চাঁদবর, তুমি কি আমায় দিল্লিতে সত্যিই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো না? সব আশাই তো আমার শেষ হয়ে গেছিল। তুমিই তো আমার মধ্যে আবার প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছ, আশা জাগিয়েছ আমার মনে, তোমার জন্যই তো আমি আবার স্বপ্ন দেখছি। হয়তো আমি আজ অন্ধ, কিন্তু তুমি তো আছ। ধৃতরাষ্ট্র যেমন সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে দেখতেন, তেমনই তোমার চোখ দিয়ে আমি দেখব আমার দিল্লিকে। এখনও আমার অনুচর কিছু সামন্ত রাজা জীবিত আছেন। যাদের আমি রেখে গেছিলাম নারী শিশুদের রক্ষা করার জন্য। তাদের সঙ্গে নিয়ে আবার দিল্লি দখল করব আমি। তারপর এই গজনী আসব মইজুদ্দিনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তুমি পারবে না আমাকে

BanglaBook.org

হিন্দুস্থানে নিয়ে যেতে? সেখানে যে আমার প্রিয়জনরা অপেক্ষা করে আছেন আমার জন্য।

একটা কাতর আবেদন ফুটে উঠল রাজার গলায়।

চাঁদ বললেন,—সেই প্রিয়জনদের সঙ্গে শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে আমাদের।

রাজা ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারতেন কথাটা বলার সময় চাঁদের গলার স্বর কেঁপে উঠল।

তাঁর কথা শুনে রাজা উৎফুল্লভাবে বলে উঠলেন,—সাক্ষাৎ হবে! তোমার এ ঋণ এই ভারত বিজেতা কোনওদিন শোধ করতে পারবে না। নিজের রক্ত দিয়ে তুমি আমাকে সুস্থ করে তুলছ। তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে দিল্লিতে। দাও, দাও, আমাকে আরকটা দাও। ওটার আজ বড় প্রয়োজন আমার।

এই বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজা।

চাঁদ কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। জলে ভেসে যাচ্ছে তাঁর চোখ। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে আরকের পাত্রটা তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

পাত্রটা আগ্রহ ভরে হাতে নিয়ে রাজা বললেন,—তোমার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। তোমার প্রতি আমার যা বিশ্বাস তা পৃথিবীর সব ধনরত্ন দিয়েও কেউ খরিদ করতে পারবে না। এই আরক পান করে আমি আবার বাঁচব চাঁদবর। আমি বাঁচব। তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে দিল্লিতে...।

চাঁদ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। কথা শেষ করে রাজা তখন পাত্রটা ঠোঁটে ছোঁয়াতে যাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদ তাঁর হাত থেকে পাত্রটা টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। মাটিতে আছড়ে পড়ে খানখান হয়ে গেল সেই বিষভাণ্ড। সচকিত রাজা বলে উঠলেন, তুমি এ কী করলে চাঁদবর। পাত্রটা ভেঙে ফেললে কেন? তুমি কী তাহলে চাও না সত্যি আমি সুস্থ হয়ে উঠি, দিল্লি ফিরে যাই?

চাঁদ আর্তনাদ করে উঠলেন,—ও পাত্রে আমি বিষ মিশিয়ে রেখেছিলাম রাজা!

—বিষ! আর কোনও কথা না বলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাজা।

চাঁদ নিজেকে একটু সংযত করার পর কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন,—

BanglaBook.org

বিষ আমি সুলতানের নির্দেশে মিশাইনি। মিশিয়ে ছিলাম অপমানের হাত থেকে আমার রাজাকে মুক্তি দিতে। কাল সকালে আপনাকে নিশানাবাজির মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে হত্যা করার জন্য। আর তার আগে হয়তো আপনাকে নিয়ে তামাশা বিদ্রুপ করবে ওরা। তাই...।

রাজা বললেন,—তাই তুমি আরকে বিষ মিশিয়ে ছিলে। কাজটা ঠিকই করতে যাচ্ছিলে তুমি। কিন্তু একলিঙ্গদেব সে সৌভাগ্য থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলেন। ভাগ্য দেবতা কী নিষ্ঠুর আমার প্রতি! তবে কাজটা না করতে পারলেও তুমি যে আমাকে সত্যি ভালোবাসো-এ বিশ্বাস আমার আরও বেড়ে গেল।

চাঁদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—হয়তো আজই আমাদের শেষ দেখা এই পৃথিবীতে। আমি আজ রাতেই এ শহর ছেড়ে পালিয়ে যাব। কাল সেই বধ্যভূমিতে যাব না আমি। সেই দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। আজ মনে হচ্ছে আমি যদি অন্য রাজপুতদের মতো কলমের চেয়ে তলোয়ার ধরতে পারতাম! তবে তুমি ভেবো না রাজা, পরলোক বলে যদি কোনও দেশ থাকে, তবে সে দেশে শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

রাজা বললেন,—তলোয়ার ধরতে পারোনি বলে আক্ষেপ কোরো না চাঁদবর, ও তো রাজপুত শিশুরাও পারে। কিন্তু তোমার মতো শ্লোক লিখতে পারে কয়জন? তোমার শ্লোকই তো আমাকে অমর করবে। জহ্লাদের খড়গ নেমে এলেও আমি হব মৃত্যুঞ্জয়ী। আচ্ছা চাঁদ, তোমার আর ক'টা শ্লোক লেখা বাকি?

চাঁদ জবাব দিলেন,—কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। আর মাত্র গোটাপাঁচেক শ্লোক। সেগুলো আমার মাথার ভিতর তৈরি হয়ে গেছে। এই যেমন আজ যা ঘটল। চিন্তা শুধু অন্তিম শ্লোক নিয়ে...।

কী যেন বলতে গিয়ে আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল চাঁদের।

রাজা বললেন,—তোমার কাছে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে। কাল তুমি সেই নিশানাবাজির বধ্যভূমিতে অবশ্যই উপস্থিত থেকো। তুমি দেখবে না, কী ভাবে তোমার রাজা নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুলতানের সামনে? তুমি কি দেখবে না জহ্লাদের উদ্যত খড়গর সামনে রাজপুত বীরের দৃপ্ত পদচারণা? সাক্ষী হবে না সেই দুর্লভ মুহূর্তের? তা না দেখলে কীভাবে আমার বীরগাথার অন্তিম শ্লোক রচনা করবে তুমি? অসম্পূর্ণ

BanglaBook.org

থেকে যাবে তোমার রচনা।

রাজার কথা শুনে চোখ মুছে চাঁদ বললেন,—আমি থাকব রাজা।

ঠিক এই সময় কুঠুরির দরজা খুলে গেল। রাজার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন চাঁদ।

ঘউর ফাটকের বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদ ভাবছিলেন তিনি কোন দিকে যাবেন। গজরাজকে দেখে ঘরে ফিরবেন, নাকি বক্তিয়ারের দরজায় ঢুঁ মারবেন? যদি শেষ মুহূর্তে কোনও শুভ সংবাদ পাওয়া যায় লোকটার কাছে। যদি শেষ মুহূর্তে আবার মত বদলান সুলতান? ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তাঁর চোখ গেল কিছু দূরে একটা ছোট প্রাচীরের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা লোক লক্ষ করছে তাঁকে! কে ও?

তার পরই লোকটার পোশাক দেখে চাঁদের মনে হল লোকটাকে আগে তিনি দেখেছেন। সেদিন বক্তিয়ারের বাড়ি থেকে ফেরার পথে এ লোকটাই সম্ভবত তার পিছন পিছন আসছিল। চাঁদ তার দিকে ভালো করে তাকাতেই লোকটা যেন তা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে প্রাচীরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তবে এ সব লোককে নিয়ে চাঁদের এখন ভাবার সময় নেই। তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা কাজ করছে। কোনওভাবে কী বাঁচানো যাবে না রাজাকে? আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চাঁদ পা বাড়ালেন বক্তিয়ারের বাড়ির দিকে।

চাঁদ যখন বক্তিয়ারের বাড়িতে পৌঁছোলেন তখন তিনি গোসল করতে গেছেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা মিলল বক্তিয়ারের। তাঁর দাড়িতে নতুন মেহেন্দির রং, চোখে সুরমা, গায়ে আতরের গন্ধ। পরদিনের উৎসবে যোগদানের প্রস্তুতি আগের দিন থেকেই নিতে শুরু করে দিয়েছেন বক্তিয়ার। চাঁদকে দেখে তিনি বললেন,—তুমি আজ? কী ব্যাপার?

চাঁদ বললেন,—কাল তো নিশানাবাজি। হুজুর সাহেবের কাছে জানতে এলাম তাঁর কোনও নির্দেশ আছে কিনা?

বক্তিয়ার বেশ খুশি হলেন তাঁর কথা শুনে। মেহেন্দি রাঙানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, কাল সকাল সকালই শাহবাজকে নিয়ে তুমি পৌঁছে যাবে নিশানাবাজির ময়দানে। আমি তো থাকবই সেখানে। আর

BanglaBook.org

একটা কথা, আমি যখন নিশানা লাগাব, তখন তুমি, বহুত খুব! বহুত খুব! বলে চেঁচাবে। সে চিৎকার যেন কানে যায় বিন-সামের। ভয়ের কিছু নেই, মেজাজ খুশ আছে সুলতানের। আজ সন্ধ্যায় দরবারিদের তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি তো সেখানেই যাব।

চাঁদ বললেন,—উজির সাহেবকে আজ সত্যি সুলতানের মতো দেখাচ্ছে! তা সুলতান কি কোনও ফরমান দিয়েছেন? কৌশলে চাঁদ জানতে চাইলেন।

বক্তিয়ার তোষামোদে খুবই খুশি হলেন, কিন্তু দু-কানের লতিতে আঙুল দিয়ে মুখে তিনি বললেন,—তওবা, তওবা! আমাকে তুমি সুলতানের সঙ্গে তুলনা করছ জানতে পারলে বিন-সাম তোমার জিভ ছিঁড়ে নেবেন আর আমাকেও বরখাস্ত করবেন। তোমার জন্য শেষে না আমার দোয়াব অভিযানটাই হাতছাড়া হয়ে যায়।

এরপর তিনি বললেন,—তবে একটা খবর আছে। বিন-সামের ইচ্ছা যখন, সেটাকে ফরমানও বলা যেতে পারে। আমার মতলবে খুব খুশি হয়েছেন বিন-সাম। নিশানাবাজির ময়দানে সেই তামাশাটা কিন্তু হচ্ছেই। অন্ধ কাফেরটার হাতে তিরধনুক দিয়ে তাকেও নিশানাবাজিতে নামানো হবে। আর তোমার শ্লোক তৈরি হয়েছে তো? বিন-সাম আজকেও বললেন, কাল তিনি শ্লোক শুনবেন?

এই বলে নিজের বুদ্ধির বাহাদুরিতে নিজেই হাসতে লাগলেন বক্তিয়ার।

সিদ্ধান্ত বদল করেননি বিন-সাম। বক্তিয়ারের কথা শুনে চাঁদের মনের শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। বক্তিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হতাশ চাঁদ আবার হাঁটতে লাগলেন।

BanglaBook.org

৮

আস্তাবল অঞ্চলটা এই গজনী শহরে সবচেয়ে নোংরা জায়গা। বেশ বড় জায়গা নিয়ে আস্তাবল। সর্পিল রাস্তা। তার দুপাশে নীচু ছাদওয়ালা সার সার পাথুরে ঘরে ঘোড়াদের থাকার জায়গা। বিন-সামের অশ্বারোহী

বাহিনির তামাম ঘোড়াদের ঠিকানা এই আস্তাবল। রাস্তাটা ঘোড়ার বিষ্ঠা আর মুত্রে কাদাময়। পা ফেলা যায় না।

সে রাস্তা ধরেই এগোচ্ছিলেন চাঁদ। গন্তব্য আস্তাবলের পিছনে যে মাঠ আছে সেখানে। ওই মাঠেই গজরাজ আছে। বাড়ি ফেরার আগে তিনি একবার দেখে যাবেন অবলা প্রাণীটাকে। চিন্তাক্লিষ্টভাবে মাথা নীচু করে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলেন চাঁদ। হঠাৎ তার পিছন থেকে কানের কাছে কে যেন চাপা স্বরে বলল,—ফেরার পথে আস্তাবলের বিচালিখানায় আসবেন। জরুরি দরকার।

কে বলল কথাটা? চাঁদ পিছনে তাকাতেই দেখতে পেল মুখে পাগড়ি ঢাকা সেই লোকটাকে। যাকে তিনি আজ ঘউর ফাটকের বাইরে দেখেছিলেন! যে তাকে সেদিন অনুসরণ করছিল! চাঁদ তাকাতেই লোকটা আর দাঁড়াল না। মুহূর্তের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার পাশে একটা অন্ধকার আস্তাবলে। কে লোকটা? চাঁদের সঙ্গে তার কী দরকার? চাঁদের তো এ তল্লাটে তেমন কারও সঙ্গে পরিচয় নেই। তবে ব্যাপারটা দেখতে হবে ভেবে নিয়ে চাঁদ আবার পা বাড়ালেন।

নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল গজরাজ। তার কাছাকাছি তাঁবুতে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু লোক। যদিও পারতপক্ষে তারা গজরাজের কাছে ঘেষে না। চাঁদ সেখানে উপস্থিত হতেই সে লোকগুলো তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। চাঁদ গজরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গজরাজ চাঁদের গায়ে শুঁড় বুলিয়ে কার যেন ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে মুখ করে কার উদ্দেশ্যে যেন কপালে শুঁড় ছুঁইয়ে প্রণাম জানাল। ও দিকেই তো ঘউর ফাটক। যেখানে অন্ধকূপে বন্দি আছেন রাজা। হয়তো সেদিকে ফিরে প্রণাম করার ব্যাপারটা নেহাতই কাকতালীয়। কিন্তু চাঁদ দেখতে পেলেন গজরাজের চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তার পাহারাদারেরা বলল, সকাল থেকে প্রাণীটা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। নির্বাক-অবলা প্রাণীরা নাকি অনেক সময় আগে থেকেই দুর্যোগের আঁচ পায়। চাঁদ একথা শুনেছেন। এই অবলা জীবটা কি বুঝতে পেরেছে সেই দুর্যোগের কথা? বুঝতে পেরেছে কালই তার রাজার জীবনের শেষ দিন?

BanglaBook.org

গজরাজের কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না চাঁদ। বিচালিখানার ব্যাপারটা দেখে নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে ঘরে ফিরে শেষ শ্লোক বাদে বাকি ক'টা শ্লোক লিখে ফেলতে হবে। বিচালি খানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তিনি।

বিরাট বড় বিচালিখানা। আধো অন্ধকার। চারপাশে মাথার ওপরের ছাদ সমান খড়-বিচালির স্তূপ। আস্তাবলের ঘোড়াদের খাদ্যভাণ্ডার। তার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ মাথায় পৌঁছে গেলেন চাঁদ। সেখানে একটা খড়ের গাদার আড়াল থেকে বেরিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সেই লোকটা।

চাঁদ প্রশ্ন করলেন,—আপনি কে? আমাকে এখানে ডেকেছেন কেন?

লোকটা তাঁর কথার জবাব না দিয়ে মুখে ঢাকা দেওয়া পাগড়ির কাপড়টা সরিয়ে ফেলল। বিকালের একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে লোকটার মুখে। মুহূর্তখানেক দৃষ্টি বিনিময় হল তাদের মধ্যে। আর তারপরই গভীর আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল দুজনে।

চাঁদের দুই পত্নী, দশ পুত্র এক কন্যা। তাঁর চতুর্থ পুত্র 'ঝালন'। সেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সামনে। তাকে এ জায়গাতে দেখতে পেয়ে চাঁদ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। চতুর্থ পুত্র ঝালনকেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করেন চাঁদ। এর একটা বিশেষ কারণও আছে। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ঝালনই পিতার পথ অনুসরণ করেছেন। তিনিও সরস্বতীর পুজারি, শ্লোক রচনা করেন। তিনি সম্ভাবনাময় তরুণ কবি। তরারীর যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁর হাতেই চাঁদ তুলে দিয়ে এসেছিলেন সারা জীবন ধরে রচিত শ্লোক ভাণ্ডার। অমূল্য শ্লোকগুলো নিরাপদে রাখার জন্য। যাতে লেখা আছে তরারী যুদ্ধের আগে পর্যন্ত রাজার জীবন কাহিনি, দিল্লির চলমান ঘটনা প্রবাহের ইতিহাস।

প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে চাঁদ জিগ্যেস করলেন,—তুমি এখানে কীভাবে এলে?

ঝালন বললেন,—তিনদিন আগে লাহোর থেকে এক সওদাগর এসেছে একপাল ঘোড়া নিয়ে। সে দলের সঙ্গে মহিমের কাজ নিয়ে আমি এ মুলুকে এসেছি। অবশ্য পারসি সওদাগর আমার পরিচয় জানে না। লোকটা এমনি ভালো। দিল্লি-আজমীর-লাহোরে এখন অরাজক অবস্থা

BanglaBook.org

চলেছে। রাজপুত দেখলেই কুতুবুদ্দিনের লোকেরা সেনা দলে নাম লেখাবার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রাজি না হলে গর্দান নিচ্ছে। আপনার দুই পুত্র সজ্জন আর বীরচাঁদ নিহত হয়েছেন। কুতুবুদ্দিনের সেনাদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।

পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু সংবাদে মুহূর্তখানেক চুপ করে থাকলেন চাঁদ। তারপর উৎকণ্ঠিতভাবে জানতে চাইলেন,—আমার শ্লোকগুলো ঠিক মতো রক্ষিত আছে তো?

ঝালন বললেন,—সেগুলো আমি চিতোর কেল্লায় আমার এক সুহৃদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। নিরাপদেই আছে সব। কালই আমরা ফেরার পথ ধরব। সওদাগরও যাবেন চিতোরে। সেখান থেকে শ্লোকগুলো উদ্ধার করে আমি পালিয়ে যাব আরও দূরের কোনও মরুরাজ্যে। যেখানে সুলতানের সেনারা পৌঁছোবে না।

ঝালন এরপর চারপাশ দেখে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন,—আপনাকেও যে এখানে দেখব ভাবতে পারিনি। কেউ বলত আপনি তরারীর যুদ্ধে মারা গেছেন, আবার কেউ বলত আপনি সুলতানের দলে যোগ দিয়েছেন। যদিও শেষের কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি। কিন্তু দুদিন আগে বিকালে গজরাজের কাছে আপনাকে দেখে...।

কথাটা শেষ করলেন না ঝালন।

চাঁদ বললেন,—ওদের দলের সঙ্গেই আমি গজনী এসেছি। না এলে একটা দিনও রাজাকে বাঁচিয়ে রাখা যেত না। বিন-সামের নির্দেশে রাজাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে শেষ রক্ষা হল না। কাল নিশানাবাজির মাঠে তাঁকে হত্যা করা হবে। তারপর হয়তো আমাকেও একদিন হত্যা করবে ওরা।

ঝালন বললেন,—রাজার ব্যাপারটা আমিও শুনেছি। আপনি কী করবেন তারপর? কাল নিশানাবাজির উৎসবের ব্যাপার নিয়ে রক্ষীরা সব ব্যস্ত আছে। সওদাগরের ঘোড়াগুলো আমার হেফাজতেই আছে। চলুন অন্ধকার নামলেই আমরা গজনী ছেড়ে পালিয়ে যাই। কাল সূর্যদয়ের আগেই আমরা অনেক দূর পৌঁছে যাব। খুব ভালো জাতের দুটো তুর্কি ঘোড়া আছে। তারা বাতাসের আগে ছোটে!

BanglaBook.org

কথা শেষ করে উজ্জ্বল চোখে পিতার উত্তরের প্রত্যাশায় তার দিকে চেয়ে রইলেন ঝালন।

চাঁদের সামনে মুক্তির হাতছানি। কী করবেন তিনি? মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে চাঁদ বললেন,—তা সম্ভব নয় ঝালন। রাজাকে আমি কথা দিয়েছি বধ্যভূমিতে সেই শেষ ক্ষণে তাঁর পাশে উপস্থিত থাকব আমি। আমি প্রত্যক্ষ করব এক রাজার মৃত্যু, যে মাথা ঝোঁকায়নি বিন-সামের সামনে। আর সে ঘটনার সাক্ষী যদি আমি না থাকি তাহলে রাজগাথার শেষ শ্লোক আমি রচনা করব কীভাবে?

চাঁদের কথা শুনে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঝালন। তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল।

কিছুক্ষণ পর তার কাঁধে হাত রেখে চাঁদ বললেন,—তুমি দুঃখ পেও না। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হবে। মৃত্যুতো জীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তবুও তারই মাঝে কিছু মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে থাকেন। যেমন রাজা বেঁচে থাকেন তার বীরত্বের জন্য, ক্ষাত্রধর্ম-রাজধর্ম পালনের জন্য। ঠিক তেমনি আমরা কবিরা বেঁচে থাকি আমাদের লেখনীর জন্য। তোমাকে একটা কাজের ভার দেব ঝালন। আমার কাছে কিছু শ্লোক লেখা আছে। রাজগাথার অন্তিম অংশ। যাতে লেখা আছে শেষ তরারী যুদ্ধে রাজার বীরত্বের কাহিনি। গতকাল পর্যন্ত তাঁর বন্দি জীবনের কাহিনি। অন্তিম পরিণতির দিকে তাঁর এগিয়ে যাওয়ার কথা। আরও ক'টা শ্লোক আজ রাতের মধ্যেই লিখে ফেলব আমি। অন্তিম শ্লোকটাই শুধু লেখা বাকি থাকবে। তা বাদে সব শ্লোক আমি তুলে দেব তোমার হাতে। তুমি সেগুলো নিয়ে ফিরে যাবে হিন্দুস্থানে। কী পারবে তো?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ঝালন বললেন,—পারব।

চাঁদ বললেন,—কাল ভোরে এখানেই তোমার হাতে আমি সেই শ্লোকগুলো দিয়ে দেব। আর একটা কথা। যদি কোনও কারণে শেষ শ্লোক আমি রচনা করতে না পারি, তবে তার রচনা করার দায়িত্ব আমি তোমাকে অর্পণ করলাম।

ঝালন পিতার পায়ে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। চাঁদ তাকে আশীর্বাদ করে আর সেখানে দাঁড়ালেন না, যদি পুত্রস্নেহে অথবা

BanglaBook.org

মুক্তির হাতছানিতে মতিভ্রষ্ট হয় তাঁর! সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিচালিখানা-আস্তাবল ছেড়ে নিজের আস্তানার দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

চাঁদ যখন ঘরে ফিরলেন তখন অন্ধকার নেমে গেছে। ঘরে ফিরেই দোর বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে লিখতে বসলেন তিনি। বাইরে গজনীর আকাশে এক সময় চাঁদ উঠল।

এক সময় কাজ সম্পন্ন হল তাঁর। মধ্যরাতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন চাঁদ। বুকের ভারটা অনেকটা লাঘব হয়েছে। শেষ শ্লোকটাই শুধু বাকি রইল। চাঁদের মাথার ওপর মেঘমুক্ত আকাশ। অসংখ্য নক্ষত্ররাজি ঝিকমিক করছে তার গায়ে। জোৎস্নাপ্লাবিত ঘুমন্ত গজনী নগরী। শীতল বাতাস বয়ে আসছে মরুভূমির বুক থেকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হল চাঁদের। আর তার পরই চাঁদের মনে হল রাজার কথা। এই নিদ্রিত শহরে হয়তো তারা দুজনেই জেগে আছেন। কাল এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে রাজাকে চিরবিদায় নিতে হবে। পৃথিবীর রূপ আস্বাদন করার ক্ষমতা তাঁর কেড়ে নিয়েছেন বিন-সাম, কিন্তু চাঁদ তো ছিলেন, তাঁর চোখ দিয়েই নয় পৃথিবীকে দেখতেন রাজা। চাঁদ ভাবতে লাগলেন তাঁর কথা। শৈশব-কৈশোর থেকে যৌবন, দিল্লির সুরম্য কুঞ্জবন থেকে ভয়ংকর যুদ্ধক্ষেত্রে, চাঁদের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে রাজার সঙ্গে।

চাঁদের যখন হুঁশ ফিরল তখন মাথার ওপরের চাঁদ বৈতরনীর পথে। পুব আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা ফুটে উঠেছে। এবার তৈরি হয়ে নিতে হবে চাঁদকে। ঘরে ঢুকে শ্লোকের পাণ্ডুলিপিগুলো যত্ন করে গুছিয়ে একটা শালুতে মুড়লেন চাঁদ। এগুলো তিনি তুলে দেবেন ঝালনের হাতে। আর তারপর...

BanglaBook.org

৯

নিশানাবাজির আয়োজন করা হয়েছে শহর থেকে বেশ অনেকটা দূরে মরুভূমির মধ্যে একটা উন্মুক্ত জায়গায়। সেখান থেকে শুধু অস্পষ্টভাবে

গজনীর মিনারটাই চোখে পড়ে। কিছু দুরে দাঁড়িয়ে আছে নেড়া-রুক্ষ পাহাড়ের সারি। জনপ্রাণীহীন এলাকা। মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের মাথা থেকে আকাশে ডানা মেলে পাক খায় মরু শকুনের দল। শহরে গরিবগুর্বো আমজনতা যাতে অযথা ভিড় করে খেলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্যই এ জায়গা নিশানাবাজির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া তিরন্দাজির জন্য উন্মুক্ত জায়গার প্রয়োজন হয়। লোকের ভিড়ে ঠাসা, ঘিঞ্জি গজনী শহরে সে জায়গা নেই।

নিশানাবাজির মাঠে বিন-সাম, তাঁর দরবারিরা ও তাঁদের খিদমদের জন্য কিছু ক্রিতদাস ছাড়া, অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। তবে আর একজন অবশ্য উপস্থিত থাকবে মাঠে। সে জহ্লাদ। বিন-সাম তাকে নির্দেশ দিয়েছেন থাকার জন্য।

মাঠের এক জায়গাতে বেশ উঁচু মঞ্চ বাঁধা হয়েছে, তার ওপর বসবেন বিন-সাম। মঞ্চের নীচে দু-পাশে শামিয়ানা টাঙানো দরবারিদের জন্য। পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে মাঠ, নিশানাবাজির জন্য দূরে দূরে নানা আকারের খুঁটি পোঁতা। তার গায়ে টাঙানো আছে বিভিন্ন রকমের ধাতব চাকতি। তিরন্দাজরা নিশানা লাগাবেন তাতে।

গজরাজের পাশে দাঁড়িয়ে চাঁদ চারপাশের সবকিছু লক্ষ করছিলেন। বিন-সামের দরবারিরা সকলেই উপস্থিত হয়েছে। সকলের পরনেই জমকালো পোশাক। সঙ্গে তুন-ধনুক। তাঁদের মধ্যে তাজউদ্দিন, বক্তিয়ারও আছেন। বক্তিয়ারের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল চাঁদের। তিনি হেসে চাঁদকে ইঙ্গিতে কী একটা যেন বললেন, সম্ভবত তাঁর নিশানাবাজির সময় বাহবা দেওয়ার ব্যাপারটা। চাঁদ উপস্থিত আর-একজনের দিকে তাকাতে না চাইলেও মাঝেমাঝেই তাঁর চোখ চলে যাচ্ছে। লোকটার দিকে। বিন-সামের দরবারেই সেই জহ্লাদটা। খড়গ হাতে লোকটা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে বিশ্রি দাঁত বার করে হাসছে। চাঁদের মনে হচ্ছে সে হাসি যেন বিদ্রুপ করছে তাকেই।

সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে নগরীর দিকে। কখন দেখা যাবে বিন-সামের পতাকা। আয়োজন সব সম্পূর্ণ। তিনি উপস্থিত হলেই শুরু হয়ে যাবে নিশানাবাজির খেলা। তবে রাজাকে এখনও পর্যন্ত মাঠে আনা

BanglaBook.org

হয়নি। চাঁদের মনে একটা আশার আলো জেগে উঠল। বিন-সাম মত পালটাননি তো? হয়তো তিনি স্থগিত রেখেছেন রাজার মৃত্যুদণ্ড! তাই যেন হয়, মনে মনে চাঁদ প্রার্থনা করতে লাগলেন ঈশ্বরের কাছে।

হঠাৎ একটা চঞ্চলতার ভাব ফুটে উঠল উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে। নগরীর দিক থেকে কী যেন আসতে দেখা যাচ্ছে। ওই তো কালো একটা বিন্দু! কিন্তু বিন-সামের পতাকা কই? আর বিন্দুটা অত ছোটই বা কেন! ওটা তাহলে অন্য কিছু হবে।

কালো বিন্দুটা ক্রমশই এগিয়ে আসছে। চাঁদ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সেদিকে।

বিন্দুটা একটা অশ্ব-শকট। চার ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি। কয়েকজন রক্ষী একটা বেশ বড় বাঁশের খাঁচা বহন করে নিয়ে এল নিশানাবাজির মাঠে। খাঁচাটা গাড়ি থেকে নামাবার পরই চমকে উঠলেন চাঁদ। মনে মনে বলে উঠলেন, হায় ঈশ্বর! এ দু-চোখ দিয়ে আর কী দেখাবে তুমি! বিন-সাম আমার দু-চোখও অন্ধ করে দিল না কেন?

বাঁশের খাঁচার মধ্যে বহন করে আনা হয়েছে রাজাকে। ঠিক যেমন বন্যপশুকে খাঁচায় পুরে রাখা হয়। খাঁচাটা ধরাধরি করে মাঠের মধ্যে এনে রাখা হল। জহ্লাদটা একবার খাঁচাটার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে এল তাঁকে। এখনও পর্যন্ত কোনও রাজা-সুলতানের গর্দান নেওয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি। আজ হবে। হয়তো মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা জানাল বিন-সামকে।

বাঁশের খাঁচার ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। নির্বাক-নিশ্চুপভাবে। বাঁশের খাঁচার ঘন বুনোটের জন্য তাঁর মুখটা ভালো করে দেখতে পেলেন না চাঁদ। তাঁর মনে হল গজরাজ যেন রাজার উপস্থিতি টের পেয়েছে। এতক্ষণ প্রাণীটা বসেছিল। এবার যেন সে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও চাঁদের ইঙ্গিতে নিরস্ত হল। বসে বসে মাথা নাড়তে শুরু করল সে। গজরাজের পায়ের বেড়ি আজ খোলা। বিন-সামের নির্দেশেই খোলা হয়েছে। কারণ, বিন-সাম দেখাতে চান যে হাতিটা বশ মেনেছে সুলতানের। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভরসা অবশ্য চাঁদই। চাঁদের মাথাটা এখন বিন-সামের ইচ্ছাতেই তাঁর ধড়ের ওপর আছে। তাই বিন-সাম তাঁর ওপর ভরসা করতেই

BanglaBook.org

পারেন। অন্যথা হলে চাঁদের মাথাটাই যে আর নিজের জায়গায় থাকবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবারও চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। একজন চিৎকার করে উঠল,—আরে ওই তো! ওই তো!

এবার সত্যিই দেখা যাচ্ছে বিন-সামের পতাকা! তিনি আসছেন! সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্তভাবে সার বেঁধে দাড়িয়ে পড়ল সকলে। দ্রুতগামী তুর্কি ঘোড়ার দল বালিতে ঝড় তুলে এসে উপস্থিত হল নিশানাবাজির মাঠে। সাদা রঙের এক বিরাট ঘোটকীর পিঠে সুলতান বিন-সাম। তাঁর সঙ্গে পতাকাদার আরও দশজন অশ্বারোহী-দেহরক্ষী। সোনার নকশা তোলা সাদা রঙের আলখাল্লা বিন-সামের পরনে। মাথায় বিরাট আফগান পাগড়ি। গলার অলঙ্কারগুলো সূর্যালোকে ঝিলিক দিচ্ছে। সাদা পোশাকে তাঁকে হঠাৎ এক ঝলক দেখলে ফরিস্তা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকালেই সে ভুল ভেঙে যাবে। সে চোখে কেমন যেন হিংস্র জান্তব শীতলতা। সে চোখের দিকে তাকানো যায় না। চোখ নামিয়ে নিতে হয়। এ পৃথিবীতে একজনই হয়তো সে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পেরেছিলেন, আজও পারতেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছেন বিন-সাম। আহত বাঘের মতো তিনি বন্দি রয়েছেন বাঁশের খাঁচায়।

ঘোড়া থেকে নামার আগে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিন-সাম নজর করে নিলেন সবকিছু। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। সুলতানের দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল সব কিছুকে। খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে বিন-সামের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। ঘোড়া থেকে নামলেন তিনি। নাকাড়া বেজে উঠল। দরবারিরা মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ জানালেন তাঁকে। চাঁদ কিন্তু তাকিয়ে ছিলেন বাঁশের খাঁচার দিকে। কে যেন তাঁর পিছনে তলোয়ারের বাঁটের খোঁচা দিয়ে বলল,—এই হাতিটাকে দাঁড় করাও, সুলতানকে অভিবাদন জানানো হচ্ছে!

সম্বিত ফিরে পেয়ে চাঁদ তাড়াতাড়ি গজরাজকে দাঁড় করিয়ে নিজেও মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ালেন। বিন-সাম ব্যাপারটা খেয়াল করলেন কিনা তা চাঁদ বুঝতে পারলেন না। অভিবাদন পর্ব মিটলে তাজউদ্দিনকে ইশারায় ডেকে নিয়ে উঁচু মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করলেন দুনিয়াদারীর মালিক

BanglaBook.org

সুলতান মইজুদ্দিন বিন-সাম। রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য মঞ্চের মাথায় একটা চাঁদোয়া টাঙানো আছে।

এক সময় নাকাড়ার বাজনা থামল। এবার খেলা শুরুর ইঙ্গিত দেবেন সুলতান। সবাই অধীর আগ্রহে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। সুলতান বিন-সাম কী যেন বললেন তাজউদ্দিনকে। তাজউদ্দিন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন,—কাফেরটাকে বাইরে বার করো। ওর হাতে ধনুক দাও।

নির্দেশ পালন করার জন্য খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল রক্ষীরা। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন চাঁদ। খাঁচার থেকে বার করা হল রাজাকে। শিকলও খুলে দেওয়া হল। সূর্যের আলো এসে পড়েছে রাজার মুখে। চাঁদ দেখলেন সে মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, টান টান গ্রিবা, দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গিমা। রাজার পরনে শতছিন্ন পোশাক, কিন্তু একটা উজ্জ্বল আভা যেন ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর শরীর থেকে। ঠোঁটের কোণে একটা হালকা হাসির রেশ। সে হাসি যেন পরিহাস করছে মঞ্চে আসীন দুনিয়ার মালিক বিন-সামকে। একজন তাঁর হাতে ধনুকবাণ ধরিয়ে দিয়ে গেল। তাই দেখে একটা চাপা হাসির রোল উঠল দরবারিদের তাঁবু থেকে। বিন-সাম কী অন্ধটাকে দিয়েই খেলা শুরু করলেন? রসিক বটে সুলতান!

তাজউদ্দিন তাঁকে এক পাশে দাঁড় করাতে বললেন। রক্ষীদের সঙ্গে চাঁদের পাশ দিয়েই হেঁটে কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়ালেন রাজা। সেই পদচারণার মধ্যেও একটা ঋজু-বলিষ্ঠ ভাব। যেন তিনি সভাসদ পরিবৃত হয়ে দিল্লি প্রাসাদের অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাজা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাঁদ একবার কেশে উঠলেন। রাজার ঠোঁটের কোণে হাসিটা যেন একটু স্পষ্ট হল। চলতে চলতেই চাঁদকে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে তাঁর ডান হাতটা একটু ওঠালেন রাজা। অন্যরা অবশ্য ব্যাপারটা লক্ষ করল না।

বিন-সামের অবশ্য কাফেরটাকে দিয়ে খেলা শুরু করার ইচ্ছা নেই। অত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? বেলা তো পড়েই আছে। নিশানাবাজি দেখতে দেখতে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তখন তামাশা করা যাবে অন্ধটাকে নিয়ে।

BanglaBook.org

বিন-সাম এরপর তিন তালি দিয়ে নিশানাবাজি শুরুর ইঙ্গিত করলেন। সেই মতো তাজউদ্দিন প্রথম প্রতিযোগী হিসাবে আবু বক্কর বলে একজন সভাসদের নাম ঘোষণা করলেন। আবু বক্কর এগিয়ে এসে বিন-সামকে কুর্নিশ করে ধনুকে গুণ টানলেন। তারপর শুরু হয়ে গেল খেলা। দূরে দূরে বাঁশের গায়ে ঝোলানো লক্ষবস্তুগুলোতে নিশানা লাগাবার চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। লক্ষভেদ হলে উল্লাস ধ্বনি উঠছে, না পারলে হাসির রোল।

আবু বক্করের নিশানাবাজি শেষ হলে তারপর কাশেম, তারপর কাজি মাসুদ, তাহের, একের পর এক নিশানাবাজরা খেলা দেখিয়ে চলল। দক্ষ নিশানাবাজরা যখন খেলা দেখাচ্ছে তখন উল্লাসে ফেটে পড়ছে ময়দান। নিশানাবাজরাও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তার সেরা খেলাটা দেখাবার। এটাইতো বিন-সামের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ। বিন-সাম খুশি হলে পদন্নতি হবে।

চাঁদের অবশ্য খেলা দেখার দিকে মন নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন রাজার দিকে। ভাবলেশহীন মুখ রাজার। তিনি যেন এক পাথরের মূর্তি। চারপাশের চিৎকার উল্লাস ধ্বনি কোনও কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না। আর একজনও অবশ্য একই রকম নিশ্চল। তিনি মঞ্চে আসীন বিন-সাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁর ক্রীতদাস ওমরাহদের তিরন্দাজি। এদের অস্ত্রচালনার দক্ষতা। নৈপুণ্যের ওপরই তো নির্ভর করে আছে গজনীবিদ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ। আসমুদ্র-হিমাচল হিন্দুস্থানকে গজনীর পদানত করার যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন, তাকে তো সফল করে তুলবে এরাই। কার কতটা যোগ্যতা তা সুলতানের জরিপ করে নেওয়া প্রয়োজন।

নিশানাবাজির খেলা এগিয়ে চলল। সূর্য মাথার ওপর উঠে আবার পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। শেষ হয়ে আসতে লাগল প্রতিযোগীদের নামের তালিকা। বিকাল হয়ে গেল। হালকা লাল রং ধরতে শুরু করেছে আকাশে। চাঁদ একবার তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে, আর একবার রাজার দিকে। দিন শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো শেষ হয়ে আসছে রাজার জীবন। চাঁদ মনে মনে ভাবছেন, সূর্যটা কী আজ পারে না একটু ধীরে অস্ত যেতে? হতাশায় তিনি ভাবতে লাগলেন সামনের জন্মে যদি রাজপুত

BanglaBook.org

হয়ে জন্মাই তাহলে আর কলম ধরব না। অস্ত্র ধরব। সরস্বতীর নয়, ভীমশূলধারী একলিঙ্গদেব বা খড়্গধারী চিতরেশ্বরীর উপাসনা করব আমি। হ্যাঁ ওটাই রাজপুতের প্রধান কাজ। দেবী সরস্বতীর নয়, একলিঙ্গদেবের উপাসনা করলে হয়তো আজ রাজাকে কোনওভাবে রক্ষা করতে পারতাম।

এই ভেবে দারুণ অসহায়তায় জীবনে প্রথমবার কানে গোঁজা কলমটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক তখনই বিন-সামের নির্দেশে তাজউদ্দিন কিছু সময়ের জন্য খেলার বিরতি ঘোষণা করলেন। তখন দরবারিদের মধ্যে একজনই নিশানাবাজি দেখাতে বাকি আছেন, তিনি বক্তিয়ার।

তাজউদ্দিন এরপর ঘোষণা করলেন,—সুলতানের ইচ্ছা এবার তিনি কাফেরটার নিশানাবাজির খেল দেখবেন। তিনি শুনেছেন কাফেরটা নাকি হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় নিশানাবাজ। তবে সবাই একটু সামলে থাকবেন। বড় নিশানাবাজ তো। তার তির কোথায় গিয়ে লাগে ঠিক নেই!

তির খেলা দেখতে দেখতে উপস্থিত জনতার মধ্যে যে একঘেয়ে ভাবটা এসেছিল, এই ঘোষণাতে তা কেটে গেল। সারাদিন পর তামাশাটা এবার তাহলে শুরু হবে। উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

রাজাকে হাত ধরে টেনে এনে দাঁড় করানো হল মাঠের মধ্যে। ঋজু ভঙ্গিতে ধনুক হাতে রাজা দাঁড়ালেন মাঠের মাঝে। নিশানাগুলো যে দিকে রাখা আছে, সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড় করানো হল তাঁকে। তাজউদ্দিনের গলা শোনা গেল,—নিশানা লাগাও।

রাজা ধনুকে তির জুড়লেন, কিন্তু ছুঁড়লেন না।

তাজউদ্দিন আবার চিৎকার করে উঠলেন,—নিশানা লাগাও।

রাজা তির চালালেন না, ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন,—তুই আমাকে হুকুম করার কে? করার জন্য, থুঃ করে মাটিতে থুতু ফেললেন রাজা।

আবার একটা হাসির রোল উঠল চারপাশে। সেটা কাফের রাজাটাকে উত্ত্যক্ত করার জন্য নাকি তাজউদ্দিনকে তিনি অবজ্ঞা করছেন বলে, চাঁদ

BanglaBook.org

ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাজউদ্দিনকে অনেকেই দেখতে পারেন না বক্তিয়ারের মতো। তাজউদ্দিনকে অপদস্থ হতে দেখলে, তাঁদের খুশি হওয়া স্বাভাবিক।

তাজউদ্দিন নিজেও সম্ভবত সেটা আঁচ করলেন, রাগে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—আমি তাজউদ্দিন, দুনিয়াদারির মালিক সুলতান মইজুদ্দিন বিন-সামের হুকুম বরদার। তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি, তুই নিশানা লাগা।

রাজা আবার থুঃ করে থুতু ফেলে বললেন,—আমি রাজা। কোনও হুকুমদারের হুকুম মানি না। সাহস থাকলে তোদের বিন-সামকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বল। আমার চোখের দিকে তাকাবার ভয়ে সে তো আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিল। শিয়াল কখনও বাঘের চোখের দিকে তাকাতে পারে না তা আমি জানি। সাহস থাকে তো সে কথা বলুক।

স্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ। সবাই তাকিয়ে রইল মঞ্চের দিকে। স্বয়ং বিন-সামকে অবজ্ঞা করে গালি দিল লোকটা। এত বড় দুঃসাহস কাফেরটার! সুলতান নিশ্চিত এই মুহূর্তেই মুখ খুলে মৃত্যুদণ্ড দেবেন কাফেরটাকে। চাঁদের বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ। কিন্তু রাজা হঠাৎ বিন-সামকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলছেন কেন? তিনি নির্দেশ দিলে তা পালন করার লোক তো রাজা নন! তবে? মুহূর্তের জন্য একটা সম্ভাবনার কথা চাঁদের মাথায় ঝিলিক দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

বিন-সাম কিন্তু ভাবলেশহীন মুখে বসে রইলেন। তাজউদ্দিন চিৎকার করে উঠলেন,—কাফের কুকুর। তোর এত বড় সাহস যে সুলতানকে তোর সঙ্গে বাত করতে বলিস। অ্যাই চাবুক চালাও। যতক্ষণ না ও নিশানা লাগাচ্ছে চাবুক চলবে।

একটা লোক চাবুক নিয়ে এগিয়ে এল। সপা সপ চাবুক চলতে লাগল রাজার শরীরে। মঞ্চ থেকে তাজউদ্দিন চেঁচাতে লাগলেন—নিশানা লাগা, নিশানা লাগা—।

চাবুকের আঘাতে খসে পড়ছে রাজার ছিন্ন পোশাক, প্রায় উলঙ্গ শরীরে কেটে বসছে চাবুকের দাগ, রক্ত ঝরছে, তবু রাজা নির্বিকার।

BanglaBook.org

তাজউদ্দিনের আস্ফালন, জনতার হিংস্র উল্লাস, চাবুকের আঘাত কিছুই যেন স্পর্শ করতে পারছেন না তাঁকে। শুধু তাঁর মুখে ফুটে আছে বিন-সামের প্রতি গভীর ঘৃণার ভাব। চাঁদ আর এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে চোখ বন্ধ করে কানে আঙুল দিলেন।

সুলতান বিন-সামই এরপর এক সময় তাজউদ্দিনের মাধ্যমে চাবুক চালানো বন্ধের নিদেশ দিলেন। আকাশ লাল হয়ে উঠছে। সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই। নগরীতে ফিরতে হবে খেলা শেষ করে। হাতিটার পিঠে তিনি প্রথম সওয়ার হবেন। সেটা আলো থাকতেই হওয়া ভালো। বক্তিয়ারের নিশানাবাজি এখনও বাকি আছে। সুলতান ভাবলেন আগে বক্তিয়ারের খেলাটা দেখে নেবেন তিনি। তারপর প্রকাশ্যে কাফেরটার মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিয়ে সেই কাটা মুণ্ডু নিয়ে শাহবাজের পিঠে চেপে গজনী নগরীতে প্রবেশ করবেন। এর মাঝে অবশ্য আর একটা ছোট্ট কাজ সেরে নেবেন। চাঁদের শ্লোক শুনবেন তিনি। দেখতে হবে তাঁকে নিয়ে কেমন শ্লোক লিখেছে লোকটা।

চাপা স্বরে নিজের পরিকল্পনার কথা বিন-সাম জানিয়ে দিলেন তাজউদ্দিনকে। তাজউদ্দিন তাঁর হয়ে ঘোষণা করলেন,—এবার নিশানাবাজি দেখাবেন বক্তিয়ার। তারপর শায়েরি শুনবেন দুনিয়ার মালিক। শায়েরি শোনার পর মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে কাফের রাজাটার। চাঁদবর হাজির হো...?

চাঁদবর সার ভেঙে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাজার কাছাকাছি মাঠের মাঝে মঞ্চের বেশ নিকটে। গজরাজ নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল। সে তাকিয়ে আছে রাজা আর চাঁদের দিকে, তার কুলোর মতো কান দুটো শুধু মাঝে মাঝে নড়ছে।

বক্তিয়ার এসে দাঁড়ালেন ফাঁকা জমিতে। সুলতানকে কুর্নিশ করে প্রস্তুত হলেন নিশানাবাজি দেখাবার জন্য। বক্তিয়ারের নিশানাবাজি পরীক্ষা করার জন্য অবশ্য অন্য ব্যবস্থা করেছেন বিন-সাম। যার ওপর তিনি দোয়াব অভিযানের মতো এতবড় কাজের ভার দিচ্ছেন, তার এলেমটা ভালো করে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

একজন ক্রীতদাস একটা খাঁচায় বেশ কিছু কবুতর নিয়ে এল। তারপর একটাকে উড়িয়ে দিল বাতাসে। কবুতরটা আকাশে উড়তে না উড়তেই

BanglaBook.org

বক্তিয়ার উড়ন্ত পাখিটাকে তির দিয়ে গেঁথে ফেললেন। চারপাশে চিৎকার উঠল,—বহুত খুব! বহুত খুব!

বিন-সাম সোজা হয়ে বসলেন, আবার একটা পায়রা ছাড়া হল। পায়রাটাকে এবার আরও ওপরে উঠতে দিলেন বক্তিয়ার। তারপর তির চালালেন। নির্ভুল লক্ষ। তির ফিরিয়ে আনল পাখিটাকে। সবাই চিৎকার করে উঠল,—বহুত খুব, বহুত খুব।

সারা সকাল থেকে বিন-সামের উচ্চ কণ্ঠস্বর কখনও শোনা যায়নি। এবারই তিনি প্রথম হাঁটু চাপড়ে বলে উঠলেন,—শাবাশ!

একটার পর একটা পায়রা ওড়ানো হতে থাকল। প্রতিবার পায়রাটাকে আগের বারের চেয়ে আরও বেশি উচ্চতায় উড়তে দিচ্ছেন বক্তিয়ার। তারপর শর নিক্ষেপ করে তাকে মাটিতে আনছেন। ক্রমশ উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে উঠছে খেলা। দরবারিরা চিৎকার করে উঠছেন 'বহুত খুব' বলে। বিন-সাম বলছেন 'শাবাশ!'

হঠাৎ চাঁদের মনে হল, বিন-সাম প্রতিবার 'শাবাশ' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ধনুক হাতে যেন একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন রাজা। একমাত্র বিন-সামই 'শাবাশ' শব্দটা বলছেন, অন্যরা নয়। রাজা যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছেন শব্দের উৎসটা ঠিক কোথায়। বিন সামের গলা চিনতে পেরেছেন তিনি। চাঁদের মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল,—অনেক দিন আগে রাজা একবার বলেছিলেন তিনি শব্দভেদী বাণ চালাতে জানেন! সে জন্যই বিন সামের শব্দ লক্ষ করে রাজা ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। চাঁদের বুক হাপরের মতো ওঠানামা শুরু করল। বিস্মিত চাঁদ তাকিয়ে রইলেন রাজার দিকে।

BanglaBook.org

দুটো পায়রা এক সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হল। তারা যখন ওপরে উঠে প্রায় বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে বসেছে তখন শর নিক্ষেপ করলেন বক্তিয়ার। বাহাদুর বটে বক্তিয়ার, এক তিরেই তিনি গেঁথে ফেললেন আকাশে ভাসমান দুটো কালো বিন্দুকে। অনেক ওপর থেকে তিরসমেত লাট খেতে খেতে নামতে লাগল পায়রা দুটো। বক্তিয়ারের প্রতি বাহবা, তারিফ, উল্লাসধ্বনিতে ফেটে পড়ছে মাঠ! নিঃসন্দেহে গজনী মুলুকের সেরা তিরন্দাজ বক্তিয়ার। বিন-সাম আরও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন,

'শাবাশ! শাবাশ!

চাঁদ দেখলেন সে শব্দ শুনে এবার বিন-সামের দিকে সত্যিই ঘুরে দাঁড়ালেন রাজা। ধনুকেও শর যোজনা করে ফেলেছেন তিনি। চাঁদের অনুমানই ঠিক। আর একবার মাত্র শাবাশ শব্দটা শোনার প্রতীক্ষায়। সেই আওয়াজ কানে গেলেই রাজা চালিয়ে দেবেন শব্দভেদী বাণ।

কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। শেষ পায়রা দুটো একসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চাঁদ তা খেয়াল করেননি। শূন্য খাঁচা। নিশানাবাজি শেষ। সেরা খেলা দেখিয়ে সুলতান বিন-সামকে তখন কুর্নিশ জানাচ্ছেন বক্তিয়ার।

রাজা উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন শব্দটা শোনার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন খেলা শেষ! হতাশার স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল রাজার মুখে। শেষ রক্ষা হল না। চাঁদের দীর্ঘশ্বাস নিঃশব্দে মিশে গেল মরুভূমির বাতাসে। সূর্য ডুবে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। শুধু তার লাল আভাটাই আকাশের বুকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিভে যাবে রাজার জীবন দীপ। অন্ধকার নেমে আসবে চারপাশে। তিনি চেয়ে রইলেন রাজার মুখের দিকে। দিনের শেষ আলোর আভা লেগে আছে তাঁর মুখে। হতাশার ভাবটা মুহূর্তের মধ্যেই আবার মুছে ফেলেছেন রাজা। তিনি চান না এ সময় তাঁর মুখ দেখে কেউ অনুকম্পা দেখাক। রাজার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এক উজ্জ্বল প্রশান্তি। ঠিক রাজারই মতো।

BanglaBook.org

—চাঁদবর, সুলতান এবার তোমার শায়েরি শুনবেন—

তাজউদ্দিনের চিৎকারে হুঁশ ফিরল চাঁদের। তিনি তাকিয়ে দেখলেন মঞ্চ থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন বিন-সাম। চারপাশ একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পাছে চাঁদের শায়েরি শুনতে বিন-সামের তকলিফ না হয় সেজন্য। কিন্তু কী শায়েরি শোনাবেন তিনি? তিনি যে রাজার জন্য সারা জীবন ধরে শ্লোক রচনা করেছেন, তিনি কীভাবে সুলতানকে নিয়ে শ্লোক রচনা করবেন?

চাঁদ নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, আর একবার যদি তখন

'শাবাশ' বলতেন বিন-সাম!

তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে অধৈর্য হয়ে তাজউদ্দিন বলে উঠলেন, —কী হল? শায়েরি বলো। সুলতান শুনতে চাচ্ছেন।

চাঁদ তবু নিশ্চুপ।

তাজউদ্দিন আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন,—বেয়াদব, কথা কানে যাচ্ছে না? সুলতান কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?

চাঁদ এবার তাকালেন রাজার দিকে। তাঁর মনে হল রাজাও যেন কান খাড়া করে আছেন তাঁর শ্লোক শোনার আগ্রহে। ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদের মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ভাবনা খেলে গেল। চাঁদ একবার তাকালেন মঞ্চে আসীন বিন-সামের দিকে, আর একবার দেখলেন ধনুক হাতে দাঁড়ানো রাজাকে। মুহূর্তের মধ্যে সরস্বতীর বরপুত্র চাঁদ বরদই রচনা করে ফেললেন শেষ শ্লোক। তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। বিন-সামকে কুর্নিশ করে তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, শ্লোক শুনুন তাহলে—

পারসিতে নয়, হিন্দিতে চাঁদবর বলে উঠলেন তাঁর শেষ শ্লোক—

'চার বাঁশ, চৌবিশ গজ
অঙ্গুলি অষ্ট প্রমাণ,
তত উপর সুলতান হ্যায়
মত চুকে চৌহান—।'

হিন্দি শ্লোকটা সুলতান বা অন্যরা বুঝতে না পারলেও যাঁর উদ্দেশ্যে বলা তাঁর বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না। চাঁদ বলছেন, 'চার বাঁশ। অর্থাৎ চার বল্লম উঁচুতে, চব্বিশ গজ দূরত্বে সুলতান বসে আছেন। রাজাকে আরও আট আঙুল উঁচুতে ধনুকটা তুলে ধরতে হবে। রাজা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন।

চাঁদের মুখ থেকে এরকমই কিছু ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় ছিলেন রাজা। তিনি ধনুকে শর যোজনা করে ধনুকটা চাঁদের নির্দেশমতো ওপরে উঠিয়ে নিলেন। মরুভূমির বাতাসে শুধু ছিলা টানার অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারত বিজেতা, ক্ষাত্রকুলধীপ, গুর্জর বংশীয় রাজপুত পৃথ্বীরাজ চৌহানের তির সুলতান মইজুদ্দিন মুহম্মদ

BanglaBook.org

বিন-সাম ওরফে জালালউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরীর বুক ফুঁড়ে বাতাসে বেরিয়ে গেল!

ঠিক সেই মুহূর্তে বহু যুদ্ধে প্রশিক্ষিত গজরাজ হঠাৎ ছুটে এসে পৃথ্বীরাজকে শুঁড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে নিল তার পিঠে বসানো লোহার সুতোয় বোনা খাঁচার ভিতর। চাঁদও ক্ষিপ্রগতিতে উঠে গেলেন গজরাজের পিঠে। তারপর সামনের সব কিছুকে ছত্রভঙ্গ করে, গজরাজ ছুটে চলল সামনের গিরিশ্রেণির দিকে। কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারল না। গজরাজের পিঠে রাজাকে নিয়ে চাঁদবর হারিয়ে গেলেন মরুরাজ্যের অচেনা গিরিবর্তে, ইতিহাসের অজানা গোলক ধাঁধায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG